

প্রাকৃতিক কৃষির দর্শন

.

প্রাকৃতিক কৃষির দর্শন

ভরত মনসাতা

ভাষান্তর : তপন পুরকায়স্থ

প্রাকৃতিক কৃষির দর্শন

ভরত মনসাতা

ভাষান্তর : তপন পুরকায়স্থ

আর্থকেয়ার বুকস

PRAKRITIK KRISHIR DARSHAN
BY BHARAT MANSATA
BENGALI TRANSLATION BY TAPAN PURKAYASTHA

প্রাকৃতিক কৃষির দর্শন
ভরত মনসাতা

ভাষান্তর : তপন পুরকায়স্থ

প্রথম প্রকাশ : কলকাতা বইমেলা ২০১৫

প্রকাশক

আর্থকেয়ার বুকস্

১০ মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০৭১

দূরাভাষ : ৯১ ৩৩ ২২২৯৬৫৫১/২২২৭৬১৯০

Email : earthcarebooks@gmail.com

Wbsite :www.earthcarebooks.com

অঙ্কর বিন্যাস : শ্রীমান চন্দ্রবত্তী ও জিতেন নন্দী

প্রচ্ছদ : আদ্রেয়ী

মুদ্রক

প্রিন্টিং আর্ট, ৩২এ পটুয়াটোলা লেন, কলকাতা ৯

বিনিময় : ২০০ টাকা

উৎসর্গ

মনি বৌ, টিনা ও জয়দীপকে

মুখবন্ধ

বন্ধুবর ভারত মনসাতার বই The Vision of Natural Farming পড়ে মুগ্ধ হয়েছিলাম। ভারতের সৃজনশীল মেধা ও নিরলস পরিশ্রমের ফসল এই বই। অপূর্ব তার লেখনী। বইটিতে গুজরাতের ভালসাদ জেলার উমেরগ্রাম শহরের কাছে দেহরি গ্রামের বর্ষীয়ান কৃষক শ্রী ভাস্কর সাভে—যিনি দীর্ঘ ৬০ বছর ধরে জৈব তথা প্রাকৃতিক পদ্ধতিতে কল্লুবৃক্ষ নামে বিস্ময়কর এক বাগিচা খামার গড়ে তুলেছেন—যাকে ভারতের জৈব চাষের জীবন্ত গান্ধী বলে মনে করা হয়—যিনি জৈবচাষি ও আন্দোলনের বিশ্বজোড়া সংস্থা IFOAM দ্বারা বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ জৈবচাষি বলে স্বীকৃত হয়েছেন—সেই তার বিপুল অভিজ্ঞতা বিধৃত হয়েছে। ইতিমধ্যেই বইটির দুইটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে এবং বইটি সারা দেশ জুড়ে সাড়া ফেলেছে। (ইন্টারনেটেও তা সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছে।) কিন্তু বাংলায় এর কোনো ভাষান্তর হয়নি। দুই বাংলাসহ সাড়া পৃথিবী জুড়ে প্রায় ২৭ কোটি বাঙালি ও তাদের কোটি কোটি চাষিভাই (যাদের গড়পড়তা ৫ শতাংশের বেশি ইংরাজি জানেন না) তাদের অন্তত একটি ক্ষুদ্র অংশের কাছে তাদের নিজের ভাষায় যদি বইটি পৌঁছে দেওয়া যায় তাহলে তারা ও সমগ্র সমাজ উপকৃত হতে পারেন, এই ভাবনা থেকেই বইটি অনুবাদের প্রয়াস।

বইটির পটভূমি

চাষের ভয়ংকর ব্যয়বৃদ্ধিতে ও শস্যানাশে ঋণের দায়ে জড়িয়ে পড়ে ১৯৯৭ থেকে ২০০৭ পর্যন্ত সারা দেশে ১ লক্ষ ৮২ হাজার ৯৩৬ জন চাষি আত্মহত্যা করেছিলেন। অর্থাৎ প্রতি আধঘন্টায় ১ জন চাষি আত্মহত্যা করেছিলেন। (সেই আত্মহত্যার মিছিল আজও অব্যাহত গতিতে চলেছে।) এতে ভীষণ ব্যথিত হয়ে ভাস্কর ভাই তদানীন্তন জাতীয় কৃষি কমিশনের চেয়ারম্যান এবং যাকে এদেশের সবুজ বিপ্লবের পিতা বলে মনে করা হয়

সেই এম.এস.স্বামীনাথনকে তিনটি খোলা চিঠি লিখেছিলেন এবং তার সাথে পরিশিষ্ট আকারে বেশ কিছু নথি সংযুক্ত করেছিলেন। নথিসহ চিঠিগুলির কপি পাঠিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং ও জাতীয় কৃষিমন্ত্রী শরদ পাওয়ারকে। (লেখাগুলি ভাস্কর সাভের সাথে আলোচনার ভিত্তিতে ইংরাজিতে লিখেছিলেন ভারত মনসাতা।) এগুলিই ছিল এই বইটি লেখার শুরু। এর আগে ও পরে ভারত প্রায় কুড়ি বছর ধরে বারংবার ভাস্কর সাভের খামার পরিদর্শন করেন। তার সাথে দীর্ঘ কথোপকথনের ও দেশ জুড়ে জৈব চাষ আন্দোলনের বিভিন্ন কার্যক্রমে অংশগ্রহণের নির্যাস নিয়ে ভারত এই বইটি লিখেছেন।

কি আছে এই বইয়ে

বইটির ৮টি অধ্যায় ও পরিশিষ্ট জুড়ে রয়েছে তথাকথিত সবুজ বিপ্লবের এক বিস্ফোরক সমালোচনা। আছে কিভাবে অহিংসা ও সহযোগিতার ভিত্তিতে প্রাকৃতিক কৃষি সৃষ্টির সমগ্রতাকে লালন করে; কিভাবে এই দর্শনকে আত্মস্থ করে কৃষক সাধারণ বিষাক্ত, ধ্বংসাত্মক রাসায়নিক চাষের নাগপাশ থেকে মুক্ত হতে ও সারাদেশের জনসাধারণকে মুক্ত করতে পারেন এবং বিনা খরচে অথবা নূন্যতম খরচে বিষহীন, স্বাস্থ্যকর, পর্যাপ্ত ফসল ফলিয়ে আত্মমর্যাদাসম্পন্ন ও আত্মনির্ভরশীল হয়ে সমৃদ্ধির পথে যেতে পারেন; কিভাবে খাদ্যসংকট, জলসংকট এবং ভূমিক্ষয় ও ভূ-উষণ্যণের মত ভয়ংকর পারিবেশিক সমস্যাগুলির মোকাবিলা করা যায়; কোন কোন কার্যক্রম গ্রহণ করলে এদেশের সমস্ত মানুষের বুনয়াদী চাহিদাগুলি মেটানো সম্ভব এবং কীভাবে কয়েক দশকের মধ্যে ভারত আবার নিজেকে পৃথিবী জুড়ে সমৃদ্ধি ও শান্তির অগ্রদূত হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে তার সুস্পষ্ট ও বলিষ্ঠ দিকনির্দেশ।

বিজ্ঞান বনাম লোকবিজ্ঞান

বইটির আর একটি লক্ষ্যনীয় দিক হলো (বিশেষজ্ঞ নির্ভর) বিজ্ঞানের সাথে ঐতিহ্যগত জ্ঞান বা লোকবিজ্ঞানের সংঘাত। ভাস্কর ভাইয়ের ওপর যে মানুষটার অপরিসীম প্রভাব ছিল সেই গান্ধী মনে করতেন যে বিজ্ঞান সমাজের ফসল। এই ফসলের ওপর নিয়ন্ত্রণ থাকা উচিত সমাজের—কিছু বিশেষজ্ঞের নয়। লক্ষ কোটি মানুষের সমাজ এই নিয়ন্ত্রণ তাদের ওপর ছেড়ে দিলে সমাজকে ভুগতে হবে—যেমন হচ্ছে। কারণ বিশেষজ্ঞরা বন্দী মুদ্রারাক্ষসদের হাতে।

বিশেষজ্ঞ নির্ভর বিজ্ঞানের বিপরীতে দৈনন্দিন জীবনে হাজার সমস্যা মোকাবিলায় শত সহস্র বছর ধরে লক্ষ কোটি ভারতীয় চাষী রেখে গেছেন

তিল তিল করে সঞ্চিত অভিজ্ঞতার বিপুল ভান্ডার। দেশজ সেই ঐতিহ্যশালী লোকবিজ্ঞানের ধারাকে সংহত করে ভাস্কর ভাই প্রবলভাবে উথিত করেছেন; পুনরুচ্চারণ করেছেন উপনিষদের সেই সমগ্রতার বাণী ওম পূর্ণমদাহ...পূর্ণ থেকে আবির্ভূত এই সৃষ্টি ... এর থেকে জাত প্রতিটি সৃষ্টিই পূর্ণ ... পূর্ণ থেকে নিয়ে নাও পূর্ণ, পূর্ণ পূর্ণই থেকে যায়...সব কিছুই চক্রাকারে ঘুরছে — অক্সিজেন, কার্বন, জল, পুষ্টি...সহযোগিতাই প্রকৃতির ধর্ম, বৈচিত্র্যই প্রকৃতির শ্বাস। জীব মরে গেলেই শেষ হয়ে যায় না, তাকে অন্য কেউ গ্রহণ করে...চলতে থাকে পুষ্টির চাকা...প্রাণের ধারা...প্রাণ অবিভাজ্য, অখণ্ড, জ্ঞানও তাই।

প্রাকৃতিক কৃষি প্রাণের ও জ্ঞানের এই অখণ্ডতা —এই সমগ্রতাকেই ধারণ করে, লালন করে।

‘খাওয়া একটি কৃষিকাজ’

প্রখ্যাত আমেরিকান অধ্যাপক, সাহিত্যিক ও চাষি ওয়েন্ডেল বেরী বলেন — ‘Eating is an agricultural act’ -- ‘খাওয়া একটি কৃষিকাজ’। কথাটি সত্য, কারণ খাওয়ার জন্যই কৃষির সমস্ত কর্মকান্ড। বাঁচতে গেলে সবাইকে খেতে হয়। তাই কৃষির সমস্যা শুধু কৃষকের নয়, সারা দেশ তথা পৃথিবীর সমস্ত মানুষের। মানুষের মুখে অন্ন তুলে দেওয়া পৃথিবীর প্রধান ও পবিত্রতম কাজ। আর তাই চাষই হলো পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম। ‘চাষির ছেলে কি চাষা হবে’—এই তাচ্ছিল্য —এই মূঢ়তার অন্ধকার থেকে আমরা যতদিন না মুক্ত হচ্ছি ততদিন গণতন্ত্র, পার্লামেন্ট, আইনের শাসনের নামে যতই বাগাড়ম্বর চলুক না কেন আমাদের মুক্তি নেই। আমাদের স্বাধীনতা শুধুই এক কথার হয়েই রয়ে যাবে। সেই স্ব-অধীনতা, সেই মুক্তির পথ প্রদর্শক এই বই।

শেষ করি জাপানের সাড়া জাগানো বৌদ্ধ চাষি ফুকুওকার একটি উক্তি স্মরণ করে। ফুকুওকা বলেন যে প্রাকৃতিক কৃষির চূড়ান্ত লক্ষ্য শুধুমাত্র ফসল ফলানো নয়, বরং মনষ্যত্বের সাধনা। প্রাকৃতিক কৃষি মানুষকে সত্যিকারের মানুষ হয়ে ওঠার প্রেরণা দেয়। এই বই তাই শুধুমাত্র কৃষকের জন্যই নয়, সর্বসাধারণের জন্য।

পাঠক সাধারণের কাছে আবেদন : বইটা পড়ুন। জীবনের মানে খুঁজে পাবেন। নতুন মানুষ হয়ে উঠবেন।

দুর্গাপুর,

৫ই জানুয়ারী, ২০১৫

তপন পুরকায়স্থ

১

‘কে পুঁতেছিল বিশাল, প্রাচীন এই বৃক্ষরাজি? কে কর্ষণ করেছিল ভূমি? কেই বা জুগিয়েছিল বীজ, সার, সেচ ও মারীপোকাদের হাত থেকে ফসলের সুরক্ষা?’

চারপাশের ঘন সবুজের মধ্য থেকে ভাস্কর সাভে (উচ্চারণ সা-ভে) আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। এই উষা, পোড়-খাওয়া কৃষকের সাথে সেই আমার প্রথম সাক্ষাৎ — পঁচিশ বছর আগে। তিনি বলে চললেন :

উপনিষদ বলছে —

ওম পূর্ণমদাহ
পূর্ণমিদাম পূর্ণত পূর্ণমদাচ্ছতে
পূর্ণস্য, পূর্ণমদয়া পূর্ণমেয়া বশিষ্যতে

এই সৃষ্টি পূর্ণ ও অখণ্ড
পূর্ণ থেকে আবির্ভাব হয় সৃষ্টির,
প্রতিটি সৃষ্টিই পূর্ণ ও অখণ্ড
পূর্ণ থেকে গ্রহণ করুন পূর্ণ
(শ্রদ্ধার সাথে যতবার আপনার প্রয়োজন)
পূর্ণ পূর্ণই থেকে যায় — ক্ষয়হীন, অখণ্ড।

আমার মনে হল, ‘প্রকৃতিতে বিনা পয়সায় ভোজ পাওয়া যায় না’ —
— কথাটা তাহলে এক আধুনিক অতিকথা (modern myth)। শুধুমাত্র শ্রদ্ধাশীল হও আর ‘বিনাপয়সার ভোজ’ পাও!

প্রথম বর্ষাণে মাটির সুগন্ধ শীতল বাতাসে ছড়িয়ে পড়েছে, সজীব হয়ে উঠেছে প্রকৃতি। হঠাৎ পাখির কূজনকে বাধা দিয়ে চমকে দেওয়া এক উচ্চকিত শব্দ — ধপ্। উপস্থিত অন্য দুজন সাক্ষাৎকারী চোখ কৌচকালেন। ভাস্কর

সাভে শব্দটাকে পান্তা দিলেন না। পরে আমি জানতে পেরেছিলাম ‘ওটা হল একটা ঝুনো নারকেলের মাটিতে পড়ার শব্দ’।

সাভে বলে চললেন, “আমাদের বনভূমিগুলিতে মানুষের যত্ন ছাড়াই ফলের গাছ — যেমন বের (জুজুবের), জাম (জামবোলান), আম, বুনো ডুমুর, মহুয়া, তেঁতুল, রাইনি (জংলী সবেদা) — নিজ নিজ ঋতুতে এমন বিপুল পরিমাণ ফলন দেয় যে ফলের ভারে গাছগুলো নুয়ে পড়ে। প্রতিটি গাছ থেকে বছরের পর বছর ধরে মানুষ সহ সমস্ত জঙ্গলবাসীর বয়ে নিয়ে যাওয়া ফলের পরিমাণ সাধারণত গড়ে এক টনের বেশি। কিন্তু প্রতিটি গাছের চারপাশের মাটি থাকে ক্ষয়হীন, অথগু। সেখানকার মাটিতে কোথাও কোনো হাঁ করা গর্ত নেই! যদি কিছু ঘটে, তাতে মাটি আরও সমৃদ্ধ হয়।

“পাথুরে পর্বতগুলো সহ সমস্ত জায়গায় গাছপালারা কোথা থেকে তাদের জল, নাইট্রোজেন, ফসফরাস ও পটাশ পায়? যদিও তারা স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, তাদের দাঁড়িয়ে থাকার স্থানেই প্রকৃতি তাদের প্রয়োজনীয় রসদ জোগাচ্ছে। কিন্তু চোখে ঠুলি পড়া, অনধিকার হস্তক্ষেপের চুলকানি নিয়ে উদ্ধত, আধুনিক প্রযুক্তি মনে হয় এ বিষয়ে অন্ধ। একটি বৃক্ষ বা উদ্ভিদের কী প্রয়োজন, কতটা প্রয়োজন, কখন প্রয়োজন কৃষি-বিজ্ঞানীরা সে সব নিদান দেন কীসের ভিত্তিতে?” দেজা ভু! (Déjà vu!) যেখানে এটি সুপরিচিত শব্দ, সেখানে এর আবেদন মোটেই ফুরিয়ে যায়নি। কয়েকবছর আগে জাপানি প্রাকৃতিক চাষি-ঋষি (Natural farmer-sage) ফুকুওকার মুখোমুখি হয়েছিলাম। আমরা ছিলাম কলকাতা থেকে মুম্বইগামী — দেশের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত অবধি ৩৬ ঘণ্টাব্যাপী ট্রেন যাত্রায় এক অসংরক্ষিত কামরায়।



২ আপ বোম্বে মেলের ভিড়ে ঠাসা এক সু-আলোকিত ‘সাধারণ’ কামরায় অনেক রাত ও পরের দিন জুড়ে প্রাকৃতিক কৃষি সম্বন্ধে ফুকুওকার এক উচ্চমার্গের প্রস্তাবনা — ‘একটি তৃণখণ্ডে বিপ্লব’ (One Straw Revolution) নামের বইটা পড়ে ফেললাম। সন্ধ্যার সময় আমি ওপরের বার্ষ-এর অর্ধেকটা পেয়ে গেলাম একটু গড়িয়ে নেবার জন্য, কিন্তু আমার কল্পনা এমন সজীব হয়ে উঠেছিল যে আমি মোটেই ঘুমাতে পারলাম না। গোধূলি লগ্নে আমার চেতনা ও ঘুমঘুম ভাবের মাঝে দিবাস্বপ্ন, স্বপ্ন ও কুয়াশার মতো ভাবনারা মিলে মিশে একাকার হয়ে গেল। বইটা কোথায় যেন এক গভীর তারে বংকার দিয়ে গেল।

ওই বছরেই ফ্রেন্ডস্ রুরাল সেন্টার দ্বারা ‘একটি তৃণখণ্ডে বিপ্লব’-এর ভারতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হল। অতিশীঘ্রই এদেশে প্রকৃতি-সংবেদী ইংরেজি পাঠকদের মধ্যে তা হয়ে উঠল এক আন্ডারগ্রাউন্ড বেস্ট সেলার। আমি ও আমার স্ত্রী বিনীতা সবে কলকাতায় একটা বইয়ের দোকান খুলেছি। এরপর বেশ কয়েক বছর ধরে অন্য যে কোনো বইয়ের চেয়ে আমরা ওই বইটাই সবচেয়ে বেশি সংখ্যায় বিক্রি করেছি।

এরপর ১৯৮৭ সালে হঠাৎ আচম্বিতে আমি — শহরে জন্মান এক যুবক — যে তখন ধান ও বুনো ঘাসের মধ্যে ফারাক করতে পারত না — সেই আমি নিজেকে ‘পারমাকালচার’ বা স্থায়ী কৃষিসংক্রান্ত ১০ দিনের এক নিবিড় কোর্সে অংশগ্রহণ করতে দেখলাম। এটি পরিচালনা করেছিলেন বিল মলিসন নামক এক অস্ট্রেলীয় যিনি ‘পারমাকালচার’ শব্দটিকে চয়ন করেছিলেন এবং অক্লান্তভাবে এই ধারণাটির প্রসার ঘটিয়েছিলেন।

১৯৮৮ সালে কলকাতার কাছে শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিশ্বভারতীতে তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রীর কাছ থেকে দেশিকোত্তম পুরস্কার গ্রহণ করতে মাসানুবু ফুকুওকা ভারতে এসেছিলেন। আমাদের সৌভাগ্য যে আমরা এক স্মরণীয় শীতের সকালে আমাদের বইয়ের দোকান সংলগ্ন বাগানে বসে তাঁর সাথে আলোচনার সুযোগ পেয়েছিলাম। মাটির ভাঁড়ে সবুজ চায়ে চুমুক দিতে দিতে ধূমায়িত মুখে আমরা এই কৌতুহল উদ্রেককারী বৌদ্ধ কৃষককে ঘিরে বসেছিলাম, যিনি সারা পৃথিবী জুড়ে জৈবচাষের ঢেউ তুলছিলেন। ওই মাসেই ফুকুওকা ও মলিসনের ওপর আমার নিবন্ধ ‘পথিকৃৎগণ’ (‘The Harbingers’) প্রকাশিত হয়েছিল ‘দ্য ইলাস্ট্রেটেড উইকলি অফ ইন্ডিয়া’ নামক সাময়িকী পত্রে।



ইংরাজিতে ‘দ্য ওয়ান স্ট্র রেভলিউশন’-এর প্রথম ভারতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হওয়ার কয়েক বছরের মধ্যেই বইটি বাংলা, মারাঠি, গুজরাতি, মালয়ালম, হিন্দি, তেলেগু ইত্যাদি প্রায় আধ ডজন ভারতীয় ভাষায় অনূদিত ও প্রকাশিত হয়েছিল। আপাতভাবে ভারত এখনও প্রকৃতির প্রাচীন প্রাজ্ঞতায় পূর্ণজাগরিত হওয়ার উর্বরভূমি — ফুকুওকা মহাশয়ের মতে নিশ্চিতভাবেই এদেশ জাপানের চেয়ে বেশি উর্বর।

প্রাকৃতিক কৃষি সম্বন্ধে আমার আগ্রহ উত্তোরত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছিল। ১৯৮৯ সালে আমার সম্পাদনায় প্রকাশিত হল ‘ইকলজিকাল ভিসান’, কর্মী এবং

সাধারণ পাঠকদের জন্য একটি সংক্ষিপ্ত গ্রন্থ। বইটিতে বিশেষ দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল বাস্তবাত্মক কৃষির ওপর। বইটিতে ভারতের বিভিন্ন জৈব খামারের কথা লেখা হয়েছিল। এগুলির মধ্যে একটি নিবন্ধ হল ‘ভাস্কর সাভের খামারে প্রকৃতি হাসছে।’ এর কিছু পরেই আমরা আমাদের আবাসস্থল বদলে বোম্বে আসি এবং প্রায় নয় বছর ধরে বারবার সাভের খামার পরিদর্শন করি। মহারাষ্ট্র-গুজরাত সীমান্তে বোম্বে থেকে চার ঘণ্টা দূরত্বে উত্তর তটরেখায় অবস্থিত সাভের খামার।

মুম্বইয়ে উইনিং পেরেরার সাথে আমাদের আলাপ হল। স্থায়িত্ব ও বিচার এবং ঐতিহ্যগত ভারতীয় জ্ঞান ও সংস্কৃতির বিপুল সম্পদের ওপর তাঁর ক্ষুরধার লেখনীগুলির সাথে আমরা পরিচিত হলাম। লেখাগুলি আমার চোখ খুলে দিল। এগুলিতে ভারতে জীব বৈচিত্র্যে ভরা জৈব কৃষির মহৎ ঐতিহ্য জীবন্ত উদাহরণের মাধ্যমে অসামান্যভাবে পরিবেশিত ও লিপিবদ্ধ হয়েছে — সবুজ বিপ্লবের (দু)-এক ধরনের চাষ (monoculture) ও রাসায়নিক কৃষির ব্যাপক প্রসারের প্রাক যুগ পর্যন্ত — যখন পর্যন্ত এই ঐতিহ্যশালী জ্ঞানের ক্ষয় শুরু (বা ত্বরান্বিত) হয়নি।



“খুব বেশি দিন আগের কথা নয়”, ভাস্কর সাভে স্মৃতিচারণ করছিলেন, “কবি ও লেখক বঙ্কিমচন্দ্র আমাদের সুজলম, সুফলম ভূমিকে কাব্যে বন্দনা করেছিলেন। বাস্তবিকই আমাদের দেশ ছিল উর্বর ও সমৃদ্ধশালী। এর সমৃদ্ধ মাটি, প্রচুর সূর্যালোক, ঘন বনাঞ্চল, অপূর্ব জীব বৈচিত্র্য, কৃষি সংক্রান্ত বিপুল কৃৎ-কৌশল ও জ্ঞান ভাণ্ডার — এসব নিয়ে আমাদের দেশটা ছিল সত্যিই সমৃদ্ধশালী।

গণনার অতীত প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে আমাদের এই মাটি বাঁচিয়ে রেখেছে পৃথিবীর অন্যতম সর্বাধিক জনঘনত্বের দেশ এই ভারতবর্ষকে এবং তা কোনো রাসায়নিক সার, কীটনাশক, বিদেশি বামন প্রজাতির দানা শস্য অথবা নতুন, চোখ ধাঁধানো জীবপ্রযুক্তির প্রয়োগ ছাড়াই।

শতাব্দীর পর শতাব্দী জুড়ে বহিরাগত আক্রমণকারীরা এদেশে ঢেউয়ের মত আছড়ে পড়েছে। তারা অনেক কিছুই নিয়ে গেছে। কিন্তু আমাদের ভূমির উর্বরতা ছিল অটুট। সেই ‘সোনার ডিম দেওয়া পাখিটা’ ছিল আমাদেরই সাথে, অক্ষত। বৃটিশরা চলে যাবার পর ১৯৬০-এর দশকের মাঝা থেকে ভারত যে প্রবলভাবে কৃষির রাসায়নিক পথ অনুসরণ করল তাতে সমস্যার

পাকচক্রে জড়িয়ে পড়ে মা প্রকৃতি, যিনি তার বরাভয় ও অমূল্যদানে ভরিয়ে রেখেছিলেন আমাদের ভূমিকে, সেই ‘স্বর্গীয় পাখিটি’ বিকলাঙ্গ হয়ে গেল।

গান্ধী বিশ্বাস করতেন গ্রাম স্বরাজে (অথবা গ্রামীণ স্ব-শাসনে), চোখ বুজে সাভে বলে চললেন, “তাঁর ভাবনার কেন্দ্রে ছিল সুস্থ জীবনের জন্য বুনিনাদি সমস্ত চাহিদা পূরণে সক্ষম গ্রামীণ স্তরে সম্পূর্ণ আত্মনির্ভরশীলতা। এদেশে জৈব চাষের শক্তি সম্বন্ধে তাঁর ছিল পূর্ণ আস্থা। কিন্তু নেহেরুর পছন্দ ছিল শহুরে-শিল্পীয় অর্থনৈতিক উন্নয়নের পাশ্চাত্য মডেল যার থেকে প্রবাহিত হয়েছে (দু)-এক রকমের (monoculture) প্রজাতির রাসায়নিক চাষ।

পৃথিবীতে সর্বক্ষণ প্রকৃতির ছয়টি প্রধান উপাদানের সাথে সূর্যালোকের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ধারা বয়ে চলেছে। এদের মধ্যে তিনটি হল বায়ু, জল, ও মাটি। এদের সঙ্গে জীবনের তিনটি পর্যায় — বনম্পতি সৃষ্টি — উদ্ভিদ জগৎ, জীব সৃষ্টি — কীটপতঙ্গ ও জীবাণু জগৎ এবং প্রাণী সৃষ্টি — পশুপাখিদের জগৎ — এরা ক্রমাগত ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া করে চলেছে, প্রকৃতির এই ছয়টি প্রধান উপাদান একটি গতিশীল ভারসাম্য বজায় রেখে চলে। একে অপরের সাথে মিশে প্রকৃতি সৃষ্টি করে স্বর্গীয় করণার এক মহা ঐক্যতান।

“প্রকৃতির এই মৌলিক উপাদানগুলির কোনোটিকে বিপর্যস্ত করার কোনো অধিকার মানুষের নেই। কিন্তু করণা বা প্রেম নয়, বাণিজ্যের সাথে আধুনিক প্রযুক্তির মিলনের ফলে সর্বস্তরে বিপর্যয় নেমে এসেছে। আমরা মাটি, জল ও হাওয়াকে নষ্ট করে ফেলেছি। আমরা আমাদের বেশিরভাগ বনভূমিকে নির্মূল ও তাদের আশ্রিত জীবদের হত্যা করেছি। আধুনিক চাষিরা তাদের জমিতে নিরবচ্ছিন্নভাবে মারাত্মক সব বিষ ছড়িয়ে প্রকৃতির জীব সৃষ্টি বা জীবাণু ও কীটপতঙ্গদের ধ্বংস করছে। অথচ এই জীবাণু বা কীটপতঙ্গরা কোনো কিছুর প্রত্যাশা না করে, উর্বরতার অসংখ্য নিরলসকামী হিসেবে মাটির জল ধারণ ক্ষমতা, বাতাস ধারণ ক্ষমতা ইত্যাদি প্রাণদায়িনী গুণাবলী বজায় রাখে, জীবের মৃত্যুর পর সমস্ত জৈব আবর্জনাকে পচিয়ে (বা বিলিষ্ট) করে, মাটির উর্বরশক্তি বজায় রেখে জীব-ভর (Biomass) বৃত্তাকারে আবর্তিত করে উদ্ভিদের পুষ্টি জোগায়। বিষাক্ত রাসায়নিকগুলি জল ও প্রকৃতির প্রাণীসৃষ্টি বা মানুষ সহ সমস্ত পশুপাখিকে বিষিয়ে তোলে।

গান্ধী বলেছিলেন, “যেখানে শোষণ বা অত্যাচার রয়েছে সেখানে পেষণ বা পুষ্টি থাকতে পারে না।” বিনোভা ভাবে আরও বলেছিলেন, “বিজ্ঞানের

সাথে করুণার মেলবন্ধনে পৃথিবীতে স্বর্গ নেমে আসতে পারে। কিন্তু অহিংসা বিবর্জিত বিজ্ঞান শুধুমাত্র ঘটাতে পারে বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড যার আগুন আমাদের সবাইকে গিলে ফেলে।”

“প্রকৃতির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করার চেষ্টাই হল সেই মৌলিক ভুল যা কৃষিবিজ্ঞানীদের উদ্ধত অজ্ঞতাকেই প্রকট করে তোলে। মানুষের দ্বারা নষ্ট না হওয়া প্রকৃতি এমনিতেই অফুরন্ত ফসলে পরিপূর্ণ। যখন ধানের একটা দানা কয়েক মাসের মধ্যে হাজার গুণ বৃদ্ধি পেতে পারে সেখানে তার উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করার প্রয়োজনটাই বা কীসের! যথেষ্ট ও সুস্বাস্থ্যকর ফসলের জন্য যা করা দরকার তা হল প্রয়োজনীয় প্রাকৃতিক শর্তাবলী বজায় রাখা।”

কৃষিতে এমএসসি বা পিএইচডি করতে গিয়ে একজন ছাত্র যে বছরগুলি ব্যয় করে সেখানে একমাত্র লক্ষ্য হল স্বল্পমেয়াদী এবং যা ক্ষীণদৃষ্টি প্রসূত — সেটি হল অর্থনৈতিক (পুষ্টিগত নয়) উৎপাদনশীলতা। এর জন্য চাষিকে একশত জিনিস কিনতে বা করতে বলা হয়। কিন্তু বাধ্যতামূলকভাবে কী কী জিনিস চাষির কখনও করা উচিত নয় — যাতে পরবর্তী প্রজন্মগুলি এবং অন্যান্য জীবের জন্য মাটির ক্ষতি না হয় — সে কথা মোটেই ভাবা হয় না। এখন সময় হয়েছে, জনগণ ও সরকারকে উপলব্ধিতে জেগে উঠতে হবে যে কর্পোরেট ও রাষ্ট্রীয় সংস্থাগুলির দ্বারা বিকশিত শিল্প-ত্যাগিত কৃষি অন্তর্নিহিতভাবে অপরাধমূলক ও আত্মহত্যার শামিল।



যখন আমি ফুকুওকার ‘একটি তৃণখণ্ডে বিপ্লব’ পড়ি, তখন ‘মাটি ও শরীরের তুলনায়’ আমি সচকিত হয়ে উঠেছিলাম। প্রকৃতির মহা-বুদ্ধি (Supra-intelligence) যা পৃথিবীকে পরিচালনা করে, তা নিশ্চয়ই আমাদের শরীরকেও পরিচালিত করে। বেপরোয়া হস্তক্ষেপে যেমন মাটির স্বাস্থ্যের ক্ষতি হয়, তেমনি তা আমাদের ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যেরও ক্ষতি করতে পারে। ত্রুটিগত বৃদ্ধি পাওয়া প্রচুর লেখালিখি থেকে এখন মনে হয় নিশ্চিত করে বলা যায় যে (iatrogenic diseases) বা চিকিৎসাজনিত হস্তক্ষেপের দ্বারা সৃষ্ট রোগগুলির মহামারির মতো প্রকোপ বৃদ্ধি পাচ্ছে তাদের পিছনে আছে কর্পোরেট প্রভাবাধীন স্বাস্থ্য সেবা।

বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে আমি ভাবলাম ... যদি প্রকৃতি এই অতুৎকষ্ট, বহুমুখী মানবশরীর সৃষ্টি করে থাকে — যা অনেক জটিল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও

তন্ত্র নিয়ে একটা সুসংবদ্ধ সমগ্র হিসাবে কাজ করে — তাহলে এটা কি ভাবা যায় যে যখন এই শরীর রোগাক্রান্ত (dis-eased) হয় তা নিজেকে নিরাময় (self-healing) করতে সক্ষম নয়? (heal) শব্দটির মূলে আছে 'whole', তাই healing —এর অর্থ হল পূর্ণাঙ্গতা ফিরে পাওয়া বা পূর্ণাঙ্গতায় ফিরে যাওয়া। পরবর্তী বছরগুলো আমি ও আমার পরিবার এই পথের অনুসন্ধানে রত হলাম।

আমাদের অভিজ্ঞতা থেকে আমরা নিশ্চিত হয়েছিলাম যে (অন্তত আমাদের ক্ষেত্রে)রোগ সারাতে সচেতনভাবে যতটা সম্ভব কম হস্তক্ষেপ হল সঠিক নীতি। অন্তত সাধারণ রোগজ্বালার ক্ষেত্রে, শুধুমাত্র বিশ্রাম নেওয়া, পৌষ্টিকতন্ত্রকে হালকা রাখা (রান্না করা খাবারের বদলে ফলের ওপর নির্ভর করা), তেষ্টা পেলে পান করা এবং সাকারাত্মক (হ্যাঁ-বাচক) দৃষ্টিভঙ্গি বজায় রাখা — এগুলি করলেই বিস্ময়কর ফল পাওয়া যায়। এরপর শরীর নিজেকে নিরাময় করতে কতটা সময় নেবে তা নির্ভর করে কতটা জমে থাকা বিষ বের করে দিতে হবে তার ওপর।

এটা অবশ্যই সত্য যে জৈবচাষে সৃষ্ট বিষমুক্ত খাবারের সাথে মানুষের স্বাস্থ্যের এক প্রত্যক্ষ সম্পর্ক রয়েছে। শরীরে জমে থাকা বিষ বের করে দিতে শরীরের শক্তি (energy) ভাঙারে টান পড়ে, ফলে পুষ্টির অভাব ঘটে। প্রায় দু-দশক আগে ১৫ জুন, ১৯৮৯ ইন্ডিয়া টুডে পত্রিকায় প্রকাশিত ‘আপনার খাদ্যে বিষ’ (poison in your food) নামক এক সুগবেষণালব্ধ নিবন্ধ মেলে ধরেছিল যে ‘ভারতীয়রা প্রত্যেকদিন যে খাবার খায় তাতে মিশে থাকা বিষাক্ত মারীপোকানাশক রাসায়নিকের মাত্রা পৃথিবীর মধ্যে অন্যতম সর্বোচ্চ। এর ফলে তাদের হৃদরোগ, মস্তিষ্ক, কিডনি, যকৃতের ক্ষতি ও ক্যানসার ইত্যাদি রোগের সম্মুখীন হতে হয় — এসবই হল আধুনিক রোগসমূহ যার সৃষ্টি ও বৃদ্ধি হয়েছে ... আরও বেশি উৎপাদন করো, বিক্রি করো, ভোগ করো ... আরও ... আরও ... এই অনিয়ন্ত্রিত বেপথু শিল্পায়নের ফলে।



১৯৯০-এ ভাস্কর সাভের সাথে আমার প্রথম সাক্ষাতের পরের বছর মহারাষ্ট্রের উত্তর উপকূলে বোরদি নামক এক জায়গায় ‘প্রাকৃতিক যাপন ও প্রাকৃতিক চাষ’-এর ওপর এক জাতীয় জমায়েত (national gathering) সংগঠিত করা হয়েছিল, জায়গাটা ভাস্কর সাভের খামার থেকে মাত্র ১০ কিমি দক্ষিণে। বাসভর্তি লোকজন এসে জায়গাটা ভরিয়ে তুলেছিল।

১৯৮০-র দশকের শেষের দিক থেকে ১৯৯০-এর প্রথম দিকেই আমার কাছে উত্তরোত্তর পরিষ্কার হয়ে উঠছিল যে ক্রমাগত বাস্তুতান্ত্রিক ক্ষয়, সামাজিক অবিচার, সাংস্কৃতিক অবক্ষয় এবং নতুন নতুন রোগের মহামারী — এগুলি উদ্ভূত হয়েছে শহুরে-শিল্পীয়-উপভোক্তা উন্নয়নের পাশ্চাত্য অর্থনৈতিক মডেল অবিবেচকের মতো অনুকরণের ফলে।



১৯৯৩ সালে নর্মদা নদীর ওপর বিশাল সর্দার সরোবর বাঁধ প্রকল্পটির মূল্যায়ন করার জন্য ভারত সরকার যোজনা কমিশনের ডঃ জয়ন্তরাও পাতিলের নেতৃত্বে একটি পাঁচ সদস্যের গোষ্ঠী নিযুক্ত করেছিল। যেহেতু পরিকল্পনায় ছিল যে ওই বিশাল জলাধারের এক বিপুল পরিমাণ জল সেচের কাজে ব্যবহার করা হবে, সেই মূল্যায়ন-গোষ্ঠী ভাস্কর সাভেকে লিখেছিল যাতে একজন অভিজ্ঞ চাষি হিসাবে তিনি তাঁর মতামত দেন। সাভে এক বিস্তারিত উত্তর পাঠিয়েছিলেন। এ বিষয়ে তাঁর সাথে আমার গুজরাতি ভাষায় আলোচনা হয়। সেই আলোচনার ভিত্তিতে আমি তা ইংরাজিতে লিখেছিলাম। তার কয়েকটি মুখ্য বক্তব্য নিচে উদ্ধৃত হল :

“আমি দীর্ঘ ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে প্রত্যয়ের সাথে বলছি যে কার্যকর, সুস্থায়ী কৃষির জন্য (efficient, sustainable agriculture) সেচের প্রয়োজন অত্যন্ত অল্প — আধুনিক কৃষিতে যা ব্যবহার করা হয় তার এক সামান্য ভগ্নাংশ। শস্যের শ্রেষ্ঠ ফলন পাওয়া যায় এমন মাটি থেকে, যাতে থাকে একটা ভেজা/স্যাঁতসেঁতে (damp) বা আর্দ্র (moist) ভাব, যাতে মাটির কণাগুলির মধ্যে বায়ু চলাচল (aeration) বজায় থাকে। ধান হল এক বিরল ব্যতিক্রম যা এমনকী সেখানেও বৃদ্ধি পেতে পারে, যেখানে জমে থাকা জলে মাটি সংপৃক্ত হয়ে আছে। নাবাল জমিতে বা বন্যা প্রবণ অববাহিকা অঞ্চলে বৃষ্টি-সেবিত ফসল হিসাবে ধানকে বাছা হয়, অন্য সব ফসলের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত সেচ গাছ ও মাটি উভয়েরই ভীষণ ক্ষতি করে।

“আমার জমিতে সজীব বুরু-বুরু (Porous) মাটি স্পঞ্জের মতো জল শুষে নেয় এবং সেই জল চুইয়ে নিচে নেমে ভূগর্ভে জলস্তর ভরিয়ে তোলে বিশাল পরিমাণে। এইভাবে ভূগর্ভে জল জমার পরিমাণ শুখা মরশুমে সেচের জন্য কুরো থেকে জল তোলার পরিমাণের চেয়ে অনেক বেশি। তাই আমার খামার স্থানিক বাস্তুতন্ত্র (local ecology) থেকে মোটেই জলভোক্তা নয় বরং সেই হিসেবে জলসরবরাহকারী!”

“যদি আমাদের কৃষির লক্ষ্য হয় আত্মনির্ভরশীলতা এবং আমাদের সম্ভাবনাদের ভবিষ্যতকে সুরক্ষিত করা, তাহলে বৃহৎ সেচ পরিকল্পনার কোনো প্রয়োজন নেই। এদেশে জল সুরক্ষা ও খাদ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করতে হলে সর্বাপেক্ষা কার্যকরী উপায় হল প্রাকৃতিক নিয়ম অনুসারে, জৈব উপায়ে স্থান উপযোগী ফসল, উদ্ভিদ ও (বিশেষত) গাছের মিশ্র চাষ। এর ফলে যেখানে বৃষ্টিপাত কম হয়, সেখানে বৃষ্টিপাত বাড়বে, মাটির পক্ষে বিপুল পরিমাণে জল শুষে নিয়ে ভূগর্ভে জমা রাখার ক্ষমতাও ফিরে আসবে।”

এছাড়াও, এখন যে বৃষ্টি হলে বন্যা তার পরে খরা — এই ব্যাপারটি স্বাভাবিক হয়ে উঠেছে — তা থেকেও পরিত্রাণ পাওয়া যাবে, কারণ এখন বৃষ্টিপাতের অনেকটাই মাটিতে শোষিত হয়ে ভূগর্ভস্থ জলাধারগুলি ভরিয়ে তোলে না — বরং তা বিপুল পরিমাণে ওপরের স্তরের মাটিকে (top-soil) বয়ে নিয়ে গিয়ে চলার পথে জলাধারগুলিকে বুজিয়ে দিয়ে ধ্বংসলীলা চালিয়ে সাগরে মেশে।

সাভের চিঠিতে আরও বলা হয়েছিল, “দুঃখজনক ভাবে আমরা উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয়েছি যে ভারতে অধঃপতিত (degraded) হয়নি এমন সব জমির সম্মিলিত জলধারণ ক্ষমতা হল ইতিমধ্যে সমাপ্ত, অসমাপ্ত ও শুধুমাত্র কাগজে-কলমে থেকে যাওয়া (যা কার্যে রূপায়িত হয়নি) বৃহৎ ও মাঝারি সেচপ্রকল্পগুলির সম্মিলিতভাবে জলধারণ ক্ষমতার চেয়েও বেশি। এই বিকেন্দ্রীভূত ভূগর্ভ জলাধারগুলি অধিকতর কার্যকর, কারণ ভূতল জলাধারগুলির মতো বিপুল পরিমাণ বাষ্পীভবনের ফলে জলহ্রাসের সম্ভাবনার হাত থেকে এগুলি সুরক্ষিত।

আর অবশ্যই বিপুল অর্থব্যয় এবং অর্থনৈতিক, বাস্তুতান্ত্রিক ও মানবিক সমস্যাবলী — যেগুলি ভূপৃষ্ঠে জলাধার তৈরি ও জল সরবরাহের জন্যে বিপুল কারিগরি প্রকল্পের সাথে যুক্ত — এসমস্ত কিছুই এড়ানো যেত এবং বৃহৎ সেচ প্রকল্পগুলি থেকে সৃষ্ট মাটির লবণাক্তকরণ (Salinization) ও জলমগ্নতার (water logging) যমজ অভিশাপকে (বিশেষত শুখা এলাকায় যেখানে মাটি জল নিষ্কাশন করতে পারে না) বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যেত।



১৯৯৪ সালে ভাস্কর ভাই ও অন্য অনেকের সাথে আমি কচ্ছের বিদাদা অঞ্চলে যাই। সেখানে জল সংকট নিবারণ সমিতি নামে সংগঠনটি এক জমায়েত সংগঠিত করেছিল। বিশাল শুখা অঞ্চলে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ গড়ে

মাত্র ২ বা ৩ ইঞ্চি। গত দশকে অনেকবার এমন ঘটেছে যে সারা বছর ধরে অঞ্চলটি ছিল বৃষ্টিহীন। সমিতি জানিয়েছিল যে আটটি গ্রাম পরিত্যক্ত হয়েছে এবং প্রায় ৩০০টি গ্রামের মানুষ তীব্র জলকষ্টের ফলে অন্যত্র চলে যেতে বাধ্য হচ্ছে।

কিন্তু এমনটা সব সময় ছিল না। বৃদ্ধ কৃষকরা জানালেন যে মাত্র অর্ধশতক আগে দক্ষিণ কক্ষে বহু গাছপালা ছিল। সংলগ্ন অঞ্চলে ভূগর্ভে জল পাওয়া যেত মাত্র ৪০ ফুট গভীরে। জঙ্গলে ছিল চিতার দল। এক সময় ৩৫ লক্ষ হেক্টর কৃষি জমিতে ধানের চাষ হত। বৃষ্টিপাত ছিল আজকের চেয়ে অনেক বেশি।

স্থানীয় বেশ কিছু বৃদ্ধ মানুষের সাথে আমাদের আলাপ হল যারা বিশেষভাবেই সজাগ যে বৃষ্টিহীনতার কারণ মরুভূমির প্রসার নয় বরং বনভূমির উচ্ছেদ এবং মাটির অনাদর। যেমন ফুকুওকা বলেন, “বৃষ্টি আকাশ থেকে পড়ে না, তা ওঠে মাটি থেকে।”

এমনকী এখনও গ্রামের বয়স্করা বললেন, প্রতিবছর বর্ষার সময় সমুদ্র থেকে ঘন কালো মেঘের কুণ্ডলী মাথার ওপর দিয়ে উড়ে যায়, কিন্তু বৃষ্টি দেওয়ার জন্য কক্ষের ওপর থামে না। ঘাসপাতাহীন শুখা মাটি থেকে ওপরে ওঠা শুকনো, গরম বাতাস বৃষ্টি ঘনীভূত হওয়ার জন্য উপযোগী নয়। এছাড়াও এই শুকনো বাতাসে গাছ-গাছালি থেকে পাওয়া জৈব-কণার বড়ো অভাব। এই জৈব-কণাগুলির চারপাশে বৃষ্টির ফোঁটা ঘনীভূত হয়, ঘনত্বে বাড়ে এবং মাটিতে পড়ে। কক্ষের বিদাদায় জনসাধারণের মধ্যে খোলামেলা আলোচনার উদ্দেশ্যে ছিল কঠিন পরিস্থিতি থেকে কিভাবে বেরিয়ে আসা যায় তার উপায় খোঁজা, এটি উপলব্ধ হল যে যতটুকু জল পাওয়া যায় তাই দিয়েই সর্বাপেক্ষা অনুকূল মাত্রায় (optimum) সবুজায়ন করতে হবে এই আশা নিয়ে যে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ বাড়বে।



১৯৯০ সালে প্রাকৃতিক যাপন ও প্রাকৃতিক কৃষির ওপর বরদিতে জমায়েতের প্রায় বছর খানেক পর আমার কিছু বন্ধু ও আমি জমি খুঁজতে শুরু করেছিলাম, আমাদের সংখ্যা বেড়ে গেল। আমরা প্রায় দু-ডজন বন্ধু মিলে অর্থ যোগাড় করে সহদ্রি-র পাদদেশে ৬৪ একর ডেউ খেলানো জমি কিনলাম। জায়গাটা বম্বে থেকে একশো কিলোমিটার দূরে। আমাদের প্রাথমিক লক্ষ্য ছিল জৈব চাষ ও বনভূমির পুনর্জাগরণ। বেশির ভাগ জমিতে বনচ্ছেদ

হয়েছিল মাত্র ৩ বা ৪ বছর আগে। কিন্তু তাদের পুনর্জাগরণের বিশেষ সম্ভাবনার প্রকাশও ছিল। আমরা এও স্বপ্ন দেখেছিলাম যে সময়ে ভিশন একরস্ (vision Acres) নামে এক বাস্তবাত্মক সমাজ স্থাপন করা সম্ভব হবে। অবশ্য পরবর্তীকালে জায়গাটার নামকরণ করা হয় বনবাড়ি। ‘বন’ মানে জঙ্গল, ‘বাড়ি’ মানে ছোটো বসতি।

জমির সাথে আমার নিকটতর সম্পর্কের সেই শুরু। গত ১৬ বছর ধরে বনবাড়ি পরিণত হয়েছে দীর্ঘ বৃক্ষের এক ঘন, সবুজ বনে যেখানে রয়েছে ঐতিহ্যগতভাবে প্রয়োজনীয় গাছপালা ও ৩০টিরও বেশি খাদ্য প্রজাতিসহ জীব বৈচিত্র্যের এক অপূর্ব সমাহার। ভূগর্ভস্থ জলভাণ্ডার পূরণ বৃদ্ধি পেয়েছে বিপুলভাবে। এর ফলে আমাদের নিম্নশ্রোতে দুটি গ্রাম বিপুলভাবে উপকৃত হয়েছে। স্থানিক মাল-মশলা ও মাটি দিয়ে স্বল্প খরচে বরনাখাতের উপচে পড়া বৃষ্টির জল ভূতল জলাধারে বেঁধে রাখার কাজও সফল হয়েছে। আর কয়েকবছর আগে ভাস্করভাই জায়গাটা পরিদর্শন করার পর স্থানীয় একটি আদিবাসী পরিবার — বিশেষ করে বুয়া, আমরিভাই ও দৌলতের সাহায্যে খাদ্য-ফসল ফলানোর প্রচেষ্টায় ফল ফলতে শুরু করেছে।

গত দু-দশক ধরে আমি বার বার ভাস্কর সাভের খামারে ফিরে গিয়েছি। প্রতিবারই আমি নতুন কিছু শিখেছি। ১৯৯০-এর দশকে সাভে ও তাঁর কৃষিকাজের পদ্ধতির ওপর আমার আধডজন লেখা প্রকাশিত হয়েছিল। অন্যদের দ্বারা বিভিন্ন ভাষায় আরও অসংখ্য লেখা প্রকাশিত হয়েছিল। আমি এই বইটি লিখতে শুরু করেছিলাম। অনেকগুলি অধ্যায়ে বইটির লেখা সম্পূর্ণ না হওয়াটা আমাদের বন্ধুদের কাছে হাসির খোরাক হয়ে উঠেছিল।

ফুকুওকা আবার ভারতে এলেন এবং তারপর তৃতীয়বার। ১৯৯৭ সালের ৯ই অক্টোবর তিনি কল্লবৃক্ষে ভাস্কর সাভের সাথে সাক্ষাৎ করেন। তার সাথে অনুবাদের জন্য ছিলেন একজন কমবয়সি জাপানি মহিলা। ফুকুওকা মহাশয় বেশ বুড়ো হয়েছেন এবং তাঁর পক্ষে হাঁটা তখন কিছুটা কষ্টসাধ্য। তিনি এবং ভাস্কর সাভে একটা গরুর গাড়িতে বসলেন। গাড়িটা তাঁকে নিয়ে চলল বাগিচা খামার ঘুরিয়ে দেখাবার জন্য। আমার পকেট টেপ-রেকর্ডারটা ঝোলানো ছিল তাঁদের মাঝখানে। আমরা কয়েক ডজন মানুষ পায়ে হেঁটে তাঁদের অনুসরণ করছিলাম।

সোজা কথায়, ফুকুওকা ভীষণ খুশি হলেন। তাঁর স্মিত হাসির মধ্যে ফুটে উঠছিল বিশ্বাস — তা দিয়ে তিনি যেন বলতে চাইছিলেন, “অপূর্ব”! আমরা যখন আবার আমাদের সাক্ষাতের জায়গায় জড়ো হলাম তাঁর কথা শোনার জন্য, সকলের মধ্যেই ছিল এক দারণ কৌতুহল। তিনি হাসলেন

এবং চারপাশে অঙ্গভঙ্গি করলেন — যেন তাঁর চারপাশটা সবটাই বলে দিচ্ছে। তারপর তিনি শুরু করলেন আর যুবতী মহিলা ভাষান্তর করতে লাগলেন, “আমি সারা পৃথিবী জুড়ে বহু খামার দেখেছি। এটাই শ্রেষ্ঠ। এটা এমনকী আমার নিজের খামারের চেয়েও ভালো।”



ফুকুওকা, সাভে এবং দোভাষী কল্পবৃক্ষে বলদে টানা গাড়িতে বসে

২০০০ সালটা ছিল ভাস্কর সাভের খামার সংলগ্ন বিজুত ও অপূর্ব তটরেখা অঞ্চল জুড়ে এক সমস্যা সঙ্কুল বছর। মাত্র ৬ কিমি দূরে উমের গ্রামে গুজরাত সরকার একটি বন্দর তৈরির প্রস্তাব রাখে। এর ফলে চারপাশের সমৃদ্ধ, উর্বরভূমিতে গড়ে ওঠা খামার ফলের বাগান, অনেক আবাসিক স্কুল সহ বিশাল সংখ্যক কঠোর পরিশ্রমী সমৃদ্ধ জেলে সমাজের জীবন-জীবিকা, বন্দর ও তা থেকে সৃষ্ট দূষণের কবলে বিপন্ন ও সম্পূর্ণ ধ্বংস হবার উপক্রম হল। প্রধান যে পণ্য এই বন্দর সরবরাহ করবে বলে ঠিক হয়েছিল তা হল আমদানিকৃত কয়লা — যা যাবে মহারাষ্ট্রের উত্তর উপকূলে দাহানু তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রে।

সমগ্র অঞ্চলটি এই বিশাল ধ্বংসাত্মক প্রকল্পটির প্রতিরোধে প্রতিবাদে ফেটে পড়ল। লেঃ কর্নেল রঘুনাথ সাভে, ভাস্কর সাভের দাদার ছেলে। তিনি ভারতীয় সেনাকে সসম্মানে ৩৩ বছর সেবা করার পর সম্প্রতি অবসর গ্রহণ করে বাড়ি ফিরেছেন। জনগণের প্রতিরোধ আন্দোলন দ্বারা উপকূল অঞ্চলকে রক্ষা করার জন্য সদ্য গঠিত হয়েছে ‘কিনারা বাঁচাও সংঘর্ষ সমিতি’। অঞ্চলের বাসিন্দারা এই সমিতিকে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য রঘুনাথ সাভেকে অনুরোধ করলেন।

আন্দোলনের শক্তি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে লাগল। এটা পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছিল যে জনতা তাদের অঞ্চলে সরকারকে এই দ্রাশ্ত উন্নয়ন পরিকল্পনাকে এগিয়ে যাওয়া থেকে রুখতে বদ্ধ পরিকর। ৭ এপ্রিল ২০০০ গভীর রাতে গুজরাত পুলিশ কোনোরকম গ্রেপ্তারি পরোয়ানা ছাড়াই প্রতাপ সাভেকে পুলিশ হেফাজতে নিয়ে গেল। এই জনপ্রিয় সর্বজন শ্রদ্ধেয় অবসরপ্রাপ্ত কর্নেল নৈশ অভিযানের অফিসারের সাথে সম্পূর্ণ সুস্থ শরীরে বাড়ি থেকে হেঁটে বের হলেন, কিন্তু আর কোনোদিন তিনি পায়ে হেঁটে বাড়ি ফিরে আসেননি।

পরের রাতে প্রতাপ সাভের পরিবারের কাছে পুলিশের থেকে একটি ফোন আসে। তাদের জানানো হয় তিনি ভালো নেই এবং তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। পরিবারের অনেক সদস্য হাসপাতালে ছুটে যান। সেখানে তারা জনতে পারেন যে তাঁকে ছোটো শহর ভাপিতে অন্য একটি হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। সেখানে গিয়ে তারা জানেন যে তিনি কোমায় আছেন। তাঁকে সেখান থেকে মুম্বইয়ে হিন্দুজা হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। কিন্তু তিনি আর কোমা থেকে বেড়িয়ে আসতে পারেননি। ২০ এপ্রিল ২০০০-এ তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

জনগণ নিশ্চিত জানত যে তিনি পুলিশের নিষ্ঠুর অত্যাচারের শিকার হয়েছেন। জনগণ রাগে ফুঁসছিল। কিন্তু তাদের ভিতরে যথেষ্ট পরিমাণে স্ব-শৃঙ্খলা থাকায় ও প্রকৃতিগতভাবে তারা শান্তিপ্রিয় বলে নির্বিচারে ভাঙচুর, পুলিশ স্টেশনে আগুন লাগানো বা রাজ্য সরকারি অফিসগুলিতে আক্রমণ ইত্যাদি থেকে বিরত থেকেছে। অবশ্যই প্রস্তাবিত বন্দরটি আর গড়ে ওঠেনি।



লেফট্যান্যান্ট কর্নেল প্রতাপ রঘুনাথ সাভে ফুকুওকাকে অভিবাদন জানাচ্ছেন, ফুকুওকার পেছনে সাভে

প্রতাপ সাভের বাদিক থেকে ডঃ জয়সুপ্ত পাটিল।

দেহরি গ্রামে, মোড়ে স্থাপিত হয়েছে কর্নেল প্রতাপ রঘুনাথ সাভের পাথরে খোদিত

আবক্ষমূর্তি যা অঞ্চল জুড়ে ভূমির স্বাস্থ্য ও জনসাধারণের স্বার্থ রক্ষায় তাঁর চরম আত্মত্যাগের কথা অবিরাম স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে। কিন্তু দশবছর পর বিভিন্ন সংবাদ সূত্র থেকে মনে হচ্ছে, বিভিন্ন শক্তিসমূহ সময়ের অপেক্ষায় আছে যাতে তারা নিরাপদে বন্দর প্রকল্পটিকে পুনরায় লাগু করতে পারে। আপাতভাবে সারা দেশ জুড়ে বিবেচনায় বা পুনর্বিবেচনায় আছে ৩০০টি নতুন বন্দর।



২০০৫ সালের মে মাসে আমি গুজরাত জৈবচাষ-পদযাত্রায় অংশগ্রহণ করেছিলাম। এটি ছিল রাজ্য জুড়ে এক পদযাত্রা। এই যাত্রা শুরু হয়েছিল কচ্ছের দেশলপুরের কাছে ভীষণ শুখা অঞ্চল বান্ধাইয়ের উমিয়া মাতা মন্দির প্রাঙ্গণ থেকে। প্রায় হাজার খানেক লোক এই যাত্রায় সামিল হয়েছিল, যা এই জনবিরল অঞ্চলে বেশ ভালো একটা সংখ্যা। আমার আগেই ভাস্কর সাভে পৌঁছে গিয়েছিলেন। প্রথর গ্রীষ্মে তাপমাত্রা যখন ৪০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের ওপর, তখন তাঁর নাছোড় উৎসাহ ও প্রাণশক্তি তার অর্ধেক বয়সি যে কাউকে লজ্জা দিতে পারত। প্রথম দিনেই তো আমি কাতর হয়ে পড়েছি। কিন্তু ৮৩ বছরের ভাস্করভাই সংশয়হীন যে তিনি উত্তরের কচ্ছ থেকে শুরু করে, সৌরাষ্ট্রে সাময়িক বিরতির পর সমগ্র যাত্রাপথ অতিক্রম করে দক্ষিণ গুজরাতের সুরাট জেলার ভাত গ্রামে যাত্রা শেষ করবেন।

আমি দেখলাম ভাস্কর সাভের কথোপকথন ও বক্তৃতা স্থানীয় চাষিদের মধ্যে সাড়া জাগিয়েছে। তিনি যেখানেই যাচ্ছিলেন সর্বত্র তাঁর চারপাশের লোকজন ভিড় করছিল। পরে ভাস্কর সাভে আমাকে বলেছিলেন, “এই মানুষগুলো জানে যে তাদের জৈবচাষে ফিরতে হবে, নয়তো শীঘ্রই চাষবাস ছেড়ে দিতে হবে। অনেকে ইতিমধ্যেই রাসায়নিক ছেড়ে দিয়েছে। তারা স্রেফ বিপুল জলের চাহিদা ও চাষের বিপুল খরচ মেটাতে অক্ষম।”

পরের দিন সকালে আমি ভাস্কর সাভেকে দেখলাম একটি গাছের নিচে বেঞ্চে বসে লেখায় ব্যস্ত আছেন। রাসায়নিক চাষ ও জৈব চাষের মধ্যে কী ফারাক তা তিনি লিখছিলেন (গুজরাতি ভাষায়)। পরে সন্ধ্যায় যখন তাঁকে ধরলাম, দেখলাম তিনি ৩৬টি ফারাক লিপিবদ্ধ করেছেন। আমি ভাবলাম এর কতকগুলি একসাথে সমন্বয় করা যায়। সেগুলির সারাংশ করে আমি তা করলাম এবং ১৮টি প্রধান ফারাককে অনুবাদ করলাম।

সেগুলি নিম্নরূপ :

- ১) রাসায়নিক চাষ জীবনের জাল (web of life) ছিন্ন ভিন্ন করে দেয়, জৈবসার তার পূর্ণতাকে (wholeness) লালন করে।
- ২) রাসায়নিক চাষ নির্ভর করে জীবাশ্ম জ্বালানির ওপর, জৈব চাষ নির্ভর করে সজীব মাটির ওপর।
- ৩) রাসায়নিক চাষিরা তাদের জমিকে দেখে এক মৃত মাধ্যম হিসাবে;

জৈবচাষিরা জানে যে তাদের জমি প্রাণে ভরপুর।

৪) রাসায়নিক চাষ মাটি, জল ও বায়ুকে দূষিত করে, জৈবচাষ তাদের শোধন ও পুনরুজ্জীবিত করে।

৫) রাসায়নিক চাষ বিপুল মাত্রায় জল ব্যবহার করে এবং মাটির নিচের বারনাগুলিকে (aquifers) শুকিয়ে দেয়। জৈব চাষে সেচ লাগে অনেক কম এবং এই চাষ ভূগর্ভস্থ জলভাণ্ডারকে পূর্ণ করে।

৬) রাসায়নিক চাষ (দু)একরকম প্রজাতির চাষ (monoculture) এবং এই চাষ জৈব বৈচিত্র্য ধ্বংস করে, জৈব পদ্ধতিতে বহুরকম প্রজাতির চাষ (polyculture) হয় এবং তা বৈচিত্র্যকে লালন করে।

৭) রাসায়নিক চাষে উৎপাদন হয় বিষাক্ত খাবার, জৈবচাষে সৃষ্টি হয় পুষ্টিকর (wholesome) খাবার।

৮) রাসায়নিক চাষের ইতিহাস সংক্ষিপ্ত এবং এর ভবিষ্যত অন্ধকার; জৈবচাষের রয়েছে এক সুদীর্ঘ ইতিহাস আর এর ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা উজ্জ্বল।

৯) রাসায়নিক চাষ হল এক বিদেশি, আমদানি করা প্রযুক্তি; জৈবচাষ বিবর্তিত হয় দেশজভাবে।

১০) রাসায়নিক চাষের প্রসার ঘটে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের দ্বারা সরবরাহ করা ভুল তথ্যাবলীর মাধ্যমে; জৈবচাষ শেখে প্রকৃতি ও চাষির অভিজ্ঞতা থেকে।

১১) রাসায়নিক চাষের ফলে লাভবান হন ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিরা; জৈবচাষে লাভ পায় কৃষকরা, পরিবেশ ও গোটা সমাজ।

১২) রাসায়নিক চাষে কৃষকের ও গ্রামের আত্মনির্ভরশীলতা (এবং আত্মমর্যাদা) লুপ্তিত হয়, জৈবচাষ তা ফিরিয়ে দেয় ও শক্তিশালী করে।

১৩) রাসায়নিক চাষে চাষি দেউলিয়া হয় ও কষ্ট ভোগ করে; জৈবচাষ কৃষককে ঋণ ও দুঃখ থেকে মুক্তি দেয়।

১৪) রাসায়নিক চাষ হিংসাত্মক পরিবর্তন নিয়ে আসে; জৈবচাষ হল অহিংস, এটি প্রকৃতির বিভিন্ন উপাদানগুলির দেওয়া-নেওয়ার মধ্য দিয়ে (synergistic) বিবর্তিত হয়।

১৫) রাসায়নিক চাষ হল ফাঁপা সবুজ বিপ্লব; জৈবচাষ হল সত্যিকারের সবুজ বিপ্লব।

১৬) রাসায়নিক চাষ হল স্থূলভাবে বস্তুবাদী, যাতে কোনো আদর্শের ভাব নেই; জৈবচাষের শিকড় প্রোথিত আধ্যাত্মিকতা ও সত্যের অনুসরণে।

১৭) রাসায়নিক চাষ হল আত্মহত্যার পথ, এটি হল জীবন থেকে মৃত্যুর দিকে যাত্রা। জৈবচাষের পথ হল পুনরুজ্জীবনের পথ।

১৮) রাসায়নিক চাষ হল বাণিজ্য ও নিপীড়নের বাহন, জৈবচাষ হল সংস্কৃতি ও সহবিবর্তনের (co-evolution) পথ।

জৈবচাষ-পদযাত্রার দ্বিতীয় পর্বে গান্ধীর সৌরাষ্ট্রে সবরকাছা জেলার (যেখানে জলের পরিস্থিতি কচ্ছর থেকে কিছুটা ভালো) অনেরা-তে বিশ্বমঙ্গলম স্কুলে (সার্বজনীন মঙ্গল) জড়ো হয়েছিল প্রায় ৪০০ জন। অধিবেশনের শুরুতে স্থানীয় ব্যবস্থাপকরা ভাস্কর সাভেকে তাঁর আশীর্বাচন বা উদ্বোধনী বক্তৃতায় — আশীর্বাদ ও প্রেরণা দেওয়ার জন্য অনুরোধ করেন ...।

সাভে ঘোষণা করলেন, “গত দু-দশক ধরে আমি এই অঞ্চলে চার বা পাঁচবার এসেছি এবং আমার মনে হয় যে এখানকার ৬০ শতাংশের বেশি চাষি এখন জৈবচাষকে কার্যকর অথবা একমাত্র কার্যকর পথ বলে মনে করে ...।”

“পরের দশকের মধ্যে কৃষিপথের (way of farming) এবং চাষি ও চাষি পরিবারের ভবিষ্যতের রূপান্তর সাধনের লক্ষ্যে আমাদের কাজ করা উচিত। তাই আমি কামনা করি আগামী দশবছর অতিব্রান্ত হবার আগে আমাদের রাসায়নিক সার ও কীটনাশকের দোকান ও কারখানাগুলিতে তালো পড়ে যাক। বিষমুক্ত হোক আমাদের মাটি।”



২০০৬ সালে ভারতীয় খবরের কাগজগুলির পাতা জুড়ে থাকত বিদর্ভ, অন্ধ্রপ্রদেশ ও ভারতের অন্যান্য অংশের চাষিদের আত্মহত্যার খবর। এমনকী পাঞ্জাব, যে রাজ্যটি ছিল তথাকথিত ‘সবুজ বিপ্লবের’ অগ্রদূত — সেখান থেকেও আসত আত্মহত্যার খবর। চাষের প্রশ্নে এই রাজ্যটি অন্ধকারে ঢেকে গিয়েছিল। এই দশক জুড়ে সারা দেশে সরকারি হিসাব অনুযায়ী কৃষকের আত্মহত্যার সংখ্যা ছিল দেড় লক্ষের ওপর।

২০০৬ সালে গ্রীষ্মের মাঝামাঝি সময়ে — অনেকদিন পর — আমি ভাস্কর সাভের সাথে দেখা করি। তিনি সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদনগুলির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে তাঁর বেদনার কথা প্রকাশ করেন। “আমাদের মতো বিশাল অভিজ্ঞতা সম্পন্ন কৃষিপ্রধান ও বিপুল প্রাকৃতিক সম্পদের দেশে এ এক ভীষণ লজ্জার ব্যাপার। আমরা সারা বিশ্বের কাছে এক উজ্জ্বল উদাহরণ হতে পারতাম ...”

“যারা ভারতে কৃষিনীতিগুলি রূপায়ণ করেছে তারা দেশের কৃষকদের বিপথে পরিচালিত করার অপরাধে অপরাধী। আমি শুনেছি যে ভারতের ‘সবুজ বিপ্লবের’ জনক স্বামীনাথনকে জাতীয় কৃষি কমিশনের প্রধান হিসাবে

দেশের কৃষিনীতির খসড়া প্রস্তুত করার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।”

আমি ভাস্কর সাভেকে প্রস্তাব দিলাম যাতে তিনি জাতীয় কৃষি কমিশনকে একটা খোলা চিঠি লেখেন এবং আমি জানালাম যে তাঁর সাথে গুজরাতি ভাষায় আলোচনার ভিত্তিতে তাঁর চিঠিটার ইংরেজি ভাষান্তর করে দেব। তিনি তৎক্ষণাৎ রাজি হলেন। পরে তাঁর সাথে বেশ কয়েকবার সাক্ষাতের ফলশ্রুতিতে খোলা চিঠিটি লিখিত হয় এবং ২৯ জুলাই ২০০৬ তারিখে জাতীয় কৃষি কমিশনের কাছে পাঠানো হয় (পরিশিষ্ট দেখুন)। চিঠির সাথে জোড়া হয়েছিল ৬টি ক্রেডপত্র (annexure)। চিঠিটির প্রতিলিপি পাঠানো হয়েছিল প্রধানমন্ত্রীকে, কৃষি মন্ত্রীকে, জাতীয় পরামর্শদাতা কাউন্সিলকে ও গণমাধ্যমগুলিতে। এই নথিপত্রগুলি আরও অনেকের কাছে ই-মেল করে পাঠানো হয়েছিল, তাঁরা আবার আরও অনেককে পাঠিয়েছিলেন, যার ফলে এক বিস্তৃত ডেউয়ের মতো তা ছড়িয়ে পড়েছিল।

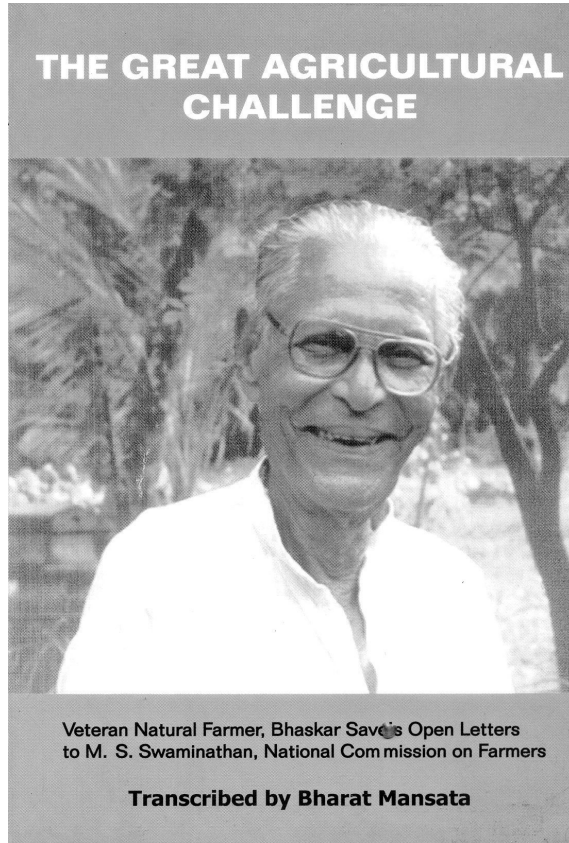
সরকারি কৃষি-নীতির এক ভয়ংকর সমালোচনায় ভরা এই আট পৃষ্ঠার বিশদ চিঠিতে জরুরি ভিত্তিতে কৃষির মৌলিক পরিবর্তনের এক বাঙময় আর্জি জানানো হয়েছিল। “আমি প্রত্যয়ের সাথে বলছি যে শুধুমাত্র প্রকৃতির সাথে সাযুজ্যপূর্ণ মিশ্র জৈবচাষের মাধ্যমে ভারত সকলের জন্য সুস্থায়ীভাবে (sustainably) প্রচুর স্বাস্থ্যকর (wholesome) খাদ্য জোগাতে পারে এবং সকলের জন্য স্বাস্থ্যকর মর্যাদাপূর্ণ, শান্তিপূর্ণ জীবনযাপনের জন্য সমস্ত রকম বুনিয়াদি চাহিদা পূরণে সক্ষম।”

স্বামীনাথন উত্তরে লিখলেন, “আমি দীর্ঘকাল ধরে আপনার কাজকে সম্মান জানিয়ে এসেছি এবং আপনার বিশদ প্রস্তাব, মূল্যবান মন্তব্য ও সুপারিশগুলির জন্য আমি আপনার প্রতি কৃতজ্ঞ, আমাদের চূড়ান্ত রিপোর্টে সেগুলি বিবেচনায় রাখব।”

এর উত্তরে সাভে আরও মন্তব্য সহ দ্বিতীয় একটি খোলা চিঠি পাঠালেন ১৬ আগস্ট ২০০৬ তারিখে। তিনি জানালেন, যদি কোনো সংশয় বা বিরুদ্ধ মত থাকে তাহলে সে সম্বন্ধে তিনি আরও পরিষ্কার করে বলতে রাজি। কোনো উত্তর না পেয়ে তিনি ৯ অক্টোবর ২০০৬-এ তাঁর তৃতীয় চিঠিটি পাঠালেন। এই চিঠিতে তিনি তাঁর প্রস্তাব বা পরামর্শগুলির সারাংশ লিখে পাঠালেন। এ প্রসঙ্গে আরও একটি নতুন চিঠি পাঠানো হল প্রধানমন্ত্রীকে।

সাভে সেই চিঠিতে জিজ্ঞাসা করলেন, “এই বিশাল দেশে আধুনিক পদ্ধতি অনুসরণ করা হয় এমন সব সরকারি কৃষি দপ্তরে বা বিশ্ববিদ্যালয়ে এমন কোনো খামার আছে কি যা স্থানীয় বাস্তুতন্ত্রের জল, শক্তি (en-

ergy) ও উর্বরতার মোদাভোক্তা না হয়ে স্থানীয় বাস্তুতন্ত্রে এগুলির (জল, শক্তি ও উর্বরতা) মোদা জোগান দেয়? কিন্তু যেখানে প্রকৃতিতে বাধাহীন দেওয়া-নেওয়া বা সহযোগিতা রয়েছে, সেখানে এমনটাই সম্ভব। বাস্তুতান্ত্রিক হিসাব রক্ষার (ecological audit) সমস্ত রকম পদ্ধতি অবলম্বন করে যাচাই করলে দেখা যাবে যে পরিবেশের স্বাস্থ্যের ওপর আমার খামারের শুধু ইতিবাচক (positive) প্রভাব রয়েছে। অর্থনৈতিকভাবেও ‘আধুনিক’ কৃষকদের চেয়ে আমি বহুগুণ উপার্জন করি।”



ক্রোড়পত্র সহ ভাস্কর সাহের খোলা চিঠি সাইবার স্পেসে বিস্তৃতভাবে সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছে। ভারতে সেগুলি অন্তত ৬টি ভাষায় অনূদিত ও প্রকাশিত হয়েছে এবং বহু কৃষকের প্রশংসা অর্জন করেছে। বহু কৃষক

সংগঠন ভাস্কর সাহের মতামতকে সমর্থন জানিয়ে জাতীয় কৃষি কমিশনকে চিঠি লিখেছে। ক্রোড়পত্র সহ এই সমস্ত চিঠিপত্র ও আরও দুটি মূল্যবান দলিল ‘দ্য গ্রেট এগ্রিকালচারাল চ্যালেঞ্জ’ নামে একটি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়েছে। বইটির প্রকাশক আর্থকেয়ার বুকস্‌।

২০১০ সালে এই বিশিষ্ট, উষ্ণ কৃষক — যার বয়স এখন ৮৮ বছর — পেলেন বিশ্বজোড়া বিশাল স্বীকৃতি। দি ইন্টারন্যাশনাল ফেডারেশন অফ অর্গানিক এগ্রিকালচারাল মুভমেন্ট — জৈবচাষি ও তাদের আন্দোলনের বিশ্বজোড়া ছাড়া সংগঠন ‘ওয়ান ওয়ার্ল্ড অ্যাওয়ার্ড ফর লাইফটাইম অ্যাচিভমেন্ট’ — এই বিরল সম্মানে সাভেকে ভূষিত করার সিদ্ধান্ত নিল।

২০১০ সালে ‘IFOAM in Action’-এর জুলাই সংখ্যায় — যেটি জনসমক্ষে এই পুরস্কারের কথা ঘোষণা করেছিল — বিবৃতি দিল, “ভাস্কর সাহে জৈবচাষের জীবন্ত গান্ধী বলে পরিচিত ... অর্ধেক শতাব্দী ধরে জৈব পদ্ধতিতে চাষ করছেন। তিনি তিন প্রজন্ম ধরে ক্ষুদ্র জৈবচাষিদের অনুপ্রাণিত করেছেন।”

লেখাটিতে মন্তব্য করা হয় যে সাহের খামার ‘কল্লবৃক্ষ’ একটি খাদ্য-বন (food forest) এবং এটিকে বাস্তুতন্ত্রে জল, শক্তি (energy) ও উর্বরতা প্রদানকারী (ভোক্তা নয়) বলে অভিহিত করা হয়েছে। এই খামার আবার কার্যকর রূপে ন্যূনতম খরচে কার্বন অপসারণ (sequestration) করে থাকে, যা দেখিয়ে দেয় যে জৈবচাষ আবহাওয়া বদল আটকাতে যথেষ্ট কার্যকর।

মাটির উর্বরতা বাড়ানোর জন্য বাইরে থেকে জোগানের (input) প্রয়োজন কমানো এবং পুরোপুরি বাদ দেওয়ার (eliminating) পাশাপাশি উচ্চহারে উৎপাদন করার সক্ষমতা হল খাদ্য সুরক্ষা বৃদ্ধি করার এক মডেল। আর তার গাছ-ফসলের (tree-cropping) পদ্ধতি পোড়ো জমিকে পুনরুজ্জীবনের মাধ্যমে সুস্থায়ী ও লাভজনকভাবে বহু মানুষের রুটিরুজির সংস্থান সৃষ্টিতে বৈপ্লবিক ভাবে সম্ভাবনাময় বলে প্রশংসিত হয়েছে।

এই লেখাটিতে মার্কাস আরবেঞ্জ-কে (যিনি IFOAM-এর বিচারকমণ্ডলীর নেতৃত্ব দিয়েছিলেন — যারা পুরস্কার দেওয়ার জন্য নির্বাচিত করেছিল সাভেকে) উদ্ধৃত করে লেখা হয়েছে, “তিনি বিশ্ব জুড়ে জৈব আন্দোলনে অন্যতম সেরা ব্যক্তিত্ব”।

টীকা এবং উল্লেখিত গ্রন্থাদি

- ১। এই সংস্কৃত উদ্ধৃতিটি ইশাভস্যপনিষদ থেকে গৃহীত হয়েছে।
- ২। এই প্রথম ভারতীয় সংস্করণটি প্রকাশনার পিছনে ডঃ প্রতাপ আগরওয়াল, বসন্ত পালসিকর এবং সুজিত পট্টোয়ার্থন বিশেষ ভূমিকা পালন করেছিলেন। তখন ফ্রেন্ডস্ রুরাল সেন্টার (বাসুলিয়া ও হাসেঙ্গাবাদে) ছিল প্রাণ-চঞ্চল এবং বিখ্যাত শিক্ষাবিদরা যেমন মারজরিসাইক্স (যিনি রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধি —উভয়ের সাথেই কাজ করেছেন), লরী বেঞ্জামিন, টাইটাস পরিবার ও অন্যান্যরা এই সংস্থাকে সচল রেখেছিলেন।
- পরবর্তীকালে আদার ইন্ডিয়া প্রেস দ্বারা এক খড় বিপ্লব' (One Straw Revolution) প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৯২ সালে। (এবং পুনর্মুদ্রিত হয়েছিল ২০ বার।) এতে মুখবন্ধ লিখেছিলেন প্রতাপ আগরওয়াল। সেখানে তিনি প্রাকৃতিক কৃষিকে নাম দিয়েছিলেন 'ঋষি ক্ষেতি' যে শব্দ-বন্ধটি আক্ষরিক ভাবে অনুবাদ করলে দাঁড়ায় ঋষির দ্বারা অনুসরণ করা (কিছু-না-করা) কৃষি।
- ৩। রবীন ফ্রানসিস, তদানীন্তন সম্পাদক, ইন্টারন্যাশনাল পার্মাকালচার জার্নাল এবং এম.সি। পেরেরা বিল মলিসিনকে কোর্সটি পরিচালনায় সাহায্য করেন। এই কোর্সের শেষে একটি পার্মাকালচার খামার প্রদর্শনের জন্য জাহির্বাদের কাছে পস্তাপুরে ডেকান ডেভেলপমেন্ট সোসাইটির জমিতে এক ভূমি পরিকল্পনার (ground plan) নকশা প্রস্তুত করা হয়। পরে ডঃ ভেংকট, নরসিনহা ও অন্যান্যরা এই পরিকল্পনা লাগু করে তা লালন করেন।
- ৪। এটি ক্লাসিক বুকস্/আর্থকেয়ার বুকস্ ও ডি.আর.সি.এস.সি. (ডেভেলপম্যান্ট রিসার্চ কম্যুনিকেশন অ্যান্ড সার্ভিসেস সেন্টার), কোলকাতা দ্বারা যৌথভাবে প্রকাশিত হয়। আমার বহুদিনের বন্ধু অর্ধেন্দু চ্যাটার্জী —তখন তিনি ছিলেন অরভিলে 'ভিলেজ অ্যাকশন গ্রুপে'র সাথে —তিনি ছিলেন 'বাস্তুতাত্ত্বিক চাষ' এই বিভাগটির পরামর্শদাতা। মূল্যবান নথিপত্র (literature) পাওয়া গিয়েছিল বার্নার্ড ডেক্লার্কের কাছ থেকে, যিনি অরভিলে ৯৫ সালে এক জাতীয় জমায়েতের মাধ্যমে ARISE (Agricultural Renewal of India for a Sustainable Environment) নামক উদ্যোগের পিছনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। 'Ecological Vision'-এর এক পরিমার্জিত সংস্করণ প্রকাশিত হয় DRSCS দ্বারা ২০০২ সালে।
- ৫। গুজরাটি ভাষায় মূল লেখাটি লিখেছিলেন মহেন্দ্র ভাট, এবং কপিল সাহ, ১৯৮৭ সালে। এটি মানবয় টেকনোলজী ফোরামের 'সজীব ক্ষেতি'তে প্রকাশিত হয়েছিল। পরে এটি সংক্ষিপ্ত রূপে অনূদিত হয়েছিল আমার দ্বারা

যার সাথে পরিশিষ্ট হিসাবে ছিল ১৯৮৮ সালে ভাস্কর সাভের খামারে আমার প্রথম পরিদর্শনের অভিজ্ঞতা।

৬। See 'Tending the Earth', Winin Pereira's Seminal treatise on 'Traditional, Sustainable Agriculture in India,' The Earthcare Books, 1993, Reprinted in 2007.

৭। 'প্রকৃতি' নামে বোম্বের একটি এন.জি.ও এটি সংগঠিত করেন। এতে 'প্রাকৃতিক কৃষি' বিভাগটির পরিচালনা করেন শ্রী কৃষান মেটা ও 'প্রাকৃতিক যাপন ও স্বাস্থ্য' —এই অংশটির পরিচালনা করেন ডঃ বিজয়া ভেঙ্কট।

৮। আমি উইনিন পেরেরার লেখাগুলি পড়ে বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছিলাম। বিশেষ করে তার 'From Western Science to Liberation Technology', Earthcare Books, 1993 reprinted 2006; এবং 'The Otherside of History' এবং অন্যান্য বেশ কয়েকটি লেখা যা 'Asking the Earth'-এর অন্তর্ভুক্ত। শেষোক্ত বইটি উইনিন জেরমী সীব্রকের সাথে যৌথভাবে লিখেছিলেন যা প্রাকশিত হয়েছিল আদার ইণ্ডিয়া প্রেস দ্বারা। আর্থকেয়ার বুকস্ দ্বারা প্রকাশিত এই দুইজন লেখকের 'গ্লোবাল প্যারাসাইটিস্' ৫০০ বছর ধরে পাশ্চাত্য অর্থনৈতিক আগ্রাসনবাদী সংস্কৃতির এক ভয়ংকর সমালোচনায় মুখর।

৯। দু'বছর ধরে কয়েক ডজন জায়গা ঘুরে আমাদের তিনজন —রামানন্দ কোঁটা, ডি শেষাদ্রী এবং আমি মনোমুগ্ধকর এক বর্ষণ মুখরিত দিনে এই জায়গাটা আবিষ্কার করি —শেষে এই জায়গাটা আমরা আরো বেশ কয়েকজন মিলে কিনে ফেলি। ডঃ বিজয়া ভেঙ্কট আমাদের দলের এক প্রতিষ্ঠাতা সদস্য আমাদের খুব উৎসাহিত ও সাহায্য করেছিলেন।

১০। শুরুতে আমরা প্রধানত (জঙ্গলের একটুকরো জমি পরিস্কার করে নিয়ে) বর্ষার ধান, বজরা, শাকসব্জী, তিল ইত্যাদি ফলাতাম। এর সাথে সাথে আমার নতুন তৈরি করা পথের পাশে এবং জঙ্গল পরিস্কার করা অঞ্চলগুলির সীমানা ধরে খাদ্য ফসলের গাছ পুঁঅতাম যে গাছগুলিতে সেচের প্রয়োজন হয় খুবই কম অথবা শূন্য। গাছগুলি জাম, সজনে, মছয়া, কাজু, আম, আতা ইত্যাদি। আমাদের জল চাষের প্রচেষ্টা একটু সফল হবার পর আমরা সেচ সেবিত শাক-সব্জীর চাষ শুরু করলাম এবং নির্ধারিত খন্ড জমিতে ফলগাছের চাষ শুরু করলাম, আমরা ভাস্কর ভাইয়ের কাছে অনুপ্রাণিত হয়ে সৌর মন্ডল সৃষ্টিতে লেগে গেলাম। একটি অঞ্চলে গোল করে কলা, নারকেল ও পেঁপের চারা লাগলাম। তাদের মাঝে মাঝে বিভিন্ন ধরনের শাক-সব্জী, শুঁটি জাতীয় উদ্ভিদ, ফুল ও গুল্মের চাষ করলাম।

১১। এটি অখিল গুজরাট সজীব ক্ষেতি সমাজ (বা গুজরাট জৈব চাষিদের সমাজ) দ্বারা ‘যতন’ ও অন্যান্য স্থানীয় গোষ্ঠীদের সহায়তায় সংগঠিত হয়েছিল।

টীকা এবং উল্লেখিত গ্রন্থাদি

- ১। Secrets of the Soil by Peter Tomkin and Christopher Bird, Perennial Library, Harper and Raw, 1990, pg. 4. এই বইটির লেখকরা আরো হিসাব করেছেন যে সমস্ত অণুজীবগুলির শরীরের ওজনের যোগফল হল মানুষ সহ সমগ্র প্রাণীদের শরীরের ওজনের ২৫ গুণ।
- ২। An Agricultural Testament by Sir Albert Howard, (first Published in London, in 1940,) Indian Edition, Earthcare Books, 2006, pg.116. “মাটির বিভিন্ন জীবসহ সক্রিয় মূলদের অক্সিজেনের নিরবিচ্ছিন্ন যোগানের প্রয়োজন, ১৩৯ পৃষ্ঠায় হাওয়ার্ড আরো বলেছেন, “বর্ষার শুরুতে ও শেষে যখন মাটিতে ভূতলের মাটিতে প্রচুর পরিমাণ বাতাস ও আর্দ্রতা থাকে, তখন মূলের বৃদ্ধি হয় সর্বোচ্চ। ভারী বর্ষণের সময় মাটিতে এ বায়ু চলাচল ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তখন গাছের মূলেরা মাটির গভীরে না গিয়ে মাটির উপরিতলে শুরফাচে বাড়তে থাকে বেপোরোয়াভাবে অক্সিজেনের সন্ধানে।
- ৩। অধ্যাপক দাভোলকার বিষয়টিকে আরেক রকমভাবে বুঝিয়েছেন। একটি উদ্ভিদকে মাটি থেকে উপড়ে ফেলুন। তার মূলে যতটা মাটি লেগে আছে তা ধুয়ে ফেলুন, এবার উদ্ভিদটিকে খুব ভালভাবে শুকান, আর তারপর একটি ধাতু পাত্রে সম্পূর্ণ পুড়িয়ে ফেলুন।পাত্রে যতটা ছাই পড়ে রইল সেই ওজনই উদ্ভিদটি মাটি থেকে সংগ্রহ করেছে, বায়ু বা জল থেকে নয়। তিনি আরো বলেন একটি কিচেন গার্ডেনে ১০০ বর্গফুট অঞ্চল জুড়ে যতটা উদ্ভিদ থাকে তাদের থেকে এইভাবে দুই বা তিন মুঠো ছাই পাওয়া যাবে — সেটা হল মাটি থেকে আহরণ করা সমস্ত খনিজের সমান। (Ref. ‘City Farming, S.A. DabholkarDr. Joshi City Farming Institute’, 1994,pg.5)
- ৪। The Web of Life by John Storer, 1953, Mentor, pg.32.
- ৫। পূর্বে উল্লেখিত, পৃষ্ঠা – ৩২।
- ৬। An Agricultural Testament (at) pg.23- তে স্যার অ্যালবার্ট হাওয়ার্ড লিখছেন যে উদ্ভিদের ভাল বৃদ্ধির প্রাথমিক শর্তটি হল ভূতলের ভিতর দিকে (Internal Surface) –মাটির কণাগুলির মধ্যবর্তী ছিদ্রগুলি (The pore Space) যতবড় হয় তত ভাল। এই ছিদ্রগুলির দেওয়ালগুলিতে জলের সুক্ষ্ম ফিল্ম গুলিতে ঘেরা থেকে, মাটির ব্যাকটেরিয়া, ফানজী, ও অণুজীবদের গুরুত্বপূর্ণ কর্মকান্ড গুলি ঘটে, এই সমস্ত কর্মকান্ড শ্বসনের ওপর

নির্ভর করে, যার জন্য যথেষ্ট পরিমাণ অক্সিজেনের যোগান অত্যন্ত জরুরী। তাই মাটিতে যাতে অক্সিজেন চলাচল করতে পারে এটা দেখা বাধ্যতামূলক। ৭। (The web of life by John H. Storer, 1953, Mentor, pg. 32 চ। মূলের আঁশের মত রোমগুলি অল্প নিঃসরণ করে, যা পাথরের গায়ে খনিজগুলিকে দ্রবীভূত করে। এই খনিজকে দ্রবীভূত করার প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়েই রোমেরা পাথর খেয়ে খেয়ে পাথরের ভিতর দিয়ে বাতাস, আর্দ্রতা ও মাটির পথিকৃৎ জীবগুলির প্রবেশের পথ করে দেয় এবং এরই ফলে পাথরের ক্ষয় (Weathering) চলতেই থাকে। তাপমাত্রা বদলের ফলে পাথরে চিড় দেখা যায় এবং বিভিন্ন ঋতুতে পাথরের বৃদ্ধি ও সংকোচন ও দেখা যায়। তাছাড়া বৃষ্টি পড়বার সময় তারা বাতাস থেকে কার্বন ডাই-অক্সাইড শোষণ করে কার্বনিক অ্যাসিডে রূপান্তরিত হয়। কার্বনিক ও অন্যান্য অ্যাসিড ও সৃষ্টি হয় মাটিতে জৈব বস্তু পচনের ফলে। বছর বছর ধরে এই অ্যাসিডরা ধীরে ধীরে পাথরের তল থেকে আরো বেশি মাত্রায় খনিজকে দ্রবীভূত করে, এই প্রক্রিয়ায় পাথরের নীচের স্তরে অনেক গর্ত (Crevices) সৃষ্টি হয় যেখানে জল জমতে পারে। যে আর্দ্রতা দ্বারা পাথরের নীচের স্তরের লবণ দ্রবীভূত হয় তারা গাছের মূল ব্যবস্থার (root system) উপরিতলে উঠে আসে, যেখানে এই মূল ব্যবস্থা বিশাল সব পাম্পের মত কাজ করে। ৯। বিভিন্ন মাটির বিভিন্ন জলধারণ ক্ষমতা নিম্নলিখিত পরীক্ষার দ্বারা বোঝা যায়।

এক কেজি করে বিভিন্ন ধরনের (শুকনো) মাটির নমুনা সংগ্রহ করুন। প্রতিটি মাটির নমুনাকে একটি কাপড়ে ভালভাবে মুড়ুন। এরপর এই কাপড় মোড়া মাটি জলে ভিজিয়ে রাখুন —প্রতিটিই পনের মিনিটের জন্য। এবার প্রতিটি নমুনা থেকে কাপড় সরিয়ে তাদের আলাদা আলাদা করে মাপুন, যাতে করে প্রতিটি মাটির নমুনা কতটা করে জল শুষেছে তা বোঝা যায়। কয়েক ঘন্টা পর প্রত্যেকটিকে আবার মাপুন। এবার মাটি কতটা জল ধরে রেখেছে তা আপনি ওজন থেকে বুঝতে পারবেন। দেখা যাবে যে জৈব, ভেদ্য মাটি রাসায়নিক সেবিত মাটির থেকে অনেক বেশি জল শুষেছে এবং ধরে রেখেছে।

এই পরীক্ষার এক সামান্য বদলানো রূপেও দেখা যাবে যে সমস্ত জৈব (জীবিত) মাটিতে জল নিকাশও হয় খুব দ্রুত —উপরিতলে জমে থাকা জল ত্রমগত নীচে চুইয়ে পড়ে অতিরিক্ত জল বের করে দেয়। তারা আবহমন্ডলীর সাথে সরাসরি সম্পর্ক স্থাপন করে বেশি হাওয়ার

যোগানের ব্যবস্থা পুনরায় ফিরিয়ে আনে। রাসায়নিক মাটিতে জল শোষণের কম ক্ষমতার সাথে সাথে জলনিকাশের ক্ষমতাও খুব কম। ভারী মাটি যেমন কাদা ও পলি ক্ষুদ্র কণাসহ আটসাঁট ভাবে জড়িয়ে থাকে —সেই মাটির জল ধারণ ক্ষমতা খুব বেশি। কিন্তু যেহেতু এই জাতীয় মাটির নিকাশী ক্ষমতা খুবই কম, এই মাটি বায়ুর অভাবে ভোগে। ক্ষেলের আরেকটি দিকের শেষে —মোটা আলগা দানার মাটিতে জল নিকাশ হয় অত্যন্ত ভাল এবং তা শুকায় ও খুব তাড়াতাড়ি, কিন্তু বাতাসের অভাবের সমস্যা এই ধরনের মাটিতে বিরল।

বাস্তবত সমস্যাটির দু’টি চূড়ান্ত দিক হল জল জমে থাকা অথবা খুব বেশি মাত্রায় জল বেড়িয়ে যাওয়া —এই দুটি ত্রুটিই শুধরানো যায় মাটি বেশি পরিমাণে জৈব বস্তুর যোগান দিয়ে। কারণ মৃত গাছ-পাতাদের একটা দারুণ ক্ষমতা হল তারা আলগা গঠনের বালি মাটিকে বেঁধে রাখতে পারে। তারা আবার কাদা ও পলির মত ঘন মাটিকে ভেঙে ফেলতে পারে এবং এই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে তারা বেশ সুক্ষ দানার দোঁয়াশ মাটি তৈরি করে যার রয়েছে দুটি সুবিধা : ১। ভাল জল ধারণ ক্ষমতা, ২। ভাল জল নিকাশী ক্ষমতা।

১০। এটি তাৎপর্যপূর্ণ যে গাছের মূলের শ্বসন ক্রিয়া কখন বৃষ্টির দ্বারা বিঘ্নিত হয় না। কিন্তু আপনি বৃষ্টি সমপরিমাণ জল কোনো গভীর বোর ওয়েল থেকে দিন, দেখবেন গাছের মূলের শ্বসনের ক্ষতি হবে। কারণ গভীর বোর ওয়েলের জলে দ্রবীভূত অক্সিজেনের মাত্রা কম। কিন্তু বৃষ্টি হল অক্সিজেন সংস্পৃক্ত দ্রবন।

১১। (Turning up the Heat by Fred Pierce, Paladin, 1989, pg.5)

১২। ‘The Viloence of Green Revolution’, by Vandana Shiva, 1989, pg. 88, Third World Network.

১৩। পূর্বে উল্লেখিত পৃষ্ঠা ৫৪, PAO স্ট্যাটিসটিকস্ উদ্ধৃতি করা হয়েছে,

১৪। বিল মলিশন লিখেছেন যে বেশির ভাগ গাছের ক্ষেত্রে মূল ব্যবস্থার (root system) ৮০-৯০% থাকে মাটির ওপরের দিকে ৬০ সেনিমির মধ্যে। এটি হাজার হাজার কিলোমিটার বিস্তৃত মূলরোম দিয়ে তৈরি যা ভূতলের কাছাকাছি একটা মাদুরের মত ছড়িয়ে থাকে। মাত্র ১০-১২% মূলভর এর নীচে থাকে (দু ফুটের নীচে)। কিন্তু কিছু কিছু মূল পাথর ভেদ করে ৪০ মিটার গভীরে প্রবেশ করতে পারে। (‘Permaculture : A designor's MAnnual’ by Bill Mallison, Tagari, 1988, pg. 150.)

১৫। Personal correspondence from Shri Mahendra Bhall, an organic farming activist since several decades

১৬। সাধারণত অপরাহ্নে বা সন্ধ্যায় সেচ দেওয়া ভাল। এতে বাষ্পীভবন কম হয় এবং গাছের মূলের আঘাত বা শক কম হয়। তাছাড়া কম বয়সী কোন গাছের পরিণত গাছের তুলনায় একটু বেশি বা বার বার জল দিতে হয়। গাছ বড় হওয়ার সাথে সাথে তার মাথার ওপর পাতার ছাতা বিকশিত হলে মাটি হয় ছায়াময়, বাষ্পীভবনও কম হয় ফলে, সেচের প্রয়োজনও কমে আসে। অভিজ্ঞ চাষিরা যাদের দেখার চোখ তৈরি হয়েছে তারা দেখতে পান ‘জানান দিচ্ছে’ তাদের আছে কিনা।

১৭। উপকূল অঞ্চলে গাছের ওপর ঘনীভবন (condensation) (এবং মাটির হিউমাস দ্বারা বায়ুমণ্ডলের আর্দ্রতার সরাসরি শোষণ) বিভিন্ন রূপে মাটিতে যে জল নেমে আসে সেই অধক্ষেপের (Precipitation) সমগ্র পরিমাণের প্রায় ৮০-৮৫% পর্যন্ত হতে পারে, একথা লিখেছেন বিল মলিসন, op at pg. 144

১৮। বর্জ্য পাতারা মাটিকে ঢেকে রেখে তীব্র রোদ ও বৃষ্টির বাড়ির হাত থেকে রক্ষা করে, বর্ষা জোরদার হয়ার আগেই নতুন গাছ-পাতারা সজীব ও সবুজ হয়ে ছড়িয়ে পড়ে যা বৃষ্টির হাতুড়ির বাড়ির থেকে মাটিকে আরো বেশি সুরক্ষা দেয়। তা না হলে বৃষ্টির আঘাতে প্রচুর উপরিতলের মাটি নষ্ট হতে পারত বিশেষত ঢালু অঞ্চলে।

১৯। যদি ফসলে সমস্ত অবশেষ ও আবর্জনা ধর্মীয় নিষ্ঠায় মাটিতে ফেরৎ দেওয়া হয়, তাহলে দিনে দিনে মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি পাবে। যেহেতু পরিণত গাছের মূলের মাটির নীচের স্তর থেকে (Sub-soil) এবং নীচে পাথর গুলি থেকে দ্রবীভূত খনিজ পাম্প করে মাটির ওপরে তোলে, গাছেরা পুষ্টির অভাবে ভোগে না।

২০। মোহন দেশ পান্ডে, জৈব চাষি, ১৯৯৪ সালে বিদাদা কক্ষে একটি জমায়েতে বলেছিলেন, যেখানে ভাস্কর সাভেও অংশগ্রহণ করেছিলেন, শ্রী দেশপান্ডে তার বক্তৃতা শুরু করেন নাটকীয়ভাবে, ‘কে বলে কক্ষে বৃষ্টি হয় না।’

২১। “যুদ্ধের শেষে আমেরিকায় ১৮টি নতুন অ্যামোনিয়া কারখানা, যেগুলি তৈরি করা হয়েছিল বিস্ফোরক প্রস্তুত করবার জন্য —তাদের উদ্ভূত উৎপাদনের জন্য নতুন বাজার ধরা বাধ্যতামূলক হয়ে দাড়ালো। ডু-পন্ট, ডাউ, মনসাটো, আমেরিকান সিনামাইড তাদের যুদ্ধকালীন বিশাল লাভ সহ আরো বেশি বেশি সার উৎপাদন করতে লাগল অক্লান্ত চাষিদের ওপর ঢালবে বলে।

(‘Secrets of the Soil’ op cit. pg. xvii)

২২। ‘An Agricultural Testament’ by Albert Howard op cit pg. 28-30

২৩। ‘Organic farming’, pg. 18 transcript and key note address by Dr Shailendra Nath Ghosh at the National Convention on Organic farming, Sambardhan, 1984.

২৪। ফলের গাছগুলির চারপাশে সাধারণত কর্ষণ কাজ করা হয়। কিন্তু ভাস্কর সাভে তা করেন না। শুরুতে তার লক্ষ্য হল মাটিকে সবুজ গাছ-পাতায় (তা আগাছা হোক অথবা শাক-সব্জী) ঢেকে দেওয়া এবং তা বজায় রাখা। এটিই হল বাগিচা প্রস্তুত করার ক্ষেত্রে তার প্রথম কাজ এবং কর্ষণের কাজ কখনও নয়, আগাছে খুব বেড়ে গেলে, বড়জোর তাদের অতিরিক্ত বৃদ্ধি ঠেকাতে তাদের ছেঁটে ফেলে তা দিয়ে মাটির ওপর আচ্ছাদন তৈরি করা যেতে পারে। এইরকম ছাঁটার কাজ বছরে এক বা দু’বার করা যেতে পারে। এর ফলাফলও হয় খুব ভাল।

ফুকুওকা বলেন, কুড়ি বছর আগে জাপানের কোনো বাগিচায় ঘাসের একটাও ফলক (blade) দেখা যেত না। আমার মত বাগিচা লক্ষ্য করে লোকজন বুঝতে শুরু করল যে ফলের গাছ আগাছা বা ঘাসের মধ্যে বেশ ভালোভাবেই বাড়তে পারে। আজ ঘাসে ঢাকা বাগিচা সারা জাপান জুড়ে খুবই সাধারণ দৃশ্য।”

অন্নপূর্ণা প্রাকৃতিক প্রাচুর্য



“প্রাকৃতিক চাষের ওপর রয়েছে মা অন্নপূর্ণা — সকল জীবের অন্নদাত্রী দেবীর আশীর্বাদ”, ভাস্কর সাভে, প্রাচীন প্রাজ্ঞ সেই মানুষটি তাঁর সুদীর্ঘ অভিজ্ঞতালব্ধ শাস্ত্র প্রত্যয়ের সাথে একথা বলে চলেছেন। মহারাষ্ট্র-গুজরাত সীমান্তের কয়েক কিলোমিটার উত্তরে সাগরপারের গ্রাম দেহরিতে তিনি অসীম মমতা দিয়ে লালন করেছেন এক অপূর্ব ফলের বাগান ও জৈব খামার।

এখানে দীর্ঘ নারকেল গাছগুলির প্রত্যেকটি এক শতাব্দী ধরে প্রতি বছরে ৩৫০টি বড়ো নারকেল দেয়। একটি সবোদা গাছ আরও বেশি বছর বাঁচে। এই গাছ আদি বৃক্ষরোপণ থেকে অন্তত নয়টি প্রজন্ম ধরে তার ফল দেয়। প্রতিটি গাছ তার জীবৎকালে ৬০ টন সুমিষ্ট পুষ্টি জোগায়। এই রকম প্রয়োজনীয় গাছের হাজার হাজার প্রজাতি এদেশের বিচিত্র পরিবেশ-পরিস্থিতির সাথে মানিয়ে নিয়ে বেড়ে ওঠে। প্রকৃতি যেখানে বদান্যতায় এমন মহানুভব সেখানে আমাদের লোকজন কেন খাদ্যাভাবে অথবা কোনো বুনিয়াদি চাহিদার অভাবে ভুগবে? — ভাস্কর সাভে এই প্রশ্ন তুলেছেন।

কল্লুবৃক্ষ

১৪ একর জুড়ে সাভের সবুজ বাগিচা-খামার কল্লুবৃক্ষের প্রবেশদ্বারে উজ্জ্বল নীল ও সাদা সাইনবোর্ডে লেখা “সু-স্বাগতম” — মঙ্গলময় আহ্বানের জন্য ভারতের ঐতিহ্যগত অভিবাদন। ভিতরে প্রবেশ করেই যে কেউ অনুভব করবে জায়গাটার বিশেষত্ব। এ যেন এক নিক্ক মলম যার আলতো ছোঁয়ায় আমাদের সময়ের অস্থিরতা ও দুঃসহ ক্লান্তি ধীরে ধীরে মিলিয়ে যায়।

প্রবেশদ্বার থেকে প্রায় কুড়ি পা দূরে একটি বোর্ডে সাইন বলছে ‘সহযোগিতাই প্রকৃতির মৌলিক নিয়ম’ — প্রাকৃতিক কৃষির দর্শন ও প্রয়োগের এক সহজ ও সংক্ষিপ্ত সূচনা। খামারের আরও ভিতরে রয়েছে অন্যান্য অসংখ্য সাইন, সেগুলিতে লেখা সংক্ষিপ্ত চিন্তা-উসকে দেওয়া সূত্র বা জ্ঞানগর্ভ বাণীগুলি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এই তীক্ষ্ণ প্রবাদগুলিতে

রয়েছে প্রকৃতি, কৃষি, স্বাস্থ্য ও আধ্যাত্মিকতা সম্বন্ধীয় জ্ঞানের নির্যাস যা অসাধারণ খাদ্য ফলানো ছাড়াও ভাস্করভাই সংগ্রহ করেছেন বহুবছর ধরে।।

আপনি যদি এই কৃষককে জিজ্ঞাসা করেন, কোথা থেকে তিনি এই প্রাকৃতিক কৃষি পদ্ধতি শিখলেন, তিনি হয়তো অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে বলবেন, “আমার খামারই আমার বিশ্ববিদ্যালয়”, তাঁর খামার আজ বহু মানুষের কাছে হয়ে উঠেছে এক পবিত্র বিশ্ববিদ্যালয়। কারণ প্রতি শনিবার বিকালে (দর্শনাধীশের দিন) অসংখ্য মানুষ এখানে আসেন। সারা দেশ থেকে আসা মানুষজনের মধ্যে থাকেন কৃষক, কৃষি-বিজ্ঞানী, ছাত্র-ছাত্রী, উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মচারী, শহরের মানুষজন, আবার কখনও বা দূর দেশ থেকে আসা ভ্রমণার্থী — যারা ভাস্কর সাভের কাজ প্রসঙ্গে পড়েছে বা শুনেছে।



কল্লুবৃক্ষ আমাদের আকৃষ্ট হতে বাধ্য করে, কারণ উচ্চ-উৎপাদনে এটি

রাসায়নিক ব্যবহারকারী যে কোনো আধুনিক খামারকে অনায়াসে পিছনে ফেলে দেয়। যে কোনো সময়ে তা সহজেই দেখা যায়। প্রতিটি গাছ যে সংখ্যক নারকেল দেয়, সম্ভবত তা সারা দেশের মধ্যে সর্বোচ্চ। যেখানে প্রতিটি গাছের গড় উৎপাদন বছরে প্রায় ৩৫০টি, কয়েকটি গাছের প্রতি বছরে ৪০০টিরও বেশি। সবোদা গাছগুলির (যাদের বেশিরভাগই পোঁতা হয়েছিল ৪০ বছরের আগে) ফলন তেমনি প্রচুর। প্রতিটি গাছ বছরে গড়ে প্রায় ৩০০ কেজি সুস্বাদু ফল দেয়।

এছাড়া বাগিচায় রয়েছে অসংখ্য কলা, পেঁপে, সুপুরি গাছ এবং কিছু খেজুর, সজনে, আম, কাঁঠাল, তাল, আতা, জাম, পেয়ারা, ডালিম, লেবু, মছয়া, তেঁতুল, নিম, পোমেলো ইত্যাদি ফলের গাছ। এছাড়াও রয়েছে কিছু বাঁশঝাড় সহ বিভিন্ন ছোটো গুল্ম। যেমন ক্রেটন, কারিপাতা, তুলসি এবং লতানো গাছ যেমন গোল মরিচ, পানপাতা, প্যাশান ফ্রুট ইত্যাদি।

দু-একর জমিতে নবাবি কলমের এক লম্বা, সুস্বাদু ও উচ্চফলনশীল দেশজ প্রজাতির ধান, বেশ কয়েক ধরনের ডাল, শীতের গম ও কিছু সবজি এবং কন্দ ও চাষ হয় ঋতুর আবর্তন অনুযায়ী। এই স্ব-পোষিত কৃষকের নিজ পরিবার ও কখনও সখনও অতিথিদের জন্য এই উৎপাদন যথেষ্ট। (বর্তমানে এই পরিবারে দুজন নাতি-নাতনি সহ সদস্য সংখ্যা ৭, ভাস্কর সাভের দুই বড়ো নাতনি বিবাহিত এবং তাঁরা প্রত্যেকেই পরিবারে একটি করে পুতি দিয়েছেন।) বেশির ভাগ বছরেই চাল উদ্ভূত হয়, যা দেওয়া হয় আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুদের, যারা এই চালের সুগন্ধ ও গুণের প্রশংসা করে।



কল্লবৃক্ষ : যে গাছ ইচ্ছা পূরণ করে

নারকেল গাছ (কোকোস নুসিফেরা) হল সৌভাগ্যের প্রতীক। এই গাছ ভারতে এক পবিত্র গাছ হিসাবে শ্রদ্ধা পায়, যা ইচ্ছা পূরণ করে। দেবদেবীদের আশীর্বাদ পাওয়ার জন্য বিভিন্ন উদ্যোগের উদ্বোধন করা হয় নারকেল ফাটিয়ে। ভারতীয় লোক কাহিনিতে এই গাছকে কেন্দ্র করে রয়েছে অনেক কল্পকথা, যেগুলি এই গাছের সাথে যুক্ত মহৎ সাংস্কৃতিক মূল্যকে প্রকাশ করে।

নারকেল গাছের প্রতিটি অংশই মূল্যবান। বুনো নারকেলের শাঁস অত্যন্ত পুষ্টিকর ও সহজপাচ্য। এটিকে একটি সম্পূর্ণ (perfect) খাবার বলা হয়। নারকেল কোড়া ব্যবহৃত হয় নানারকম মিষ্টি তৈরি ও তরকারি সহ অন্যান্য রন্ধন প্রণালীতে। কচি নারকেল বা ডাবের স্বচ্ছ জল সুস্বাদু, শিষ্ণু ও প্রাণ সঞ্জীবনী টনিকের মতো, যার সমৃদ্ধ খনিজ শরীরে সহজে শোষিত হয়। এই জল শরীর থেকে বিষ বের করে দেওয়ার ক্ষেত্রে দারুণ কার্যকর। এটি খালি পেটে পান করা সবচেয়ে ভালো। পেটের অসুখ হলে এটি সবচেয়ে ভালো পথ্য।

নারকেলের শুকনো শাঁসে রয়েছে প্রচুর তেল যা সাধারণত রান্নায় ব্যবহার করা হয়। আবার তা সাবান, চুলের তেল, প্রসাধনী ও শ্যাম্পু প্রস্তুতেও ব্যবহৃত হয়। নারকেল ছোবড়া থেকে দড়ি, মাদুর, ঝুড়ি ও ব্রাশ তৈরি করা হয়। কিন্তু আরও বেশি ব্যবহৃত হয় গ্রামীণ কুটির ছাদ তৈরিতে যা জল নিরোধক ও সস্তাও বটে। যখন গাছটি মারা যায় তার কাণ্ডের কাঠ থেকে তৈরি হয় বাড়ির আসবাব। আর তার মূল মাটির অসংখ্য পোকামাকড়দের পুষ্টি জোগায় এবং মাটির পুষ্টি-চক্রকে চলমান রাখে।

ভাস্কর সাভের খামারে বৈচিত্র্যময় উদ্ভিদরাজি ঘন গাছপালার এক সাযুজ্যপূর্ণ মিশ্র জনগোষ্ঠীর মতো সহাবস্থান করে। খামারে কোথাও দেখবেন

না যে এক টুকরো জমি বাতাস, বৃষ্টি ও রোদের বাড়ি খাওয়ার জন্য উন্মুক্ত হয়ে আছে। সবেদা গাছগুলির নিচে ঘন ছায়ায় ঢাকা মাটির উপরে আছে স্পঞ্জের কার্পেটের মতো পাতার আচ্ছাদন। যেখানে সূর্যের আলো প্রবেশ করে সেখানে গজিয়ে ওঠে বিভিন্ন আগাছা।

ঘন এই আচ্ছাদন মাটির অনু-জলবায়ু (micro-climate) সৃষ্টিতে এক চমৎকার নিয়ন্ত্রকের ভূমিকা পালন করে। ভাস্কর সাভে মনে করেন, এটা কৃষি কাজের এক অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। “গ্রীষ্মের এক তপ্ত দিনে, গাছপালার ছায়া অথবা পাতার আচ্ছাদন ভূপৃষ্ঠে ঠান্ডা ও স্যাঁতসেঁতে ভাব (damp) বজায় রাখে। শীতের শীতল রাতগুলিতে মাটির এই আচ্ছাদন সারাদিন ধরে পাওয়া মাটির উষ্ণতা কন্সলের মতো ধরে রাখে। ঘন গাছপাতার ছাতার নিচে আর্দ্রতাও থাকে অনেক বেশি, ফলে বাষ্পীভবনও হয় অনেক কম। স্বভাবতই সেচের প্রয়োজনও অনেকাংশে কমে যায়। এরকম একটা পরিবেশে মাটির পোকামাকড় ও অসংখ্য জীবাণু দ্রুত বেড়ে ওঠে।



সবেদা গাছের ছায়ায় শুকনো পাতার আচ্ছাদন; যেখানে মাটিতে সূর্যালোক প্রবেশ করতে পারে সেখানে আগাছার (সজীব আচ্ছাদন) জন্ম হয়।

প্রকৃতির খননকারী এবং পুষ্টি নির্মাতারা

এক শতাব্দী আগে চার্লস ডারউইন কোনো কারণ ছাড়া একথা ঘোষণা করেননি যে পৃথিবীর ইতিহাসে কেঁচো যে ভূমিকা পালন করে তা অন্য

কোনো জীব পালন করে কি না তা নিয়ে সন্দেহ আছে। ভাস্কর সাভে দৃঢ়তার সাথে বলেন, “একজন কৃষক যিনি কেঁচো ও মাটিতে বাস করা অন্যান্য ক্ষুদ্র জীবদের বংশবৃদ্ধিতে সাহায্য করেন, তিনি নিশ্চিতভাবে সমৃদ্ধির পথে ফিরে এসেছেন।”

অন্ধকার স্যাঁতসেঁতে, বেশি গরম ও বেশি শীত থেকে সুরক্ষিত, জীবভরের (biomass) প্রাচুর্য্যে পরিপূর্ণ, ভালো বায়ু চলাচল করে এমন মাটি হল কেঁচোর বৃদ্ধির পক্ষে আদর্শ, এই অক্লান্ত কর্মীরা মাটি সহ ঝুরঝুরে বর্জ্য পাতার মতো জৈব পদার্থ খেয়ে হজম করে আর প্রতি ২৪ ঘন্টায় তাদের শরীরের ওজনের দেড়গুণ সমৃদ্ধ কম্পোস্ট সার সৃষ্টি করে যার মধ্যে উচ্চমাত্রায় উদ্ভিদের সমস্ত রকম পুষ্টির উপাদান রয়েছে।

ভর্মি-কম্পোস্ট বা কেঁচোসার হল উর্বরতার ভাণ্ডার। সংলগ্ন অন্য আদি-মাটির (parent soil) তুলনায় কেঁচোর মলে থাকে দ্বিগুণ ম্যাগনেসিয়াম, ৫ গুণ নাইট্রোজেন, ৭ গুণ ফসফরাস ও ১১ গুণ পটাশ। এছাড়া আশপাশের অন্য মাটির তুলনায়, বিশেষত যেখানে রাসায়নিকের ব্যবহার করা হয়েছে, তার চেয়ে কেঁচোর মলে ব্যাকটেরিয়ার জনসংখ্যা থাকে প্রায় ১০০ গুণ বেশি।



গাছের পাতার আচ্ছাদনের নীচ থেকে কেঁচোর মল-সার। ভাস্কর ভাইয়ের হিসাবে প্রতি একর জমিতে প্রতি বছর কেঁচোরা অন্তত ছয়গুণ পুষ্তিকর কাস্টিং (মল) সার দেয়। আর এটি হল উঁচু মানের জৈব সার যা চাষিরা পয়সার অভাবে কিনতে পারে না — এই কেঁচো সারে অধিক সংখ্যক উপকারী ব্যাকটেরিয়া ও অ্যাকটিনোমাইসিট ছাড়াও রয়েছে বহু রকমের উৎসেচক। প্রথম বৃষ্টির পরে বিশেষত সৌঁদা মাটি থেকে যে সুগন্ধ বের হয় তা আসলে সূক্ষ্ম জীবাণু, অ্যাক্টিনোমাইসিটসদের শরীর

থেকে নির্গত হয়। ঠিক এই সময়েই অসংখ্য কেঁচো তাদের রেশম-গুটি থেকে বেরিয়ে আসে।

কেঁচোরা কুরে কুরে মাটি খায় এবং তা করতে গিয়ে তারা নিপুণভাবে মাটিকে খনন করে, ফলে মাটি হয় বুরু বুরু (porous)। এর ফলে মাটিতে বায়ু ও ভাসমান জলকণা ধারণ করার ক্ষমতা বেড়ে যায়। মাটির এই গুণগুলি গাছের শিকড়ের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। কেঁচোর মল-বর্জ্য (castings) খুব ভালো বায়ু চলাচল করে। এগুলি খুব ভালো জল শোষণ করে, আবার অতিরিক্ত জলও বের করে দিতে পারে। এরা একটি সুস্থির সমষ্টির (stable aggregate) সৃষ্টি করে যাতে মাটি-কণাগুলি একে অপরকে ঘনসংবদ্ধভাবে আঁকড়ে থাকে আর ভূমিক্ষয় প্রতিরোধ করে।

মাটিতে বাস করা আরও অনেক জীব যেমন পিঁপড়ে, উই ও বহু প্রজাতির জীবাণু অনুরূপভাবে মাটির ভৌত প্রস্তুতিতে (Physical Conditioning) সাহায্য করে। প্রাকৃতিক খামারের প্রতি বর্গফুট মাটিতে রয়েছে এরকম অসংখ্য সহযোগী জীব। (দেখুন কেঁচো ও সজীব মাটি, পৃষ্ঠা ৪১)

অবশ্য পোকাদের সেনাবাহিনীকে দিয়ে তিনি তাঁর জন্য কাজ করাতে পারেন — এমন কোনো দাবি ভাস্কর সাভে করলেন না। তিনি বললেন, “এটা হয় প্রাকৃতিক ভাবে”, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হল এটা ঘটতে দেওয়া। তার জন্য যা দরকার তা হল — রাসায়নিক সার বা কীটনাশক, অতিরিক্ত খনন বা খুব বেশি সেচ ইত্যাদি ক্ষীণ-দৃষ্টি সজ্জাত প্রযুক্তি ব্যবহার থেকে বিরত থাকা।

আধুনিক কৃষির ব্যবহারিক প্রয়োগ মাটির জৈব জীবনের ওপর মারাত্মক প্রভাব ফেলেছে। রাসায়নিকের বিষের প্রভাবে বহু রকমের খননকারী জীব মারা যায় অথবা ট্রাক্টরের ভারী ওজনের নিচে পিষে যায়। এর ফলে মাটি শক্ত ও জমাট হয়ে গেছে। এই সমস্যা আরও ঘনীভূত হয় জল নিষ্কাশনের অভাবে ভূতল লবণাক্তকরণের জন্য।

মাটির প্রাকৃতিক উর্বরতা ধ্বংস করে, আমরা কার্যত আরও বেশি করে বাহ্যিক জোগান (external input) ও আমাদের জন্য বেশি শ্রমের কৃত্রিম চাহিদা সৃষ্টি করি, অথচ এগুলির ফল হয় নিম্নমানের এবং এগুলি সবদিক থেকেই বেশি খরচ সাপেক্ষ। ভাস্কর সাভে জোরের সঙ্গে বলেন, “সজীব মাটি হল এক জৈব ঐক্য (organic unity) আর তাই জীবনের বিস্তৃত জালকে (Web of life) তার সমগ্রতায় রক্ষা ও লালন করতে হবে। প্রাকৃতিক কৃষিই সেই পথ।

আগাছা : বুনো বন্ধুরা

“প্রকৃতিতে প্রতিটি দীন (humble) জীব ও উদ্ভিদ বাস্তুতন্ত্রের কর্মকাণ্ডে তার ভূমিকা পালন করে। প্রতিটি জীবই খাদ্য-শৃঙ্খলের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। কোনো প্রজাতি নিষ্কাশিত বর্জ্য পদার্থ হল অন্য কোনো প্রজাতির খাদ্য। মৃত্যুর পরেও প্রতিটি জীব, খসে পড়া পাতা অথবা শুকনো ঘাসের পাতা (blade) পিছনে ফেলে রেখে যায় পুষ্টি-চক্র তার অবদান, যাতে নবজীবন প্রসার লাভ করে।” তাই ভাস্কর ভাইয়ের আর্জি হল — যদি সত্যিই আমরা বাস্তুতন্ত্রের সাযুজ্য ফিরে পেতে চাই, তাহলে প্রথম নীতিটি যা আমাদের অবশ্যই পালন করতে শিখতে হবে তা হল “বাঁচো এবং বাঁচতে দাও”।

যেহেতু প্রকৃতির বিধানে প্রতিটি উদ্ভিদকে তার সাথে মাটি ও মাটিতে বাস করা জীবদের সম্পর্ক বজায় রাখার জন্য কিছু নির্ধারিত কাজ করে যেতে হয়, যাদের আমরা অবাস্তিত আগাছা বলে মনে করি তাদের উপড়ে ফেলার আগে আমাদের অত্যন্ত সতর্কতার সাথে ভাবতে হবে। বিশেষ করে রাসায়নিক ছিটানো ও ভারী ট্রাক্টরের ব্যবহার ইত্যাদি ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপগুলি সম্পূর্ণ রূপে বর্জন করতে হবে।” কল্পবৃক্ষে অপ্রয়োজনীয় কাজে কোনো শ্রমই নষ্ট হয় না, এমনকী হাতে করে আগাছা উচ্ছেদের কাজও। যদি কখনও এই আগাছাগুলি নতুন চারাদের ঢেকে দিয়ে তাদের সূর্যের আলো থেকে বঞ্চিত করে, সেগুলি ছেঁটে ফেলে মাটির ওপর আচ্ছাদনে ব্যবহার করা যেতে পারে। যান্ত্রিক খননের চেয়ে হাতে করে আগাছা উচ্ছেদে মাটির জৈবজীবন কম ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তবুও তা না করলেই ভালো। অন্যদিকে আগাছা ভূতল থেকে বেশি বৃদ্ধি পেলে তাকে উচ্ছেদ না করে, মূলগুলির ক্ষতি না করে, যদি তা কেটে মাটিতে ফেলে রাখা হয়, তা ‘আচ্ছাদনের’ মতো কাজ করে যা থেকে মাটি অসংখ্য উপায়ে উপকৃত হয়।

মাটির ওপরে আচ্ছাদন থাকলে বাতাস ও বৃষ্টির দ্বারা মাটির ক্ষয় কম হয়, মাটি জমাট ও শক্ত হয়ে যাওয়ার হাত থেকে বাঁচে, বাষ্পীভবন হয় কম এবং সেচের প্রয়োজনও কমে যায়। এই আচ্ছাদনের ফলে মাটিতে বায়ু চলাচল হয় বেশি, জলকণাও বেশি শোষিত হয় এবং মাটি হয় তাপ ও শীত নিরোধক। আচ্ছাদন কেঁচো ও জীবানুদের খাদ্য সরবরাহ করে যাতে ফসলের জন্য নাইট্রোজেন-সমৃদ্ধ কম্পোস্ট দিতে পারে। এছাড়া যেহেতু আগাছাদের মূলগুলি মাটিতে থেকে যায়, সেগুলি মাটিকে বেঁধে রাখার কাজ চালিয়ে যায় এবং ভূতলের আচ্ছাদনের মতো মাটিতে মিশে গিয়ে খাদ্য

হিসাবে মাটিতে বাস করা জীবদের সেবা করে।

ভান্ডারভাই উল্লেখ করলেন যে গাছ ফলানোর আধুনিক উৎপাদনে আগাছাদের প্রতি এক ভয়ংকর বিরূপ ধারণা বর্তমানে রয়েছে। তার উৎস রয়েছে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক অতীতে। শীতলতর বা নাতিশীতোষ্ণ (temperate) আবহাওয়ায় মাটিতে ব্যাক্টেরিয়ার সংখ্যা থাকে অনেক কম এবং তাদের সক্রিয়তাও হয় অনেক কম। ফলে সেখানে মাটিতে উদ্ভিদের অবশেষের (residual matter) পচন ঘটে অনেক ধীর গতিতে। একারণেই সময়ের নিয়মিত ব্যবধানে (periodically) মাটিতে জৈববস্তুর এক তত্ত্বজ আসনের পূর্ণ সৃষ্টিতে আগাছা ও পাতার আচ্ছাদনের অপরিসীম গুরুত্বকে বেশিরভাগ ইংরেজ বুঝতে অক্ষম ছিল। তারা এটা বুঝতে অক্ষম ছিল যে আমাদের মতো গরম ও বিপুল বৃষ্টির দেশে ভূমিক্ষয় রোধে আগাছা ও পাতার আচ্ছাদনের ভূমিকা অনস্বীকার্য।

যেসব ঔপনিবেশিক (ব্রিটিশ) বনকর্মীদের ভারতে পাঠানো হত, তাদের বৃক্ষরোপণের এমন এক ধরনের প্রবণতা ছিল যাতে তারা সেগুন ইত্যাদি (দু)এক রকমের (monocultural) গাছ সারিবদ্ধভাবে রোপণ করত। এভাবেই বৃক্ষ-ভূমিখণ্ডগুলিকে (treeplots) পরিচ্ছন্ন ও আগাছামুক্ত করে রাখার এক বিদেশি ধারণার উদ্ভূত হল। ভুলবশত মনে করা হল যে আগাছাগুলি তাদের অর্থনৈতিক ফসলগুলির (economic crops) প্রতিযোগী।

আগাছাদের বেশিরভাগ ‘পুষ্টি’, বস্তুত সমস্ত উদ্ভিদেরই বেশিরভাগ পুষ্টি আসে বাতাস ও জলীয় বাষ্প থেকে। মাটি থেকে পাওয়া খনিজগুলি হল গাছের সমস্ত ওজনের মাত্র ৫%। এগুলির জন্য কোনো প্রতিযোগিতার সমস্যা হয় না। কারণ প্রকৃতি এমন নির্বোধ নয় যে সে এমন আগাছার প্রজাতি নির্বাচন করবে যাতে সেই আগাছার জন্য যে মাটি বাছা হয়েছে, তাতে সেই মাটি তার খনিজের চাহিদা মেটাতে পারে না, আর যেহেতু আগাছারা (গাছের) তুলনায় খর্বাকৃতি, তাদের মূলগুলিও তুলনামূলকভাবে অগভীর এবং তারা স্বল্পজীবী। তারা দীর্ঘকায় গভীরতর মূলের দীর্ঘজীবী গাছদের বৃদ্ধিতে কোনো বাধার সৃষ্টি করতে পারে না। (দেখুন : আগাছা : মাটির আদি সন্তানসন্ততিরা, পৃষ্ঠা ৪৪)

কল্লুবৃক্ষে পাওয়া যায় এমন কিছু তথাকথিত আগাছা, যেমন কৌচা, ধোঁধা, ইক্কড়ু ইত্যাদিরা শুঁটি (leguminous) জাতীয় উদ্ভিদ। (শেষের দুটি সেসবানিয়া পরিবারের উদ্ভিদ প্রজাতির।) অন্যান্য শুঁটি জাতীয় গুল্ম ও গাছদের সাথে এগুলি নাইট্রোজেন জোগানের এজেন্ট। এদের মূলের

গোটে (nodule) কোটি-কোটি বিশেষ ধরনের রাইজোবিয়া (এক ধরনের ব্যাক্টেরিয়া) থাকে, যারা বাতাসের নাইট্রোজেন ‘ফিক্স’ করে মাটিতে চালান দেয়। একারণেই ঐতিহ্যগত জমি-ফসল আবর্তন ব্যবস্থায় (field-crop rotation system) প্রায় সব সময় দুটি ‘নাইট্রোজেন ভোগী’ (nitrogen consuming) দানা ফসলের মধ্যবর্তী ফসল হিসাবে ‘নাইট্রোজেন সরবরাহকারী’ কোনো শুঁটি (leguminous) ডালকে অন্তর্ভুক্ত করা হত।

ভান্ডার সাভে বললেন, “এমনকী যদি কিছু আগাছা বিপজ্জনকভাবে বৃদ্ধি পেয়ে ফসলকে ঢেকে ফেলার উপক্রম হয়, আগাছা নিয়ন্ত্রণের আধুনিক পদ্ধতিগুলি নিছক পাগলামি।” যতই হোক আমাদের মাথার চুল যদি খুব বাড়ে, আমরা মোটেই চুল উপড়ে ফেলি না, আবার তার ওপর বিষও ছেটাই না। আগাছার ক্ষেত্রেও তাই। এক্ষেত্রে সুস্থতর উপায় হল যেখানে প্রয়োজন সেখানে তাদের ছেঁটে ফেলে নিয়ন্ত্রণ করা।”

বহুতল, বহুকাজ (Multistorey, Multifunction)

বাগিচা অঞ্চলে (orchard area) মাটিকে ঢেকে রাখা আগাছারা গাছপালার নিম্নতম তল (lowest storey) সৃষ্টি করে। এর ওপরে আছে কারিপাতা ও ফ্রেটনের মতো অসংখ্য গুল্ম। বাগিচার রাস্তার ধার জুড়ে সর্বত্র ছড়িয়ে আছে ফ্রেটন। নানাবিধ গোল ও ডোরা দাগে ভরা ফ্রেটন প্রজাতির মূলগুলি তুলনামূলকভাবে অগভীর। এই গুল্ম জল মাপার যন্ত্রের (water meter) মতো কাজ করে। মাটিতে আর্দ্রতা (বা জলকণা) কমে এলে এই গুল্মের পাতারা বিমিয়ে পড়ে।

কারিপাতা গুল্মগুলি বিভিন্ন প্রজাতির ফসলভুক পতঙ্গদের সংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করে। পাশাপাশি এই পাতা সারা ভারত জুড়ে রান্নায় ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। শুধুমাত্র এই অপ্রধান ফসল থেকে ভান্ডার সাভে প্রতি মাসে ন্যূনতম ২৫০০ টাকা রোজগার করেন, যাতে খরচ হল শূন্য (এমনকী পাতা তোলা ও আঁটিতে বাঁধবার কাজটি ফ্রেতারাই করে)।



একটি বহুতল ব্যবস্থায় বৃক্ষ, লতা, ছোট গাছ
ও গুল্মরাজি সুসংহতভাবে সহাবস্থান করে।

বাগিচার এখানে সেখানে যে কেউ দেখতে পাবে লতানো গাছ কোনো কিছু
অবলম্বন করে ওপরে উঠেছে। যেমন গোলমরিচ বা পামপাতার লতা সর্পিল

মালার মতো সুপুরি গাছ জড়িয়ে আছে অথবা আবেগ ফল (passion fruit) –এর লতা গোলাকার বাঁক খেয়ে ফাঁকা মাটিতে এগিয়ে চলেছে, এগুলি থেকে অতিরিক্ত কিছু বোনাস পাওয়া যায়।

মধু হল আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ অপ্রধান উৎপাদন, যার রয়েছে উচ্চমূল্যের
ঔষধি গুণ। এই বাগিচায় মৌমাছি প্রতি বছরে অনেক কিলো মধু দিত। তা
পাওয়া যেত বিনা খরচে ও মনুষ্যশ্রম ছাড়াই। এই ছোট কর্মচঞ্চল প্রাণীরা
বাগিচায় পরাগ মিলনের দেখভাল করে যা ফল ফলানোর জন্য প্রয়োজন।
দূর্ভাগ্যজনকভাবে এদের সংখ্যা সারা পৃথিবী জুড়ে ভীষণভাবে কমে গেছে।

নারকেল নার্সারির জন্য ও ধানের খেতের জন্য ২ একর বাদ দিলে
অবশিষ্ট ১২ একর জমিতে ফলের বাগিচা ধারাবাহিকভাবে বছরের ১৫০০০
কেজি ফল দিয়ে এসেছে। (গত ১৫–২০ বছর ধরে এই অঞ্চলে ধারাবাহিকভাবে
শিল্পায়নের অগ্রগতির ফলে এই উৎপাদন কমেছে), পুষ্টিগত মূল্যে এই ফল
পাঞ্জাব, হরিয়ানা ও ভারতের অন্য অনেক অংশে বিযাক্ত রাসায়নিকের
নিবিড় ব্যবহারে উৎপাদিত সম ওজনের খাদ্যের চেয়ে অনেক উৎকৃষ্ট।

ভাস্কর সাভে স্মরণ করালেন, মায়ের বুক থেকে স্বাস্থ্যকর (whole-
some) দুধ পান করার জন্মগত অধিকার রয়েছে সমস্ত শিশুর। কিন্তু
দুঃখজনকভাবে আমাদের লালসা ভরা আধুনিক চাষ, লাগামহীন শিল্পায়ন
ও ভোগবাদী সংস্কৃতি মা বসুন্ধরার জীবন-রক্ত (life-blood) ও মাংস
ভক্ষণ করছে। তাহলে আমরা তার কাছ থেকে ক্রমাগত পুষ্টি পাওয়ার
আশা করি কীভাবে?



সাভের খামারে মৌমাছির বাস



কেঁচো ও সজীব মাটি

ছোট কেঁচো হল প্রকৃতির লাঙল আর তার মল হল একাধারে উর্বরতার ভাণ্ডার, অনু-বাঁধ (micro-dam) এবং বায়ু-ঘর (aeration chamber)। শিল্প স্থাপনের মাধ্যমে এগুলি সৃষ্টি করতে গেলে অবশ্যম্ভাবীভাবে যে ক্ষতিকারক প্রভাব পড়ে প্রাকৃতিক এইসব কর্মকাণ্ডে তাদের ছিটেফোঁটাও থাকে না।

সাভে বলেন, “যদি রাসায়নিকের ব্যবহার, কর্ষণ (tillage) ও আগাছা নাশ করা — ইত্যাদি সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করে দেওয়া হয় এবং মাটিকে দীর্ঘস্থায়ীভাবে গাছ-পাতা দিয়ে ঢেকে রাখা যায় তাহলে দু-বছরের মধ্যেই প্রতি একরে ৩০০,০০০ থেকে ৪০০,০০০ কেঁচোর আবির্ভাব হবে। ভূমিক্ষয়, কৃষি-রাসায়নিক, ভারী কর্ষণ ও অতিরিক্ত সেচের দ্বারা মাটির ভীষণ ক্ষতি না হয়ে থাকলে, কথাটি সমস্তরকম মাটির ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

রান্নাঘরের আবর্জনা, পাতা ও খড়ের আচ্ছাদন ইত্যাদির মতো জৈবসার ব্যবহারে কেঁচোর বৃদ্ধি ঘটে আরও তাড়াতাড়ি। মাঝে মধ্যে জল দিলে তা মাটির আর্দ্রতা বজায় রাখতে সাহায্য করে। কিন্তু অতিরিক্ত সেচ দেওয়া হলে এবং জল নির্গমনের বা বেরিয়ে যাওয়ার প্রক্রিয়া (drainage) যদি দুর্বল হয়, তাহলে মাটিতে জল জমে থাকে যা মাটি থেকে বাতাস বের করে দিয়ে মাটির পোকামাকড়দের শ্বাসের ব্যাঘাত ঘটায় ও তাদের বৃদ্ধিতে বাধা সৃষ্টি করে ফলে মাটির স্বাস্থ্যের ক্ষতি হয়।

স্থানিক, দেশজ কেঁচোই কোনো খামারে সবচেয়ে ভালো খাপ খাওয়াতে পারে। কারণ তারা সেখানকার আবহাওয়া ও মাটির অবস্থার সঙ্গে সহাবস্থান করে, খাপ খাওয়াতে অভ্যস্ত। বিদেশি প্রজাতি দ্বারা

প্রস্তুত কেঁচোসার অত্যন্ত ব্যয়বহুল এবং যেহেতু তাদের দূরবর্তী কোনো জায়গায় নির্বাচন করে (selectively breed) সৃষ্টি করা হয়, সেহেতু অন্য কোনো জায়গায় তাদের গুটি থেকে কতগুলি কেঁচো বেরিয়ে আসবে তার কোনো নিশ্চয়তা নেই এবং তাদের সংখ্যা কতটা বৃদ্ধি পাবে অথবা অচেনা মাটিতে সেই অঞ্চলের পোকামাকড়দের মধ্যে স্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পেতে ও কাজ করতে তারা কতটা সক্ষম হবে তারও কোনো স্থিরতা নেই।”

যদি কেউ উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে যে তার খামারে ইতিমধ্যেই কীটনাশকের ব্যবহারে বেশিরভাগ কেঁচো মারা গেছে, সেক্ষেত্রে ভাস্কর সাভের পরামর্শ হল স্থানীয় কোনো বটগাছ বা তেঁতুল গাছের গোড়া থেকে কিছুটা মাটি এনে তা আপনার খামারে ফেলুন আর সেখানে কেঁচো চাষ করুন। বৃষ্টির শুরুতে সেই মাটিতে তাদের গুটি থেকে প্রচুর সংখ্যক কেঁচো বের হবে।

খনিজ পুষ্টি সরবরাহের থেকেও আরও গুরুত্বপূর্ণ কাজ যা কেঁচো করে তা হল তার খনন কাজ। এই কাজ সবচেয়ে বেশি হয় বর্ষার মাসগুলোতে যখন মাটি জলে সম্পৃক্ত থাকে। বিশেষ করে এই ঋতুতে কেঁচো বাতাস থেকে অক্সিজেন পাওয়ার জন্য প্রতিদিন বহুবার মাটির ওপরে উঠে আসে। (তারা শরীর দিয়ে অক্সিজেন শোষণ করে) এবং তারা ভূতলে তাদের বর্জ্য (castings) ছেড়ে যায়। যখন কেঁচো মাটির ওপরে ওঠে, প্রতিবারই এটি মাটিতে সুরঙ্গের মতো এক গর্ত তৈরি করে। কেঁচো গোলাকারে ঘুরে ‘ড্রিল’ করে না, বরং লম্বালম্বিভাবে গুঁতিয়ে বা ‘পাঞ্চ’ করে ওপরে ওঠে। এর ফলে মাটিতে থাকা অসংখ্য জীবন্ত মূলতন্ত্রগুলির কোনো ক্ষতি হয় না।

ভাস্কর সাভে আরও বললেন, “কেঁচো তার বর্জ্য নিষ্কাশন করে তার লেজের শেষাংশ দিয়ে, তাই মাটির ওপরে বর্জ্য নিষ্কাশন করতে হলে তাকে তার শরীরটাকে সম্পূর্ণভাবে মাটির ওপরে তুলতে হয়। শিকারী পাখিদের হাত থেকে বাঁচার জন্য সে সতর্কতার সাথে শরীরটাকে নিয়ে আধ ইঞ্চি মাটির ওপরে ওঠে, তারপর শরীরটাকে গোল করে বাঁকিয়ে সংলগ্ন মাটিতে আবার গুঁতিয়ে ‘পাঞ্চ’ করে আর একটি গর্ত করে পিছনে ফেয়ার রাস্তা তৈরি করে। বাতাসের স্পর্শে আসার সময় কেঁচো সারা শরীর দিয়ে অক্সিজেন গ্রহণ করে; লেজের দিক দিয়ে সে আবার মাটিতে প্রবেশ করার আগে ভূতলে বর্জ্য ছেড়ে যায়।

যদি ধরা যায় একটি কেঁচো প্রতি ২৪ ঘন্টায় ১০ বার ওঠা এবং ১০ বার নামায় ২০টি সুড়ঙ্গ তৈরি করে, তাহলে ৯ একরে ৪০,০০০০ কেঁচো এবং ৩ মাসের বর্ষায় ৭২ কোটি ক্ষুদ্র সুড়ঙ্গ সৃষ্টি করে। তাহলে এইরকমভাবে লালিত খামারে মাটির খনন (tillage) নিয়ে চাষির ভাবনার কি কোনো কারণ আছে?

কেঁচোরা যখন মাটি খোঁড়ে, তারা সারাক্ষণ স্লেম্মা (mucus) ধুয়ে যায়। এই স্লেম্মা তাদের কঠোরতম মাটিতে প্রবেশ করতে বা চলাচল করতে সাহায্য করে। ত্রুমাগত ঘর্ষণে এই স্লেম্মা সুড়ঙ্গের দেওয়ালে সিমেন্টের মতো মাটিকে শক্ত করে ধরে রাখে এবং ভূমিক্ষয় রোধ করে। গ্রীসের প্রুপদি যুগে অ্যারিস্টটল কেঁচোকে মাটির অন্ত্র (guts) বলে অভিহিত করেছিলেন। কারণ চলার পথে এটি মাটির কণাগুলি ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর কণাতে পরিণত করে। এই ক্ষুদ্র কণাগুলি কেঁচোর অন্ত্রের রসে জারিত হয়ে ঘন, সংবদ্ধ, স্থায়ী কণা-সমষ্টিতে পরিণত হয়।

কেঁচোর বর্জ্য (castings) কেকের টুকরোর মতো (crumbs) গঠনের ফলে বেশি জলকণা ধারণ করতে পারে এবং কেঁচো দ্বারা খননের ফলে গর্ত দিয়ে অতিরিক্ত জল নিষ্কাশিত হতে পারে এবং চুইয়ে চুইয়ে ভূগর্ভের জলধারাগুলিকে (aquifers) ভরিয়ে তোলে। বিভিন্ন পরীক্ষায় একথা প্রমাণিত হয়েছে যে কেঁচোযুক্ত ভারী কাদামাটি কেঁচোহীন মাটির থেকে প্রায় ৬ গুণ দ্রুত জল নিষ্কাশন করতে পারে। বিপরীতে, হালকা বেলে মাটিতে যেখানে জল সরাসরি মাটির নিম্নতর স্তরে (subsoil) পৌঁছাতে পারে সেখানে কেঁচোর বর্জ্য জলধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে।

সেচ সেবিত গাছের জমিতে, কেঁচোরা সারা বছর সক্রিয় থাকে। খুব সকালে যখন বড়ো বড়ো ফোঁটায় শিশির পড়ে এবং আলোও ভালো ভাবে ফোটে না (মাটির পোকারা উজ্জ্বল আলো পছন্দ করে না), তখন কখনও সখনও তাদের দেখা যায়। শুধুমাত্র বৃষ্টিসেবিত খামারগুলিতে কেঁচোরা বর্ষার শেষে ধীরে ধীরে মাটির গভীরে প্রবেশ করে, যে স্তরে জলকণা থাকে বেশি। এখানে তারা মাসের পর মাস ঘুমিয়ে (dormant) থাকে। কঙ্কন উপকূলে তারা উঠে আসতে শুরু করে মার্চ নাগাদ, যখন বাতাসের আর্দ্রতা বাড়তে থাকে এবং ঠান্ডার পর্যায় অতিক্রান্ত হয়েছে।

ভারতে প্রায় ৩৫০ প্রজাতির কেঁচো পাওয়া যায়। বিভিন্ন ধরনের কেঁচো বিভিন্ন ধরনের আবহাওয়া ও মাটির সাথে খাপ খাওয়ানোয় অভ্যস্ত। একই জমিতে এমন সব কেঁচো থাকে যারা ভূপৃষ্ঠের উপরিতলের মাটিতে (top soil) থাকতে পছন্দ করে। আবার এমন খননকারী প্রজাতি আছে যারা মাটির ৩ মিটার বা তার বেশি নিচে প্রবেশ করে।

এছাড়া কেঁচো হল মাটির বহুরকম সাহায্যকারী জীবগুলির মাত্র একটি। শুখা অঞ্চলে পিপড়ে, উই (সাদা পিপড়ে) বেশি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, যেখানে কেঁচোরা আর্দ্র পরিবেশ পছন্দ করে। পোকারা অন্যান্য পোকা ও জীবাণুর প্রভাব নিরপেক্ষ হয়ে কাজ করতে বা বেঁচে থাকতে পারে না। বাণিজ্যিক জৈব-প্রযুক্তি তার ক্ষুদ্র দৃষ্টিকোণের জন্য অন্য প্রজাতিগুলি থেকে কোনো একটা বিশেষ প্রজাতিকে বিশেষ গুরুত্ব দিতে পারে। কিন্তু প্রকৃতিতে সমস্ত জীব ও ভূত (elements) মিলে সৃষ্টি করে এক আন্ত-সম্পর্কিত সমগ্র (inter-related whole)।

আগাছারা মাটির আদি সন্তান-সন্ততি

আগাছারা হল অসংখ্য দেশি উদ্ভিদ যারা মানুষের দ্বারা রোপিত না হয়ে, আপনিই উদ্ভূত হয় ও বেড়ে ওঠে। ভাস্কর সাভে তাদের বলেন মাটির আদি সন্তান-সন্ততি। অভিযোজিত (adopted) ‘পালিত সন্তানরা’ হল সেই শস্যগুলি যেগুলি চাষি বপন করে।

সাভে বলেন, “স্বাস্থ্যবান মাটির গর্ভ এত বড়ো হয়, যা সূচনা করা (introduced) শস্য প্রজাতিকে তার লালন ক্ষেত্রে ভালবাসার সাথে গ্রহণ করতে পারে। সেটা সম্ভব হয় যদি মানুষের দ্বারা নির্বাচিত উদ্ভিদগুলি এই মাটি ও আবহাওয়ার পক্ষে বিশেষভাবে অনুপযোগী না হয়। কিন্তু যেহেতু আগাছাগুলি প্রকৃতির পছন্দসই প্রজাতি এবং তারা আরও প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত ও (বীজ) উদ্ভূত, তারাই সেইসব উদ্ভিদ যারা বিদ্যমান (existing) পরিস্থিতির সাথে খাপ খাওয়াতে সবচেয়ে বেশি অভ্যস্ত। একজন চাষি তাকে অব্যাহিত মনে করতে পারে, কিন্তু তারা বহু প্রাণবন্ত উপায়ে মাটির উপকার করে এবং গাছ-ফসলের বৃদ্ধিতে উপকারী ভূমিকা পালন করে — যতক্ষণ না তারা তাদের ছায়ায় ঢেকে ফেলে মাটিকে সূর্যরশ্মি থেকে বঞ্চিত করে।

প্রাকৃতিক ক্রান্তীয় অরণ্যের ঘন সবুজের মাঝে পাওয়া যায় এমন সব বিস্ময়কর বৈচিত্র্যপূর্ণ সকল উদ্ভিদ এক অর্থে ‘আগাছা’, কারণ তাদের কোনো মানুষ পোঁতে না, তারা আপনিই (বীজ) উদ্ভূত হয়ে বেড়ে ওঠে। তবুও এটি একটি উচ্চ-উৎপাদনশীল স্বাস্থ্যকর বাস্তুতন্ত্র যেখানে সমস্ত রকমের গাছপালা একে অপরের উপস্থিতিতে উপকৃত হয়ে নিজ নিজ স্বকীয় অবস্থান বজায় রেখে একক গোষ্ঠী হিসেবে সহাবস্থান করে।

ভারতের মতো একটি দেশে বৈচিত্র্যপূর্ণ আগাছাগুলি বর্ষার প্রথম আগমনে দ্রুত বৃদ্ধি পেয়ে ফাঁকা মাটিকে ঢেকে ফেলে। বর্ষা যতই এগোয় অবিশ্রান্ত বর্ষণে আগাছাগুলি হাতুড়ির মতো আঘাত করা বৃষ্টির ফোঁটাগুলিকে গ্রহণ করে মাটিকে রক্ষা করে; আবার তাদের মূলগুলিও মাটিকে আঁকড়ে থেকে ক্ষয়ের হাত থেকে রক্ষা করে। এই আগাছাগুলি না থাকলে আমাদের ক্রান্তীয় পরিবেশ পরিস্থিতিতে, বিশেষত ঢালু জমিতে ভূমিক্ষয় ভয়ংকর হয়ে উঠত। তাই ভাস্করভাই বলেন, “এ আমাদের এক নির্বোধের মতো অজ্ঞতা যে আমরা বুঝতে পারি না আগাছাগুলি আমাদের কত বড়ো আশীর্বাদ।”

আগাছাগুলির মূল যতই মাটির গভীরে প্রবেশ করে ততই মাটির ভিতরে বাতাস চলাচলের পথ প্রশস্ত করে। এর ফলে মাটির জলকণা শোষণ ও ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। আগাছাগুলি মাটিকে ছায়ায় ঢেকে রেখে বাষ্পীভবন হ্রাস করে, মাটির জীবগুলির (বেঁচে থাকা ও বৃদ্ধির) উপযোগী পরিবেশ বজায় রেখে মাটির তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখে। আর যখন আগাছাগুলি মারা যায়, কেঁচো, পিপড়ে ও পচনক্রিয়া ঘটানো (decomposer) ব্যাক্টেরিয়া তাদের শুকনো পাতা ও মূলগুলি খায় এবং তাদের ভিতরের খনিজ পুষ্টিগুলিকে মাটিতে ফিরিয়ে দিয়ে পরবর্তী প্রজন্মের উদ্ভিদের ও দীর্ঘায়ু গাছদের সেবা করে।

এছাড়া আগাছারা আরও হরেকরকম বিশেষ ধরনের কাজকর্ম করে। মাটির অবস্থা বদলের সাথে সাথে প্রাকৃতিক ভাবেই বিভিন্ন ধরনের আগাছার পরিবর্তন ঘটে। যেখানে অন্য কোনো উদ্ভিদ জন্মায় না, সেখানে কিছু আগাছা দারুণ পথিকৃতির মতো ক্রমাগত মাটির উন্নতি সাধন করে। কিছু আগাছা গুটিজাতীয় (leguminous), তারা নাইট্রোজেন সরবরাহ করে। আবার কিছু আগাছা আছে এমন, যাদের ওপর কীটপতঙ্গ বসলে, তাদের (কীটপতঙ্গগুলির) বংশবৃদ্ধি বাধাপ্রাপ্ত হয়। ফলে এই পতঙ্গগুলি গাছপালার যে ক্ষতি করতে পারত তার থেকে গাছপালার রক্ষা পায়।

“প্রকৃতিতে উদ্ভিদের বৈচিত্র্য বিস্ময়কর এবং প্রাকৃতিক খামার বা জঙ্গলের বিশ্ববিদ্যালয়ে জানার কোনো শেষ নেই।” ভাস্কর সাভে বলে চলে। “আমি কল্পবৃক্ষে বিভিন্ন বছরে বিভিন্ন ঋতুতে শত শত প্রজাতির আবির্ভাব দেখেছি। এদের মধ্যে এমন উদ্ভিদ আছে, যারা ঔষধি গাছ বলে পরিচিত। যেমন ১৯৯২ সালে আমার বাগিচায় বিরাট সংখ্যক পুনর্নভা (satodi) গুল্ম দেখা গিয়েছিল। এই উদ্ভিদগুলি স্বাস্থ্যের পক্ষে অতি উপকারী। পুনর্নভা শব্দটির আক্ষরিক অর্থ হল ‘পুনরুজ্জীবন’।

যদিও আগাছারা সাধারণভাবে কৃষকের বন্ধু, কোনো কোনো অপ্রাকৃত পরিস্থিতিতে তাদের কিছু প্রজাতি ভয়ঙ্করভাবে বৃদ্ধি পেতে পারে। এই আগাছারা যদি শস্য-গাছের চেয়ে বেশি বেড়ে ওঠে, শস্য-গাছেরা রোদ পায় না, যা শস্যের ক্ষতি করে। অবশ্য এক্ষেত্রেও আগাছারা আরও একটি মৌলিক সমস্যা সমাধান করে যা হল ভূমিক্ষয় রোধ। তারা ক্রমাগত চাষিকে সংকেত দেয় যে সে উক্ত পরিস্থিতিতে এক ভুল শস্য নির্বাচন করেছে অথবা তার বৃদ্ধিতে ভুল প্রক্রিয়া অবলম্বন করেছে যাতে মাটি ও তার জীবেরা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। আগাছার সীমাহীন বৃদ্ধিকে রুখতে গেলে এবং এ সমস্যার মূল থেকে সমাধান করতে গেলে একমাত্র বিবেচনার কাজ হল মিশ্রচাষ (mixed farming) ও ফসল আবর্তনের (crop rotation) পথ গ্রহণ করা, সাথে সাথে রাসায়নিক ও গভীর খনন (deep tillage) পরিত্যাগ করা। মাটির স্বাস্থ্য ফিরে এলে সমস্যা সৃষ্টিকারী আগাছারা নিজেরাই বিলুপ্ত হয়ে যায়। কিন্তু এই স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারে অন্তর্বর্তীকালীন সময়ে তাদের দ্বারা শস্য ঢেকে দেওয়ার প্রবণতা থেকে যায়। সেক্ষেত্রে তাদের মোকাবিলার পথ হল সময়ে সময়ে তাদের ছেঁটে ফেলে (ফুল ফোটান আগে) তা দিয়ে শস্যের নিচে মাটির ওপরে ৩-৪ ইঞ্চি পুরু এক আচ্ছাদন দেওয়া। যেহেতু এই পুরু আস্তরণের নিচে সূর্যরশ্মি প্রবেশ করতে পারে না, আগাছাগুলির বীজের কোনো অংকুরোদগম হয় না, ফলে কার্যকর ভাবে আগাছা বৃদ্ধি রোধ সম্ভব হয়।

বিষয় : ফসলের মাসে আগাছা ও তাদের সীমাহীন বৃদ্ধির নিয়ন্ত্রণ

ভাস্কর সাভে ব্যাখ্যা করে বললেন — ফসল আগাছা উভয়েরই বীজে কিছুটা খাদ্য সঞ্চিত থাকে যা অংকুরোদগম এবং প্রাথমিক বৃদ্ধির জন্য ব্যবহৃত হয়। ধান, গম ইত্যাদি ফসলের বীজ সাধারণত আগাছাগুলির বীজের থেকে অনেক বড়ো এবং তাদের মধ্যে অনেকটা বেশি খাদ্য সঞ্চিত থাকে। বেশিরভাগ আগাছার বীজ বেশ ছোটো। তাদের বীজ থেকে সম্পর্কভাবে ফল বেবিয়ে আসতে লাগে সাধারণত ৮-১০ দিন

শুধুমাত্র গাছগুলির বীজের শরীরে সঞ্চিত খাদ্য ব্যবহৃত হয়ে যাওয়ার পরই গাছগুলি মাটি থেকে রস আহরণ করতে শুরু করে। যে মাটিতে আমরা গাছ বপন করি তা যদি স্বাস্থ্যবান ও উর্বর হয় এবং অল্প না হয়, তাহলে ফসলের বৃদ্ধি ঘটতে থাকে অপ্রতিহতভাবে এবং আশপাশের আগাছাগুলিকে বৃদ্ধিতে ছাড়িয়ে গিয়ে তাদের ছায়ায় ঢেকে রেখে সূর্যরশ্মি থেকে বঞ্চিত রেখে তাদের বৃদ্ধিকে রুদ্ধ করে।

ফলে শস্য ও আগাছাদের মধ্যে কিছু প্রতিযোগিতা থাকতে পারে, কিন্তু তা মাটি থেকে পুষ্টি সংগ্রহের ক্ষেত্রে নয়। ভাস্কর সাভে বলেন, “যদি ফসল আগাছাকে লম্বায় ছাড়িয়ে যায়, তাদের ছায়া আগাছাগুলিকে দমিয়ে দেয়, ফলে তারা পরে আর সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে না। স্বাস্থ্যবান, সজীব ও অল্পতাহীন মাটিতে স্বাভাবিকভাবেই এটা হয়। আমাদের পূর্বপুরুষেরা বহু প্রজন্ম ধরে চাষ করে আসছে। কিন্তু যেহেতু তাদের মাটি ছিল স্বাস্থ্যবান, তারা আগাছাদের থেকে কখনও কোনো গভীর সমস্যার সম্মুখীন হয়নি, এমনকী কয়েক দশক আগে পর্যন্ত। তাই বীজগুলি কতদূর অন্তর পুঁততে হবে তা নিয়ে একটা বুদ্ধি আঙুলের নিয়ম (thumb rule) আছে, সেটি হল, যদি আপনার মাটি গুণমানে কম বা দুর্বল হয়, তাহলে বীজের সংখ্যা বাড়ান। অন্যভাবে বললে, বীজ বুনুন একে অপরের কাছাকাছি। এই কৌশলের ফলে শস্যে (গাছের) ছায়া আগাছাগুলির ওপর পড়ে আগাছার বৃদ্ধি রুদ্ধ করে। অবশ্য যদি আপনার মাটি যথেষ্ট স্বাস্থ্যবান হয়, তাহলে কম সংখ্যক বীজ বুনুন, অর্থাৎ বীজের মধ্যে দূরত্ব বেশি রাখুন।

যখন চাষিরা জৈবচাষে ফিরে যায় তাদের মাটির স্বাস্থ্য ধারাবাহিকভাবে উন্নত হয়। অনুরূপভাবে ফসলের বৃদ্ধি হয় আরও ভালো। আবার সাথে সাথে আগাছার বৃদ্ধিও কমে যায়। ফলে ২-৩ বছরের মধ্যে আগাছার নিয়ন্ত্রণ হয় এবং তাদের কৃত্রিমভাবে নাশ করার কোনো প্রয়োজন পড়ে না।

আগাছা নিয়ন্ত্রণের জন্য আচ্ছাদনের সঠিক পদ্ধতি

কেটে ফেলা আগাছাগুলি যাতে পুনরায় জেগে উঠতে না পারে, তার জন্য আচ্ছাদন খুবই কার্যকর, অবশ্য যদি তা যথেষ্ট পুরু হয় যাতে করে আচ্ছাদনের ভিতরে রোদ প্রবেশ করতে না পারে। উদাহরণস্বরূপ যদি ১০০ বর্গফুট এক জমি থেকে আগাছা কাটা হয় তাহলে তা থেকে ১০০ বর্গ ফুট জুড়ে পুরু আস্তরণ দেওয়া সম্ভব নয়। আগাছার বৃদ্ধির ঘনত্বের ওপর তা নির্ভর করে। সেই পুরু আস্তরণ হয়তো দেওয়া সম্ভব হবে ৪০ বর্গফুট অথবা হয়তো ১০ বর্গফুট জমিতে। যদি সূর্যরশ্মি সরু আচ্ছাদনের ভিতর দিয়ে প্রবেশ করে (তিন ইঞ্চির কম পুরু), তাহলে আগাছাগুলি পুনরায় দ্রুত বৃদ্ধি পেতে পারে। আবার আচ্ছাদন হালকা হলে কাটা আগাছাগুলি মাটির প্রত্যক্ষ সংযোগে আসতে পারে না, মাটিকে সরাসরি ছুঁতে পারে না, যাতে করে মাটির জীবগুলি তাদের পচানোর কাজটা করতে পারে না। এরকম অবস্থায় আগাছাগুলি মাটির সাথে সংযুক্ত হয়ে হিউমাস বা উদ্ভিজ্জ সারে পরিণত হতে পারে না, বরং তারা বাতাসে শুকিয়ে গিয়ে আর কোনো কাজে লাগে না।

তাই যদি ১০০ বর্গফুটে বেড়ে ওঠা আগাছা কেটে তা দিয়ে ২৫ বর্গফুট অঞ্চলে ফসলে ৩-৪ ইঞ্চি পুরু আচ্ছাদন দেওয়া যায়, তাহলে কৃষকের এই মাপটাই ব্যবহার করা উচিত, যদি না বাইরে থেকে অতিরিক্ত জীবভর (bio-mass) সরবরাহ করা যায়। এর পর বাকি ৭৫ বর্গফুট অঞ্চলে বৃদ্ধি পাওয়া নতুন আগাছা সিকি ভাগ অঞ্চলে আচ্ছাদনের মতো ব্যবহার করে ধাপে ধাপে ৪-৫টি পর্যায়ে আচ্ছাদন পদ্ধতিতে ঢেকে রেখে সফলভাবে আগাছা নিয়ন্ত্রণ করা যেতে পারে। এই আচ্ছাদনগুলি সম্পূর্ণ পচতে বেশ কয়েকমাস লেগে যেতে পারে। কিন্তু তা থেকে যে কম্পোস্ট তৈরি হয় ফসলের পক্ষে তা খুবই উপযোগী। ফলে যাকে শত্রু বলে মনে হত, তা এখন বন্ধুরূপে সেবার কাজে লাগে।

অবশ্য আগাছা কেটে আচ্ছাদনের কাজে লাগানোর ব্যাপারটা অবশ্যই আগাছায় ফুল ধরা ও তাদের পরাগ মিলনের পূর্বই করতে হবে। এক্ষেত্রে যদি চাষি বেশি দেরি করে ফেলে তাহলে আচ্ছাদনে পরাগমিলন হয়ে যাওয়া বীজ থেকে যায় এবং আচ্ছাদিত অঞ্চলে সেই আগাছার জোরালো পুনরুত্থান ঘটে।

গাছের ছায়ায় ঢেকে রেখে আগাছার নিয়ন্ত্রণ

দাভরো বলে এক আগাছা আছে যাকে কৃষকরা বিপজ্জনক বলে মনে করে। ভাস্কর সাভে বলেন যে একে নিয়ন্ত্রণ করতে এমন ফসল বুনতে হবে যা মাটিকে ঘন ছায়ায় ঢেকে দেয়। দাভরো গাছটির শিকড় এমন গভীরে যায় যে তাকে ওপর থেকে কেটে সরিয়ে দিলেও তার থেকে সহজে পরিত্রাণ পাওয়া যায় না। সেক্ষেত্রে ৪ ফুট/৪ ফুট অথবা ৫ ফুট/৫ ফুট গভীরে যাওয়া মূলের গাছ যেমন কলা গাছ লাগাতে হবে —যে গাছ অনেক ওপরে উঠে আরও বড়ো অঞ্চল জুড়ে ছাওয়া দিতে পারে। এই গাছগুলি যখন কিছুটা বেড়ে উঠেছে তখন তাদের জন্য দিতে হবে অনেকটা গোবর সার। এরপর কলার যে পাতাগুলি বেরিয়ে আসে সেগুলির ছাতা এত বড়ো হয় যে আশেপাশের গাছগুলিকে ছুঁয়ে যায় ও অনেকটা অঞ্চল জুড়ে ছাওয়ায় ঢেকে রেখে দাভরো আগাছাগুলিকে দমিয়ে রেখে, শেষে একেবারে ধ্বংস করে ফেলে।

টীকা এবং উল্লেখিত গ্রন্থাদি

- ১। এগুলি পশ্চিম উপকূলের লম্বা' নারকেল গাছ যেগুলি ১০০ থেকে ১২৫ বছর বাঁচে।
- ২। এগুলি উমের গ্রামের দক্ষিণে সিলভাসা অঞ্চলের ৬০০ বছরের পুরোন সবোদা গাছ যেগুলি টিকে আছে পর্তুগীজদের আগমনের সময় থেকে! সবোদা গাছেরা তাদের জীবৎকালে ৬০ টন ফল দেয়। সবোদা গাছেরা ২০০ বছর ধরে বছরে গড়ে ৩০০ কেজি করে ফল দেয়। এই হিসাব অনুযায়ী সবোদা গাছের ফলন এই রকম ধরা হয়েছে। পরিমাণটি সম্ভবত আরো বেশি।
- ৩। এই জ্ঞানগর্ভ সূত্রগুলি প্রধানত লেখা হয় গুজরাতি, মারাঠি বা হিন্দী ভাষায় — যে তিনটি ভাষায় ভাস্কর সাভে বলতে পারেন — প্রথম দুটিতে তিনি আরো বেশি স্বচ্ছন্দে বলেন।
- ৪। ভ্রমনাথীদের শুধুমাত্র শনিবারের অপরাহ্নে (২ টো) আসতে অনুরোধ করা হয় যখন ভাস্করভাই (বা তার দুই ছেলে নরেশ বা সুরেশ) তাদের খামার ঘুরিয়ে দেখান এখানে কিভাবে কৃষিকাজ করা হয় তা ব্যাখ্যা করেন। নিকটবর্তী রেল স্টেশন হল উমের গ্রাম যা মুম্বাই গুজরাত রাস্তায় ঠিক মহারাষ্ট্র থেকে গুজরাতে প্রবেশ করার পরে-ই পাওয়া যায়। মুম্বাই থেকে এর দূরত্ব ট্রেনে তিন ঘণ্টা। ডাকযোগে চিঠি পাঠানোর ঠিকানা হল : ভাস্কর সাভে, কল্লবক্ষ, কোস্টাল হাইওয়ে, দেহরি গ্রামের নিকট, ভায়া উমের গ্রাম রেলওয়ে স্টেশন, জেলা — ভালসাদ, গুজরাত, ফোন : (০২৬০) ২৫৬২২১২৬
- ৫। ডঃ বিজয়া ভেক্ট, 'দ্য কারনেল অফ হেলথ' দ্য পাইয়োনায়ার, ১২-০২০৯৬
- ৬। খামারের নগদ রোজগারটা আসে প্রধানত সবোদা ফল ও নারকেল চারা বিক্রী থেকে, আর বুনো নারকেল, সুপারী, কলা, পেঁপে, কারিপাতা, এ্যালো এবং কিছু জ্বালানী কাঠ ইত্যাদি বিক্রী করে কিছুটা রোজগার হয়। কিছু বুনো নারকেলের শ্বাস খামারেই পেষণ করে খাঁটি, উচ্চমানের ভোজ্য নারকেল তেল তৈরি করা হয়, এখন যার বাজারে বিরাট চাহিদা। ব্যয় ন্যূনতম। খামারের বাৎসরিক নেট রোজগার হল ৭ লক্ষ টাকা। আর এটা অনেক পশ্চিমী (প্রধানত যুরোপীয়) জৈব খাবার ত্রেতাদের অনেক বেশি রপ্তানি দামের লোভনীয় প্রস্তাবকে উপেক্ষা করেই।
- ৭। 'The Formation of Vegetable Mould through the Action of Worms', by Charles Darwin, Faber and Faber, 1927.
- ৮। প্রফেসর সুলতান ইসমাইল লিখিত 'Compositing through Earthworms', 1993, (শ্রী এ.এম.এস মুরল্লাপ্পা চেট্টিয়ার রিসার্চ সেন্টার,

- মাদ্রাজ)। কেঁচো মলের উচ্চ-পুষ্টি মূল্যের কথা, স্যার অ্যালবার্ট হাওয়ার্ডকে উদ্ধৃত করে লিখেছেন, লিখেছেন শৈলেন ঘোষ-ও তার লেখা 'জৈব চাষ'-এ, পৃষ্ঠা — ৩১-৩২, সমবর্ধন, ১৯৮৪। তেমনি পিটার টমকিনস্ ও ক্রিস্টোফার বার্ড এর লেখা 'Secrets of the Soil', Perennial Library, 1990, pg.43, (মাটির গোপন কথা গ্রন্থে কেঁচো সারের মধ্যে সমপরিমান নাইট্রোজেন, ফসফরাস এবং পটাশ পাওয়ার বিশেষ উল্লেখ রয়েছে।
- ৯। প্রফেসর সুলতান ইসমাইল লিখিত 'Vermicology', (ওরিয়েন্ট লংম্যান, ১৯৯৭) এবং প্রফেসর সুলতান ইসমাইল এর সাম্প্রতিকালের বই 'The Earthworm Book', 'আদার ইন্ডিয়া প্রেস দ্বারা প্রকাশিত'।
- ১০। জে.ই.স্যাটচেলের হিসাব অনুযায়ী একর প্রতি বছরে কেঁচোসার এর শুষ্ক ওজনের পরিমাণ ৪ থেকে ৩৬ টন। ('Earthworm Ecology', চ্যাপম্যান এবং হল, ১৯৮৩)। ১১। পিটার টমকিনস্ ও ক্রিস্টোফার বার্ড এর লেখা 'Secrets of the Soil', Perennial Library, 1990, pp.42-43
- ১২। জে.এস.ডগলাস এবং রবার্ট এ.দে.জে. হার্ট জানিয়েছেন 'IT is commonly supposed that neighbouring plants rob each other of soil nutrients, and that economic crops must therefore be grown in sterilized isolation, with all potential competitors ruthlessly eliminated. But, as the exuberant productivity of the tropical forest clearly indicates, cooperation is a far more potent force in Nature than competition.' [Ref. 'Forest Farming', Natraj Publishers, 1982, pg.18]
- ১৩। জন এইচ স্টোরের লেখা 'The Web of Life', মেন্টর, ১৯৫৩, পৃষ্ঠা. ৩২; এছাড়াও দেখো রুদে বুর্গুইনন এর 'Regenerating the Soil', আদার ইন্ডিয়া প্রেস, ২০০৫, পৃষ্ঠা. ১২১।
- ১৪। মৌমাছিরা হাজার হাজার কিলোমিটার চলাচল করে অসংখ্য ফুলের থেকে সংগ্রহ করে প্রত্যেক কেজি মধু তৈরির জন্য! অতঃপর ভাস্কর সাভে মনে করেন যে মধু অবশ্যই প্রতিদিনের ব্যবহারের চেয়ে ঔষধি রূপে ব্যবহার অনেক বেশি ন্যায্যসঙ্গত এবং যথাযত। ডঃ শৈলেন ঘোষ লিখেছেন 'In tropical countries, the plants are pollinated more by insects (like the bees) than by the wind. These have become rare with the widespread use of pesticides. The (consequent) loss to the vegetable kingdom is so heavy that no amount of fertilizer can compensate.' (Ref. 'Organic farming', pg.10, Samvardhan, 1984)
- ১৫। প্রফেসর সুলতান ইসমাইল লিখিত 'Compositing through Earth-

worms`, pg.2; এছাড়াও `Vermicology` (op cit) একই লেখকের, পৃষ্ঠা.২৮। ১৬। প্রফেসর সুলতান ইসমাইল লিখিত `Cpmposing through Earthworms`, pg.2; এছাড়াও `Vermicology` (op cit) একই লেখকের, পৃষ্ঠা.২৮।

১৭। The vigorous emergence of wild grasses and weeds after the first rains is particularly pronounced in the high rainfall Konkon belt where Bhaskar Save's farm is located. ১৮। Weed rampancy in field-cropping situations is common where the soil has suffered under continuous monoculture, heavy tillage and toxic agro-chemicals. (Of course, in terminal conditions, almost nothing will grow.) In `The Role of Weeds in Maintaining the Plains Grasslands`, Anna Penderson Kummur writes : Weed growth is vital to the return of grass to land seriously affected by overgrazing, sheet erosion, or a long period of drought. When adverse factors kill the grass, it cannot come back to re-fiberize the soil with its own roots. It must wait for the weed roots to unlock the tight soil, and then fill it with the fibre of their bodies to reestablish porosity. The process may take one or several seasons. But thereafter, the weeds do not drive out the grass. They only get the soil ready for the grass to come back. Grass has the power to rout weeds when conditions are right for the return of grass. Only the soil is rich in fibre, grasses dominate the weeds.

মিতাহারী...
উদ্ভিদের প্রয়োজন অত্যন্ত অল্প



৩

ভাস্কর সাভে বলেন, “প্রাকৃতিক চাষের চারটি মৌলিক নীতি হল অত্যন্ত সরল। প্রথমটি হল, প্রতিটি জীবেরই রয়েছে বেঁচে থাকার সমান অধিকার”। এই অধিকারকে সম্মান করতে হলে কৃষিকাজকে আবশ্যিকভাবে হতে হবে অহিংস। দ্বিতীয় নীতিটি স্বীকার করে যে, ‘প্রকৃতিতে প্রতিটি জিনিসই প্রয়োজনীয় ও জীবনের বুনটে (web of life) তারা কোনো না কোনো প্রয়োজন মেটায়।’

“তৃতীয় নীতিটি হল : কৃষিকাজ হল এক ধর্ম, প্রকৃতি ও সহযোগী সকল জীবকে সেবা করার এক পবিত্র পথ, এটা ধান্দা বা শুধুমাত্র টাকা বাড়াবার ব্যবসা হতে পারে না। প্রকৃতির নিয়মকে অস্বীকার করে আরও বেশি অর্থ রোজগারের ক্ষীণদৃষ্টিজাত লোভই হল আমাদের সামনের ত্রমবর্ধমান সমস্যাবলীর কারণ।”

চতুর্থটি হল উর্বরতার স্থায়ী পুনর্জন্মের নীতি। এই নীতি অনুযায়ী, যে ফসল আমরা ফলাই, তাদের শুধুমাত্র ফল ও বীজের ওপরেই রয়েছে আমাদের (মানুষের) অধিকার। এগুলি হল উদ্ভিদের ৫% থেকে ১৫% জীবভর ফলন (bio-mass yield)। বাকি ৮৫% থেকে ৯৫% জীবভর — ফসলের অবশিষ্ট অংশ আবশ্যিকভাবে মাটিতে ফেরৎ দিতে হবে যাতে মাটি তার উর্বরতাকে নবীকরণ (renew) করতে পারে, হয় প্রত্যক্ষভাবে আচ্ছাদন রূপে নতুবা খামারের পশুদের বর্জ্য পদার্থ (সার) হিসাবে। এটি যদি আচারনিষ্ঠ রূপে মেনে চলা হয় তাহলে বাইরের থেকে কোনো কিছু করার প্রয়োজন পড়ে না, এতে মাটির উর্বরতা কমাতে কোনো কারণ থাকে না।”

“আজকের দিনে উদ্ভিদ চাষিরা দুঃখজনকভাবে ভুল ধারণার বশবর্তী হয়ে পরিশ্রম করে, ফলে গাছদের কী প্রয়োজন, কতটা প্রয়োজন এবং কোথায়, কখন, কীভাবে সেই প্রয়োজন সবচেয়ে ভালোভাবে মেটানো সম্ভব — এগুলি যদি ভালোভাবে বোঝা যায় তা সত্যিই কাজে লাগে।” এইরকম

সব মাটির কাছাকাছি (down to earth) বিষয়গুলি নিয়ে ভাস্কর সাভে উৎসাহের সাথে বুঝিয়ে চলেন (সে একজন বা অনেককে) প্রকৃতির সাথে সাম্যপূর্ণ কৃষিকাজের আরও ফলিত বুনয়াদী ধারণাগুলি।

কী এবং কতটা

একটি সাধারণ ভুল ধারণা ভেঙে ভাস্কর সাভে ব্যাখ্যা করলেন, যে জৈববস্তু আমরা মাটিতে প্রয়োগ করি সেটা/সেগুলি গাছের খাদ্য নয় — অন্তত, প্রত্যক্ষভাবে নয়। বরং সেটা/সেগুলি হল মাটিতে বাস করা অসংখ্য জীব ও জীবাণু যারা মাটির উর্বরতা বজায় রাখতে অবিরাম কাজ করে যায় তাদের বৃদ্ধির জন্যে। আধ কাপ মাটিতে যত জীবাণু থাকে তা হল সারা পৃথিবীতে যত মানুষ বাস করে তার থেকে বেশি।

কেঁচো সহ মাটিতে বসবাসকারী অন্যান্য জীবদের শরীরে পাচন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মাটিতে যোগ করা জৈব বস্তুরা ক্রমাগত আরও বেশি করে অজৈব ও খনিজ পদার্থে পরিণত হয়। এই জীবদের মল খনিজ সমৃদ্ধ। সেই মল জলকণায় দ্রবীভূত হয়ে গাছের মূলগুলি দ্বারা শোষিত হয়।

গাছের কতটা খনিজ বা জল প্রয়োজন এ নিয়ে ভুল ভাবনাটি আরও মারাত্মক। গাছেরা যে মিতাহারী বা মাটির পুষ্টির অতি ক্ষুদ্র ভোক্তা — একথা জোর দিয়ে বলতে ভাস্কর সাভে কখনও ক্লান্তি বোধ করেন না। তাদের যেগুলি প্রচুর পরিমাণে দরকার সেগুলি হল সূর্যালোক ও বাতাস। কিন্তু বেশিরভাগ গাছের জলকণার চাহিদা (জলজ ও আধা-জলজ প্রজাতিগুলি যেমন ম্যানগ্রোভ প্রজাতিরা ও ধান ইত্যাদি ছাড়া) সবচেয়ে ভালোভাবে পূরণ হতে পারে যখন মাটি সম্পূর্ণ ভিজ়ে থাকে না, বরং যখন মাটিতে শুধু একটা স্যাঁতসেঁতে (damp) ভাব থাকে।

যেহেতু ভারতে সূর্যালোকের কোনো অভাব নেই, হিউমাস বা উদ্ভিজ্জ সারে ঢাকা ছিদ্রযুক্ত (porous) মাটি বেশি বাতাস ও জলকণা ধরে রাখতে পারে এবং এগুলি স্থায়ীভাবে ও বেশি পরিমাণে জীবভর (bio-mass) তৈরি করতে সক্ষম। এটি আমাদের প্রাচীন জ্ঞান, যদিও আজকের দিনে এই বোধের বড়ো অভাব।

একথা বুঝিয়ে বলতে ভাস্কর সাভে বললেন, “আপনার নাসারন্ধ্রদুটি চেপে ধরুন, মুখ বন্ধ করুন এবং সময় গুনুন। এটা করলেই আমরা বুঝতে পারব, যে বাতাস আমরা আপনা থেকেই পাই, তা আমাদের শরীরের পক্ষে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। তেমনি বেশিরভাগ গাছের মূলগুলি ও বায়ুজীবী জীবগুলি

— যেগুলি এই মূলগুলির চারপাশে বাস করে তাদের জন্য মাটিতে দরকার বাতাসের নিরবচ্ছিন্ন প্রবাহ। প্রকৃতিতে কেঁচো, পিপড়ে ও জীবাণুদের খনন প্রক্রিয়ায় তা নিশ্চয়তা পায়, কারণ খনন কার্যাবলী (tillage) মাটিকে করে রাখে ভেদ্য, ঝুরঝুর ও বায়ু চলাচলের জন্য প্রশস্ত।



একটি গাছের ওজনের বেশিরভাগটাই যে মাটি থেকে নয়, বরং বাতাস ও জল থেকে পাওয়া তা পরখ করার এক প্রামাণিক উপায় আছে। জীবনের বুনট (web of life) গ্রন্থে জন স্টোরার লিখেছেন, “সপ্তদশ শতাব্দীতে বাস করা এক ফ্লেমিশ ডাক্তার মাটির টবে একটি উইলো চারাকে বড়ো করেছিলেন। বীজ বপনের আগে টবটির ওজন করে নেওয়া হয়েছিল। পাঁচ বছর ধরে বৃষ্টির জল ছাড়া এই টবের মাটিতে আর কিছুই দেওয়া হয়নি এবং উইলো চারাটি বেড়ে উঠে একটি ছোটো গাছের রূপ নিল। পাঁচ বছর পরে গাছটিকে টব ও মাটি থেকে বিচ্ছিন্ন করে ওজন করা হল। যখন গাছটি শ্রেফ অঙ্কুর অবস্থায় ছিল তার থেকে গাছটি ১৬৪ পাউন্ড বৃদ্ধি পেয়েছিল আর টবের মাটির ক্ষয় হয়েছিল মাত্র দুই আউন্স। আসলে মাটির ওজনে ইতিমধ্যে নিশ্চিতভাবে যুক্ত হয়েছিল গাছের মূলের লক্ষ লক্ষ সূক্ষ্ম রোম, কিন্তু পরীক্ষাটিতে পাওয়া তথ্য পরিষ্কারভাবে জানায় যে এই ১৬৪ পাউন্ড ওজন নিশ্চয়ই মাটির বাইরের কোনো উৎস থেকে এসেছিল।”

ভাস্কর সাভে ১৯৭২ সালে তারই করা এরকম এক পরীক্ষার কথা বললেন। তিনি ৯ কেজি মাটি শুকিয়ে ওজন করেছিলেন। সেই মাটি তিনি একটি পাত্রে ভরলেন এবং তাতে একটি তরমুজের বীজ বপন করলেন। তা থেকে যে ডালপালা বের হল তা থেকে ৯০ দিনের মধ্যে দুটি তরমুজ ধরল, পরে এই ফসল তোলা হল। একটির ওজন হল ৩ কেজি, অন্যটির ৫ কেজি। ফল ছাড়া মূল সহ গাছটির বাকি সমস্ত অংশ সতর্কতার সাথে পাত্র ও মাটি থেকে বিচ্ছিন্ন করা হল। মূলগুলির সাথে লেগে থাকা গুঁড়ো মাটির কণাগুলি ব্রাশ দিয়ে ঝেড়ে পুনরায় পাত্রে রাখা হল। গাছটির ওজন হয়েছিল ৬০০ গ্রাম। তাই সমগ্র জীবভর (bio-mass) উৎপাদন বৃদ্ধি হল ৮.৬ কেজি। তারপর পাত্র থেকে মাটি সরিয়ে রোদে শুকিয়ে আবার ওজন করা হল। ওজন হল সেই ৯ কেজি — কোনো ক্ষয় হয়নি! “ওম পূর্ণমদাহ ...।”

বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ নিশ্চিত করেছে যে গাছের ওজনের (অথবা কোনো জৈববস্তু) ৮৮শতাংশ হল শুধুমাত্র কার্বন ও অক্সিজেন (তাতে দুটি মৌলের প্রত্যেকের ভাগই প্রায় সমান সমান, ৪৪ শতাংশ। এই দুটি মৌলের বেশিরভাগটাই আসে বাতাসের কার্বন ডাইঅক্সাইড থেকে যা পাতার নিচের তলের অসংখ্য স্টোমাটা বা ছিদ্র দিয়ে ভিতরে শোষিত হয়।

বাতাসের জলকণা থেকে গ্রহণ করা হাইড্রোজেন হল এই তালিকায় তৃতীয় স্থানে। একটি গাছের ওজনে এর ভাগ হল ৬%। বাতাসে ভাসমান জলকণাও কিছুটা অক্সিজেন জোগায়, যেমন মাটির ছিদ্রগুলির মধ্যে থাকা

বাতাস থেকেও গাছ কিছুটা অক্সিজেন পেয়ে থাকে।

বাতাস ও জলকণা থেকে পাওয়া কার্বন, অক্সিজেন ও হাইড্রোজেন — এই তিন প্রধান মৌল মিলিয়েই হয় গাছের মোট ওজনের ৯৪%। সূর্যালোকের উপস্থিতিতে এই তিনটি মৌল মিলে গিয়ে সালোকসংশ্লেষ নামক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে জ্যাস্ত বস্তুতে পরিণত হয়।

এটি বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে যদিও গাছদের প্রধান চাহিদাগুলি বাতাস ও জলকণা থেকে পাওয়া যায়, এদের বেশ কিছুটা মাটি ও মূল-ব্যবস্থার (root system) মাধ্যমেও পাওয়া যায়। তাই মাটির ভৌত অবস্থা ও রস শোষণ করার ক্ষমতা বা গুণ তার রাসায়নিক ও খনিজ গঠনের (composition) থেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ — এর ওপর আধুনিক কৃষিতে (রাসায়নিক ও খনিজ গঠন) বিশেষভাবে বেশি গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

এটি প্রখ্যাত কৃষিবিজ্ঞানী স্যার অ্যালবার্ট হাওয়ার্ড দ্বারা স্বীকৃত হয়েছিল ৭০ বছরেরও আগে। হাওয়ার্ডের বই ‘অ্যান এগ্রিকালচারাল টেস্টামেন্ট’ (An Agricultural Testament, 1940) একটি ধ্রুপদি সৃষ্টি বলে বন্দিত হয়েছে। কিন্তু এই লেখায় প্রতিপাদ্য বিষয়গুলি তখন স্বীকৃতি পায়নি, কারণ সেগুলি ছিল কৃষি-ব্যবসায়িক স্বার্থের পরিপন্থী। কিন্তু আজ অনেক পাশ্চাত্য দেশ হাওয়ার্ডকে সুস্থায়ী, জৈবকৃষির ‘পথিকৃৎ’ বলে মনে করে। আর হাওয়ার্ড নিজেই স্বীকার করেছেন যে তিনি এসব কিছু শিখেছিলেন ভারতের সাধারণ চাষিদের কাছ থেকে।

গাছের প্রয়োজনীয় গঠনকারীদের (building-block) আলোচনার ধারাবাহিকতায় বলতে হয় যে নাইট্রোজেনের স্থান অনেক পরে — এটি গাছের চতুর্থ প্রয়োজনীয় মৌল যেটির পরিমাণ হল গাছের ওজনের ১% থেকে ২%। এই মৌলটি বাতাসে প্রচুর পরিমাণে বর্তমান। এটি মাটিতে পাওয়া যায় রাইজোবিয়া নামক কোটি কোটি জীবাণুর কাজের দ্বারা, যারা শুঁটি জাতীয় গাছের (leguminous plants) মূলের গোটে (root nodules) বাসা বাঁধে। এছাড়াও, আরও বেশি সংখ্যক পচনকারী (decomposer) ব্যাক্টেরিয়ার কার্যকলাপের ফলে মৃত জৈববস্তুরা তাদের উপাদানগুলিতে বিশ্লিষ্ট হওয়ার ফলেও মাটি নাইট্রোজেনের জোগান পায়।

গাছের ওজনের ৫% আসে খনিজ লবণ থেকে যা মাটি নিজেই জোগান দেয়। এই মৌলগুলি হল ফসফরাস, পটাসিয়াম, ক্যালসিয়াম, সিলিকন, ম্যাগনেসিয়াম ইত্যাদি মৌল এবং আরও বেশ কয়েকটি কণা-মৌল (trace elements) অথবা ক্ষুদ্র-পুষ্টি (micronutrients) যেগুলি খুব কম প্রয়োজন, যেমন — লোহা, তামা, দস্তা, বোরণ, কোবাল্ট ও ম্যাঙ্গানিজ ইত্যাদি।

সবুজ সৃষ্টি ক্লোরোফিল, সূর্যের শক্তি এবং কার্বন-অক্সিজেন চক্র

গাছের পাতার ক্লোরোফিল বা সবুজকণাই জীবনসৃষ্টিকারী সালোকসংশ্লেষের প্রাথমিক এজেন্ট। এই সামান্য কিন্তু রহস্যজনক জিনিসটি সূর্যের শক্তি ও বায়ু, জল ও মাটি থেকে আহরণ করা মৌলগুলির মধ্যে মিলন ঘটিয়ে জটিলতর (more complex) জীবন-রূপ (life forms) দেয়।

গাছের দুটি প্রধান খাদ্য হল কার্বন ডাইঅক্সাইড ও জল। এগুলি থেকে পাওয়া জৈব বস্তুর তিনটি প্রধান মৌল হল কার্বন, অক্সিজেন ও হাইড্রোজেন। সূর্যালোকের উপস্থিতিতে এগুলির মধ্যে বিক্রিয়ায় প্রথম অত্যাবশ্যকীয় ধাপে সৃষ্টি হয় চিনি বা শর্করা। সৌরশক্তিকে বন্ধনের এই প্রক্রিয়ায় কার্বন ডাইঅক্সাইড থেকে নেওয়া কিছুটা অক্সিজেন ও জল বাতাসে নির্গত হয় মুক্ত রূপে।

শীতল ও আর্দ্র গাছেরা তাদের কাঠামোয় যে সৌরশক্তি জমা হয়ে আছে তা জানান দেয় না। কিন্তু যদি আপনি কিছু শুকনো ঘাস জড়ো করে আগুন লাগান, দেখবেন তা উজ্জ্বল শিখায় জ্বলে উঠছে। এই তীব্র তাপ সৃষ্টি হয় ঘাসে জমে থাকা সৌরশক্তি নির্গমনের ফলে। অবশ্য যদি একটি গাছকে না পুড়িয়ে খাওয়া হয়, তাহলে সেই শক্তি শরীরে স্থানান্তরিত হয়ে আগুন ধরে রাখে। তাকে আমরা বলি প্রাণ।

গাছ-পাতারা মানুষ, জীব-জন্তু অথবা ব্যাক্টেরিয়াদের দ্বারা ভুক্ত হবার পর, এইসব জীবদের পাচন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে ধারাবাহিকভাবে পচতে থাকে এবং শেষে তারা যে সব উপাদানগুলি দ্বারা সৃষ্ট সেগুলিতে বিক্লিষ্ট হয়ে মাটি ও হাওয়ায় মিশে যায়। এই চক্রাকার প্রক্রিয়ায়, বাতাস থেকে আহরিত কার্বন ডাইঅক্সাইড বাতাসেই ফিরে যায়, যাতে করে পরবর্তী প্রজন্মের গাছপালারা তা গ্রহণ করে আবার বেড়ে উঠতে পারে। আর মাটিতে মেশা জীবভরের (bio-mass) অভুক্ত ও অ-পচিত (undecomposed) উপাদানগুলি মাটিতে মিশে গিয়ে অপসৃত (sequestered) কার্বনের মাত্রাকে বৃদ্ধি করতে পারে, যা এই ভয়ংকর বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী আবহাওয়ার বদলকে প্রশমিত করতে পারে।

একটি মিশ্র প্রাকৃতিক খামারে কেঁচোর মল সার যথেষ্ট পরিমাণে এই খনিজ ও কণা-মৌলগুলিকে জোগান দেয়। এছাড়া আরও অসংখ্য পশু-পাখি, পতঙ্গ ও জীবাণুরা (ব্যাক্টেরিয়া, ফানগি, মোল্ড) মাটির পুষ্টিচক্রকে (nutrients cycle) অব্যাহত রাখতে সাহায্য করে। বস্তুত, প্রতিটি জীবই — তাদের রেচনে ও মরণে — প্রকৃতির চলমান পুষ্টিচক্রের অবিচ্ছেদ্য অংশ।

এছাড়া, মাটির অনেকটা গভীরে প্রোথিত গাছেরা ভূগর্ভের পাথুরে উৎস বা মাটি থেকে দ্রবীভূত খনিজগুলি শোষণ করতে পারে। তাই যে চাষি উর্বরতার পুনরুজ্জীবনের প্রাকৃতিক ও জৈবিক প্রক্রিয়াগুলিকে নজরে রাখে, মাটির রাসায়নিক বিশ্লেষণের ব্যাপারে তার ভাবিত হওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারটা হল ফসলের বর্জ্য ও অন্যান্য জৈব বর্জ্য একনিষ্ঠভাবে মাটিতে ফেরত দেওয়া। বাণিজ্যিক ফসলের (দু)এক ধরনের (monoculture) চাষে যখন সুস্পষ্টভাবে বোঝা যায় যে ভূমির (land) উপরিভাগের মাটিতে (top-soil) পুষ্টির অভাব ঘটছে, তখন মিশ্র চাষে ফিরে গিয়ে কয়েক বছরের মধ্যেই সেই অভাব বহুলাংশেই মিটিয়ে ফেলা যায়। অবশ্য ভূমিক্ষয় রোধ ও কৃষি রাসায়নিকের ব্যবহার থেকে বিরত থাকা অত্যাবশ্যক।

দুর্ভাগ্যবশত, বর্তমানে জৈব বর্জ্যের বিরাট অংশটাই মাটিতে ফিরিয়ে দেওয়ার বদলে আশ্চর্যকভাবেই নষ্ট হয়। আর একই জমিতে বছরের পর বছর একই রকমের ফসল বোনা — মাটির একই তল (Same level) থেকে একই রকমের খনিজ গ্রহণ করায়, মাটিতে সেইসব খনিজের অভাব দেখা যায়। আজকে মাটিতে পুষ্টি ও ক্ষুদ্র-পুষ্টির অভাব (nutrient and micro-nutrient deficiency) জনিত সমস্যাগুলির বেশিরভাগই মাত্র ১০০ বছর আগে প্রায় সারা পৃথিবীতেই অভাবনীয় ছিল। এগুলি হল জৈব বর্জ্য মাটিতে ফিরিয়ে না দেওয়া এবং (দু)এক ধরনের চাষ (monoculture) — এই দুটি কারণের প্রত্যক্ষ ফল। আর আমাদের একথা মনে রাখতে হবে যে ভারত, চীন, জাপান, কোরিয়া ইত্যাদি দেশের চাষিরা ফসল ফলিয়ে আসছে ৪০০০ বছরের বেশি সময় জুড়ে। আবার কারো কারো মত হল, ভারতে সুস্থায়ী কৃষির ইতিহাস ১০০০০ বছরের পুরোনো।

অতিরিক্ত জলের সমস্যা

জমির ওপরে এর মারাত্মক প্রভাব পড়েছে। ভাস্কর সাভে জোরের সঙ্গে বলেন, ‘বস্তুত বাদাবনের মতো জলাভূমির প্রজাতিগুলি এবং ধানকে বাদ

আবহাওয়া বদল ও শক্তি সংকটের মোকাবিলায় গাছপালার ভূমিকা

পৃথিবীর সুদীর্ঘ ইতিহাস জুড়ে বিপুল পরিমাণ গাছপালা ও পশুর কলা (tissues) সম্পূর্ণ পচনের আগে কবরস্থ হয়েছে। এদের কার্বন সমৃদ্ধ বস্তুতে জমে থাকা সৌরশক্তি ভূগর্ভে দীর্ঘকাল ধরে বিপুল চাপের প্রভাবে ঘনীভূত জীবাশ্ম-জ্বালানিতে রূপান্তরিত হয়।

সাম্প্রতিক দশকগুলিতে আমরা বিপুল পরিমাণে জীবাশ্ম-জ্বালানি পুড়িয়ে আসছি। সৌরশক্তির এই আধার মাটিতে অঙ্গীভূত হয়েছে, হাজার লক্ষ বছর ধরে আমাদের প্রাচীনতম পূর্বপুরুষদের পৃথিবীতে আবির্ভাবেরও আগে থেকে। জীবাশ্ম-জ্বালানি পোড়ানোর ফলে আমরা বাতাসে বিপুল পরিমাণে কার্বন ডাইঅক্সাইড ছেড়ে আসছি যা গ্রীন-হাউস এফেক্টের ফলে ভূ-উষ্ণায়নের (global warming) সৃষ্টি করেছে, যা আবার ভয়ঙ্কর ভাবে আবহাওয়া বিন্যাসে বদল নিয়ে আসছে।

একথা ঠিক যে জীবাশ্ম-জ্বালানির অপচয়মূলক ব্যবহার আমাদের আবশ্যিকভাবে কমাতে হবে। কিন্তু ইতিমধ্যেই বাতাসে যে অতিরিক্ত মাত্রায় কার্বন ডাইঅক্সাইড জমেছে তা কমাতে গেলে দরকার বিপুল সংখ্যক বৃক্ষ সৃষ্টির এবং দরকার প্রাকৃতিক বনভূমিগুলিকে পুনরুজ্জীবিত করার যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা। মানুষের দ্বারা কার্বনচক্রের যে ক্ষতিসাধন করা হয়েছে তা নিরাময়ের চাবিকাঠি এটিই। শক্তি চাহিদার উত্তরও হল এটিই। সৌরশক্তি হল এই পৃথিবীতে সুস্থায়ীভাবে সমস্ত প্রাণ ও কর্মকাণ্ডের চূড়ান্ত মহাজাগতিক উৎস। এই সৌরশক্তির দৈনন্দিন নবীকরণে সবচেয়ে কার্যকর বিকেন্দ্রীভূত ও সার্বজনীন উপায় হল সালোকসংশ্লেষ যা এক প্রাকৃতিক প্রক্রিয়া এবং যা করতে পারে একমাত্র গাছপালা।

আমাদের জ্বালানি-বুড়ুক্ষু শিল্প সভ্যতা করঞ্জ (পোঙ্গামিয়া পিননাটা), এবং জাট্রোফা কারকাস (চন্দ্রজ্যোতি/রতনজ্যোত/জংলি এরাণ্ডি) ইত্যাদি তেলে ভরা ‘জৈব-ডিজেল’ (bio-diesel) সমৃদ্ধ বৃক্ষ ও গুল্মের প্রজাতির দিকে ‘ভবিষ্যতের জ্বালানি’ হিসাবে (লোভী চোখে) তাকাতে শুরু করেছে।

অধঃপতিত জমিতে অন্যান্য বৃক্ষ ও গুল্মের সাথে মিশ্র চাষের প্রজাতি হিসাবে এগুলি বপন করা যায় কিন্তু (দু)এক ধরনের (monoculture) বাণিজ্যিক প্রজাতি হিসাবে শুখা জমিতে খাদ্য ফসল প্রতিস্থাপিত করার কাজে এই প্রজাতিগুলির ব্যবহার কার্যত অপরাধমূলক কার্যকলাপের শামিল। জনসাধারণের খাদ্যকে প্রতিস্থাপিত করে মেসিনের জন্য জৈব-জ্বালানি তৈরি করতে জমির ব্যবহারকে মেনে নেওয়া যায় না। বরং আমাদের বিরাটভাবে এবং জরুরি ভিত্তিতে (অঞ্চলের) মাটি হাওয়া জলের সাথে খাপ খাওয়া বৈচিত্র্যময় দেশজ প্রজাতির গাছপালা দিয়ে বিভিন্ন অঞ্চলকে ঢেকে ফেলা উচিত — এ থেকে আমরা বহুভাবে উপকৃত হব।

দিলে, অন্যান্য সকল প্রজাতির উদ্ভিদরা সবচেয়ে স্বাস্থ্যকর ভাবে বেড়ে ওঠে যদি মাটি থাকে শ্রেফ স্যাঁতসেঁতে অথবা আর্দ্র।

সাধারণত যে সমস্ত ফসল খাওয়া হয় তাদের মধ্যে চালই (এক আধা-জলজ প্রজাতি) হল একমাত্র ফসল যা জল জমে থাকা জমিতে ভালো বৃদ্ধি পায়। তাই বর্ষায় প্লাবিত হওয়া নাবাল অঞ্চলগুলিতে প্রাকৃতিক কারণে ধানকে বেছে নেওয়া হয়। যদিও উঁচু জমির উপযোগী ধানের প্রজাতিগুলিও পাহাড়ের ধারে জমি বেঁধে ধাপে ধাপে চাষ করা হয়। এই ধাপ চাষের (terrace farming) কারণ হল এতে পাহাড়ের ঢালে জলের প্রবল গতিকে বাধা দিয়ে মাটির জলধারণ ক্ষমতা বা আর্দ্রতাকে সর্বাপেক্ষা অনুকূল (optimum) সীমায় বেঁধে রাখা যায়।

বেশিরভাগ অন্য ফসলের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত জল মাটির কণাগুলির মধ্যে থাকা অসংখ্য পরিসরগুলি (spaces) থেকে বাতাস ঠেলে সরিয়ে দিয়ে মূল-ব্যবস্থাকে (root system) শ্বাসরুদ্ধ করে ফেলে। ফলে মূল শ্বসন (শ্বাস নেওয়া) বন্ধ হয়ে যায় এবং সালোকসংশ্লেষ ব্যাহত হয়। আবার দীর্ঘমেয়াদী প্লাবন মূলে পচন ঘটায়; গাছ হয়ে পড়ে রোগপ্রবণ ও মারীপোকার আক্রমণের শিকার।

ভাস্কর সাভে বলেন, দুধেল গাই যেমন অসুস্থ হয়ে পড়লে তার স্বাভাবিক মাত্রায় দুধ দেওয়ার অবস্থায় ফিরতে দীর্ঘ সময় লাগতে পারে, তেমনি জলমগ্নতার জন্য ক্ষতিগ্রস্ত মূলদেরও পূর্বের কার্যকারিতা ফিরে পেতে বেশ সময় লাগে। ফলে মাটির অতিরিক্ত জল শুকিয়ে যাওয়ার বা নিষ্কাশিত হওয়ার পর গাছকে তার নতুন পাতা ফুল ও ফলের বদলে মূল ও মূলের

তন্তুগুলিকে পুনরুজ্জীবিত করার দিকে বেশি নজর দিতে হয়।



একটি লম্ব দেওয়ালের গা বেয়ে বেড়ে উঠেছে একটি অশ্বখ গাছ

ভাস্কর ভাই আরও বলেন, তাৎপর্যপূর্ণভাবে হিমালয় বা সহদ্রির মতো পাহাড়ের ঢালগুলিতে, যেখানে খুব ভালোভাবে জল নিষ্কাশিত হতে পারে, সেখানে প্রায়শই ঘন বন দেখতে পাওয়া যায়। এরকম খাড়াই পাহাড়ের ঢালে মাধ্যাকর্ষণের জন্য বৃষ্টির জল দাঁড়াতে পারে না। এখানে ভূমিক্ষয়ও হয় খুব বেশি, বিশেষত ভারী বর্ষায়। খাড়াই পাহাড়ের ঢালে অনেক জায়গায় পাথর

থাকে ৯৫% এবং মাটি মাত্র ৫%। মূলের আশপাশ অঞ্চলে জল জমে থাকার সম্ভাবনা খুবই কম, তবু এই সব জমিতে বিশাল সব প্রাচীন বৃক্ষরা মাথা উঁচু করে থাকে। মিতাহারেই যে গাছদের চাহিদা মেটে এর থেকে উৎকৃষ্ট প্রমাণ আর কীই বা হতে পারে। আটমাস ধরে যখন বৃষ্টি হয় না, তখন এই সমস্ত পাহাড়ের ঢালে গাছেরা ঘনীভূত শিশির থেকে ও মাটিতে পাতা পচা সারের (humus) ভিতরের বায়ু থেকে সরাসরি জলকণা (বিশেষত যখন বাতাসে আর্দ্রতা থাকে খুব বেশি) গ্রহণ করে যথেষ্ট সক্ষমভাবেই টিকে থাকে। বর্ষায় পাহাড়ের খাঁজে, ফাটলে অথবা নাবাল পাথরে বৃষ্টি কিছুটা শোষিত হয় যা থেকে পরে শিকড়গুলি রস গ্রহণ করে।

পাহাড়ের কম ঢালে যেখানে মাটি কিছুটা গভীর, সেখানে মাটির ভিতরে অসংখ্য ছিদ্র পথের দেওয়ালগুলি ক্ষুদ্র ফিল্মের মতো জলকণা ধরে রাখে। এর ফলে মাটিতে বায়ু চলাচল ও মূলের শ্বসন দ্রিফ্টা অব্যাহত থাকে, যেমনটা ঘটে থাকে খাড়াই পাহাড়ের ঢালগুলিতেও। যাই হোক না কেন, বনভূমিতে মানুষের দ্বারা সেচ দেওয়ার কোনো প্রয়োজন হয় না।

পর্বতগুলিতে যদি এরকম হয়, নদীর নাবাল উপত্যকা ও সমভূমিতে কিছু পাথর আর নুড়ি সহ মাটি সমৃদ্ধ হতে পারে, কিন্তু যেহেতু এসব অঞ্চলে ভালো জল নিষ্কাশন হয় না এবং ভারী বর্ষণেও উচ্চতর জমিতে প্রবাহিত জল জমে থাকার প্রবণতা বেশি, সেখানে গাছদের মূলগুলি বাতাসের অভাবে ভোগে।

অক্টোবরে বৃষ্টি বন্ধ হয়। তারপর জমে থাকা জল শুকিয়ে গেলে অথবা বেরিয়ে গেলে, প্লাবনের ফলে মূলগুলির ক্ষয়কে মেরামত করতে অথবা সেগুলিকে প্রতিস্থাপিত করতে লেগে যায় কয়েক মাস। এই সময়কাল জুড়ে নতুন পাতা ও ডালপালায় সালোকসংশ্লেষ কার্যত বন্ধ থাকে। এরপর নতুন পাতা গজাতে অপেক্ষা করতে হয় মার্চ অথবা এপ্রিল পর্যন্ত। কিন্তু দু-তিন মাস পরে বৃষ্টি ফিরে আসে এবং আবার সেখানে মাটি তার থেকে অতিরিক্ত জল বার করে দিতে পারে না। ফলে সেখানে বাতাসের অভাব ঘটে এবং আবার সালোকসংশ্লেষের কাজ ব্যাহত হয়। বছর বছর প্লাবিত হওয়া চালু জমিতে গাছপালা ও বনের বৃদ্ধি ঘটে ভালোভাবে জল নিকাশ হয় এমন ঢালের জমির গাছ ও বনের থেকে অনেক কম।

প্রাকৃতিক বনভূমিতে বিপুল অঞ্চল জুড়ে মাটির উপরিতল থাকে শীতল সবুজ — যা থেকে প্রতিদিন বেশি পরিমাণ জলীয় বাষ্প ঘনীভূত হয়ে ভোরের শিশিরে মাটি ভিজে থাকে, ঘন ‘বহুতল’ (multi-storeyed)

গাছ-পাতায় ঢেকে থাকে এমন খামারেও এটাই ঘটে। এইরকম পরিবেশে ক্ষুদ্র-আবহাওয়াপূর্ণ আর্দ্রতা (micro-climate humidity) বেশি থাকে কারণ ঘন গাছ-পাতায় ঢাকা ছায়া শীতল এই অঞ্চলগুলি বাতাসের আঘাত প্রতিহত করে এবং তাতে ভূতল বাষ্পীভবন ও উদ্ভিদের বাষ্পমোচনও কম হয়। সেটা শুষ্ক, জোর বাতাস বওয়া আবহাওয়ায় সুস্পষ্টভাবে বোঝা যায়। গাছের ছাতার নিচে বাতাসের আর্দ্রতাকে মাটির হিউমাস (humus) সরাসরি শোষণ করে। তাই কখনও কখনও প্রয়োজন মতো সামান্য সেচের দ্বারাই জমির উপরিভাগের মাটির (top soil) স্যাঁতসেঁতে ভাব বজায় রাখা যায়। এর পাশাপাশি সক্রিয় মূলতন্তুগুলি যাদের থেকে গাছের মূল-ব্যবস্থার (root system) ওপরের মাথাটা (crown) তৈরি হয় — তারাও এই আর্দ্রতাকে শোষণ করে উপকৃত হয়।

যেখানে মাটির ভেদ্যতা বেশি অথবা মাটির ভিতরের ছিদ্রগুলি বড়ো এবং মাটির দানাগুলি বড়ো (যা সমস্ত ধরনের সজীব মাটির বৈশিষ্ট্য) সেই মাটির জলধারণ ও বায়ু-ধারণ ক্ষমতাও হয় বেশি। এরকম এক পরিবেশ, স্থানীয় চাষিরা যাকে বলে ‘ভ্যাপসা’ — যেখানে মাটিতে যুগপৎ বাতাস ও জলকণা (উষ্ণতাও বটে) বর্তমান, সেই মাটিই গাছের স্বাস্থ্যকর বৃদ্ধির ক্ষেত্রে আদর্শ। বেশি জল থাকলে ‘ভ্যাপসার’ অক্সিজেন সরবরাহকারী দিকটি বিঘ্নিত হয় এবং মাটির ক্ষতি হয় যা গাছের স্বাস্থ্যের পক্ষেও ক্ষতিকর।

এছাড়া দুর্বল নিকাশি ব্যবস্থায় অতিরিক্ত সেচের ফলে যখন সেচের জল শুকিয়ে যায়, তখন মাটির উপরিতলে ক্রমবর্ধিষ্ণু সাদা নুনের গুঁড়ো জমে এবং নিশ্চিতভাবে মাটি লবণাক্ত হয়ে পড়ে। মাটির অভ্যন্তরে মূলের এলাকায় (root zone) জল জমে থাকে এবং এই প্রক্রিয়াটি দিনে দিনে ভারী সেচ সেবিত অঞ্চলগুলিকে বিশাল এলাকা জুড়ে ভিজে মরুভূমিতে পরিণত করছে।

কোথায় এবং কীভাবে?

ভাস্কর সাভের মতে আরেকটি সাধারণ ভুল হল, গাছের গোড়ায় নিচু গর্ত খুঁড়ে সেখানে সেচ দেওয়া, এর বদলে প্রসারিত মূল গুলির সক্রিয় ডগাগুলি যে অঞ্চলের মাটির নিচে থাকে সেখানে সরু একটি এলাকায় (অথবা গোল রিংয়ের মতো কেটে) যদি সেচ দেওয়া হয়, তাহলে জলের ছড়িয়ে যাওয়ার ও অতিরিক্ত বাষ্পীভবনের ক্ষতি কমিয়ে আনা যায়। এতে ভাসানো সেচের ফলে মাটির লবণাক্ত হয়ে পড়ার যে সমস্যা তা থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। আরও গুরুত্বপূর্ণ হল, এর ফলে মাটিতে বায়ু চলাচল

অব্যাহত থাকে এবং কাণ্ডের কাছে মূলতন্ত্রের মাথায় (crown of root system) শ্বসনের কাজটি ভাল ভাবে চালু থাকে।

তাই ভাস্কর সাভে তাঁরই উদ্ভাবিত মঞ্চ এবং গর্ত (platform and trench) সেচ পদ্ধতি অণুসরণ করেন। এতে জল ব্যবহারের কার্যকারিতা বিশেষভাবে বৃদ্ধি পায়। গর্তগুলি সেচ খাল হিসাবে ব্যবহৃত হয়। এই খাল কাটা হয় গাছের প্রতি সারির দুই দিকেই, গাছ থেকে মূলগুলি বাইরের যেদিকে ছড়িয়ে পড়ে সেই ধার বরাবর খালগুলি কাটা হয়, যাতে এই ছড়ানো মূলের ডগাগুলি সেই জল শোষণ করতে পারে। বুড়ো আঙ্গুলের নিয়ম মেনে মোটামুটি বলা চলে যে মাটির ওপরে পাতার ছাতা (canopy) যতখানি প্রসারিত হয়, মাটির নিচে পার্শ্বস্থ মূলের প্রসারও হয় ঠিক ততখানি, অথবা গাছের মাথার ঠিক ওপরে যখন সূর্য অবস্থান করে, তখন গাছের ছায়া যতখানি অঞ্চল জুড়ে পড়ে ঠিক ততখানি। সেচ খালগুলি কাটতে হবে এই ছায়ার কিনারা ধরে।

গর্তগুলি প্রায় ১৫ ইঞ্চি চওড়া ও ১২ ইঞ্চি গভীর। এগুলি বর্তমানে সাভের পরিণত বাগিচার ৫% স্থান অধিকার করে আছে। বাগিচায় এক একটি গর্ত/নালা দুটি সারি গাছের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত যাতে তারা দুই দিকের গাছদের জলের যোগান দিতে পারে। বাগিচার বাকি ৯৫% জমিতে (অর্থাৎ মঞ্চগুলিতে যেখানে বৃক্ষ ও গুল্মগুলি বেড়ে ওঠে) আর কোনোরকম সার সরবরাহের প্রয়োজন পড়ে না।

এই ব্যবস্থাটি (মঞ্চ এবং গর্ত) তৈরি করা হয়েছে এমন এক এলাকা অনুযায়ী যে প্রাকৃতিক ভাবে আন্দোলিত ভূমিখণ্ডে (terrain) গাছ-গাছালির খুব ভালো বৃদ্ধি হয়। ভূমির ঢেউ খেলানো প্রকৃতির জন্য অতিরিক্ত বৃষ্টির জল গাছের গোড়ায় দাঁড়িয়ে যায় না। ফলে যে খালগুলি সেচ খাল হিসাবে ব্যবহৃত হয়, বর্ষার মাসগুলিতে তারা নিকাশি নালার কাজ করে।

এখানে খামারের ভূতলের অতি স্বল্প অঞ্চলে (১/২০ ভাগ) সেচ দেওয়া হয় এবং তা ঘন ছায়ায় ঢাকা স্পঞ্জের মতো ভেদ্য (porous) মাটিতে দ্রুত শোষিত হয়। একথা মনে রাখলে এটা সহজেই বোঝা যায় যে কেন বাষ্পীভবনের জন্য জলের অপচয় ও মাটির লবণাক্তকরণের সমস্যাগুলিকে কল্পবৃক্ষে সম্পূর্ণ এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব হয়। বর্ষার মরশুমে এখানে যে ৮০ ইঞ্চির ওপর বৃষ্টিপাত হয়, তার অনেকটাই মাটি শুষে নেয় এবং ধরে রাখে।

মাটির উপরিভাগ যখন বৃষ্টির জলে সংস্পৃক্ত হয়, তখন তা টুইয়ে প্রবেশ করে ভূগর্ভস্থ জলাধারে এবং প্রলম্বিত ভারী বর্ষণের সময় অতিরিক্ত জল

সিক্ত নোনা মরুভূমিরা

মাটির লবণাক্তকরণ সেচ-নিবিড় কৃষির সবচেয়ে বড়ো সমস্যা বলে প্রমাণিত হয়েছে। এর ফলে লক্ষ লক্ষ হেক্টর চাষের জমি ধ্বংস হয়ে গেছে। যে জমিতে নিকশি ব্যবস্থা ভালো নয় এবং বিশেষত শুখা অঞ্চলে (arid region) যেখানে বাষ্পীভবন হয় খুব বেশি, সেখানেই এই ক্ষতির মাত্রা সবচেয়ে বেশি।

ভাস্কর সাতে স্মরণ করিয়ে দেন, “শুধুমাত্র বৃষ্টিই হল তুলনামূলকভাবে বিশুদ্ধ পাতিত (distilled) জল। খাল, নলকূপ, কূয়ো ইত্যাদি থেকে যে জল সেচের জন্য ব্যবহার করা হয়, তা মাটির সাথে যুক্ত থাকার কারণে সেই জলে ধাতব লবণ মিশে থাকে। (যত বেশি সময় জুড়ে এবং যত বেশি এলাকার মাটি জলের সংস্পর্শে থাকে তত বেশি ঘনত্বে ধাতব লবণ জলে দ্রবীভূত হয়ে থাকে।) খামারে যখন এই জল ব্যবহৃত হয়, তার কিছুটা বাষ্পীভূত হয় এবং ভূতলে লবণ রেখে যায়। জল বেশি বাষ্পীভূত হলে মাটিতে বেশী লবণ জমা হয়। এই প্রক্রিয়া চলতে চলতে মাটির পুরু স্তরে লবণ ঘনীভূত হয়।

মাটি বেশি নোনা হয়ে গেলে, তার বাতাস ও জলধারণ ক্ষমতা হারিয়ে যায়। মাটির ওপর পুরু স্তরে লবন জমা থাকলে বাতাস ও জল মাটির ভিতরে প্রবেশ করতে পারে না। এর ফলে গাছ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আবার, কেঁচো ও জীবাণুরা মাটিতে অক্সিজেনের অভাবে মারা যায় এবং মাটি দ্রুত ধ্বংস হতে থাকে।

অতীতের ঐতিহ্যগত মিশ্রচাষ ও ফসলের আবর্তন ব্যবস্থাকে পরিত্যাগ করে আখ, বাঁশমতি চাল ইত্যাদি জলপেটুক অর্থকরী ফসল (cash crop) যেখানে সারা বছর ধরে চাষ করা হয় সেই মাটি ভয়াবহভাবে লবণাক্ত হয়ে পড়ে। রাসায়নিক ব্যবহারের ফলে এই মাটির ভেদ্যতা (porosity) ও জল ধারণ ক্ষমতা কমে যাওয়ায় এবং ভূতলে বাষ্পীভবন বেড়ে যাওয়ায় সমস্যা আরও ঘনীভূত হয়। রাসায়নিক ব্যবহারের ফলে রাসায়নিকগুলির লবণও সেচের জলে দ্রবীভূত হয়ে শেষে মাটিতে লবণ বাড়িয়ে দেয়।

ভাস্কর সাতে বলছিলেন, মহারাষ্ট্রের সাঙ্গলি ও বারামতি অঞ্চলে যেখানে প্রচুর আখ উৎপাদন হয়, সেখানে মাটির ভয়াবহ অবস্থা আমি

দেখেছি। এই ভয়াবহতা সৃষ্টি হয়েছে সেচ-নিবিড় এবং রাসায়নিক নিবিড় চাষের জন্য। এখানে মাটির স্বাদ গ্রহণ করলেই বোঝা যাবে মাটি কত ভয়ঙ্করভাবে লবণাক্ত। “বেশি সেচ দেওয়ার ফলে আরেকটি যে সমস্যা উদ্ভব হয়, তা হল জলমগ্নতার (water logging) সমস্যা। অনেক জায়গায় ভূজল গাছের শিকড়ের এলাকায় পৌঁছে গেছে। অবস্থাটা এমন দাঁড়িয়েছে যে এই ধ্বংসপ্রাপ্ত মাটিতে একটা ঘাসের ফলকও জন্মাবে না।”

অনুরূপভাবে পাঞ্জাব ও হরিয়ানায় বেশ কিছু অঞ্চল লবণাক্তকরণ ও জলমগ্নতার ভীষণ সমস্যায় ভুগছে। সেই অঞ্চলে উৎপাদনশীলতা পুনরুদ্ধার করা অত্যন্ত কঠিন। রাজস্থান ও কচ্ছ শুখা মরুভূমিকে নতুন করে সবুজ করে তোলা বড়ো সেচ প্রকল্পগুলির জন্য সৃষ্ট নতুন ভিজে বা সিক্ত মরুভূমিগুলিকে সবুজ করার চেয়ে সহজতর।

বলা হয় সমগ্র পৃথিবী জুড়ে বিশাল সব শক্তিশালী সেনাবাহিনীরা যত না সভ্যতা ধ্বংস করেছে তার চেয়ে লবণাক্তকরণের সমস্যা অনেক বেশি সভ্যতার সংহারক। ৬০০০ বছর আগে মেসোপোটেমিয়ায় সুসা ও অন্যান্য যেসব নগররাষ্ট্র গড়ে উঠেছিল সেগুলি উন্নত সেচ ব্যবস্থার ফলে সমৃদ্ধ হয়েছিল। সেদেশে ২ কোটি ৫০ লক্ষ মানুষের মুখে অন্ন তুলে দেওয়ার পরও (বিদেশে) বিত্রির জন্য ফসল থাকত। আজ টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস অঞ্চলের চারপাশ — একসময় যা উর্বর অর্ধচন্দ্রাকৃতি অঞ্চল বলে প্রসিদ্ধ ছিল — তার প্রায় সবটাই আজ মাইলের পর মাইল জুড়ে লবণে ভরে গিয়ে বন্ধ্যভূমিতে পরিণত হয়েছে।

রাষ্ট্রসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার (ফুড অ্যান্ড এগ্রিকালচারাল অর্গানাইজেশন) মতে সারা বিশ্বের সেচ সেবিত এলাকার অর্ধেক অঞ্চলই লবণাক্তকরণ ও জলমগ্নতার সমস্যায় ভয়ঙ্করভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। লবণের এই আগ্রাসনের ফলে প্রতি বছর ১০,০০০ বর্গ কিমি জমি পরিত্যক্ত হয়। ভারতে আনুমানিক ১ কোটি হেক্টর জমি প্রতি বছর জলমগ্ন (waterlogged) হয়ে পড়ে এবং ২ কোটি ৫০ লক্ষ হেক্টর লবণাক্তকরণের ভীতির সম্মুখীন হয়।(১৩)

টীকা (:): ওপরে উল্লিখিত ব্যবস্থাটির পরিকল্পনা করা হয়েছিল তুলনামূলকভাবে সমভূমিতে সেচ সেবিত নারকেল ও সরেদা ইত্যাদি উৎপাদনের জন্য। অবশ্য সেচহীন সমতলভূমিতে বাগিচায় যেখানে আম, কাজু, জাম, বের,

আতা, টেপারী ইত্যাদি ফলের গাছ লাগান হয়েছে, সেখানে খাদ (trench) অতিরিক্ত জননিকাশে সাহায্য করে। যদিও এইরকম প্রয়োজনীয়তা সারা বছর জুড়ে কয়েক দিনের জন্য দেখা দিতে পারে যখন ভারী বর্ষণ দেখা যায়। মাটির ঢালে গাছ পুঁতলে, যদি খাদ (trench) কাটা হয়, তা কাটতে হবে ঢালের সীমারেখা বরাবর যাতে করে মাটিতে বৃষ্টির জল বেশি পরিমাণে শোষিত হয় এবং ভূমিক্ষয় আটকানো যায়। নালাগুলি দিয়ে বয়ে যায়, বিশেষত চ্যাপ্টা (flat) বা সমভূমির খণ্ডে — যাতে গাছের গোড়ার চারপাশের মাটিতে জল জমতে পারে না — ফলে সেখানে গাছের ‘সক্রিয় মূলরা’ ক্রমাগত শ্বাসকার্য্য চালিয়ে যেতে পারে। বিপুলভাবে জল সংরক্ষণ করা এবং জলের ব্যবহার কমানো ছাড়াও কল্লবক্ষ সেচ সহ নিকাশি ব্যবস্থাটি সরল শ্রমসাশ্রয়ী, সহজে রক্ষণাবেক্ষণ ও কার্যকর করা যায়, যদিও তা দূর নিয়ন্ত্রিত (remote controlled)। ভাস্কর সাভে — এখন তাঁর বয়স আশির শেষের দিকে — তবুও তিনি এখনও তাঁর ১৪ একর খামারের সমগ্র সেচ ব্যবস্থাটির দেখাশোনা করেন নিজেই। (তাঁর ভয়, অন্য কেউ যদি দেখাশোনা করে তাহলে সে অসাবধানে বেশি সেচ দিয়ে ফেলবে।) তিনি যখন বাগিচার ছায়ায় হাঁটাচলা করেন, তখন প্রয়োজন অনুসারে কখনও জল বয়ে যাওয়া খাদের মুখের মাটি সরিয়ে বেশি জল প্রবাহের ব্যবস্থা করেন, আবার হয়তো কখনও কোনো খাদের মুখে একটু বেশি মাটি দিয়ে বুজিয়ে জলের প্রবাহ কমান বা বন্ধ করেন যাতে করে গাছের সারিগুলি পরিমিত মাত্রায় জল পায়।

চারা গাছগুলির পাশে সেচ-খাদগুলি কাটা হয় — বেশি দূরে নয় — ৯ ইঞ্চি দূরে, যাতে মূলের মাটির নিচে বেশি দূরে বিস্তৃত হতে পারে। খাদের আগেই তাদের শিকড়ের বিস্তার থমকে দাঁড়ায়। কিন্তু চারাগাছ যতই বড়ো হতে থাকে, সেই বৃদ্ধির সাথে তাল মিলিয়ে খাদও খেপে খেপে দূরে কাটা হয়। এতে গাছের মূলের জল পাওয়ার তাড়নায় জলের দিকে যাওয়ার জন্য অনুপ্রাণিত হয় এবং দ্রুত বাড়ে। এইরকম ভাবে বিস্তৃত মূলের জাল গাছের পক্ষে দুরকম ভাবে গুরুত্বপূর্ণ। ১) এর ফলে গাছের স্থায়িত্ব (stability) ও ভার বহনের ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় যাতে সে ভারী ঝড় সহ্য করে দাঁড়িয়ে থাকতে সক্ষম হয়। ২) এর পাশাপাশি তাৎপর্যপূর্ণভাবে গাছের মূলগুলির মাটিতে বৃহত্তর বিস্তৃতি মানেই গাছ বেশি জায়গা জুড়ে শ্বাসকার্য্য, আর্দ্রতা ও খনিজ পুষ্টির রসদ সংগ্রহ করতে পারে।

তাই ভাস্কর সাভে সতর্ক করেন এই বলে যে কিছু বাবা-মা যেমন

আত্মাত্ম করে ছেলেমেয়েদের মানুষ করতে গিয়ে তাদের কুঁড়ে বানাতে উৎসাহিত করেন, একজন চাষিরও গাছেদের ক্ষেত্রে তা করা উচিত নয়। গাছ নিজের চাহিদা মেটানোর জন্য নিজেই সচেতন হয়ে মূলের বিস্তার ঘটায় — চাষির কখনই গাছেদের এই প্রচেষ্টাকে নিরুৎসাহিত করা উচিত নয়। তা করলে গাছ পরনির্ভরশীল হয়ে পড়ে এবং পরবর্তীকালে তা গাছের উন্নতিতে বেড়ি হয়ে দাঁড়ায়। এই বেড়িকে এড়ানো যায় যদি গাছ যত বাড়তে থাকে, খেপে খেপে খাদগুলোকে গাছ থেকে কিছুটা দূরে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়।

খাদ বা খাদের কাছে যদি আচ্ছাদন (mulch) বা সার (manure) রাখা হয়, তাহলে বাতাস ও আর্দ্রতার উপস্থিতিতে মাটির ব্যাক্টেরিয়া কেঁচো ইত্যাদিদের কর্মকাণ্ডে সেগুলির (আচ্ছাদন ও সার) পচন ঘটে। সমৃদ্ধ প্রাকৃতিক সারে যে খনিজ পুষ্টিগুলি রয়েছে, জমিতে (in situ) চলে তাদের অবিরাম মছন এবং তারপর তারা সেচ বা বৃষ্টির জলে দ্রবীভূত হয়ে কৈশিক কার্যাবলীর (capillary actions) মাধ্যমে গাছের মূলরোম দ্বারা শোষিত হয়।



বাগিচায় সদ্য রোপিত চারা গাছগুলির জন্য সেচ খাল

ভাস্কর ভাই বলেন, “খাদগুলিতে আমরা মাটির ক্ষুদ্র জীবগুলির জন্য জৈব বর্জ্যের এক উৎকৃষ্ট ভোজনের ব্যবস্থা করি। এই ক্ষুদ্র জীবগুলির রচন পদার্থ আবার গাছেদের জন্য খনিজ পুষ্টির এক স্বাস্থ্যকর ভোজন মেলে ধরে যাতে গাছেরা তাদের প্রয়োজন অনুসারে তা গ্রহণ করতে পারে। তাই

কেউ ক্ষুধার্ত বা তৃষ্ণার্ত থাকে না। আবার এতে কোনো অপচয় হয় না বা আধিক্যের কোনো সমস্যা হয় না যা থেকে গাছদের ওপর কোনো বিষক্রিয়া হতে পারে — যেটা প্রায়শই ঘটে কৃষি-রাসায়নিক ব্যবহারে এবং ভাসানো বা প্লাবন সেচের দ্বারা ফসল ফলানোর ক্ষেত্রে।

তিনি আরও বলেন, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল, গাছদের প্রয়োজনীয় জিনিস দেওয়ার জন্য কোনো কর্ষণের (tillage) বা কৃষির (cultivation) প্রয়োজন হয় না। এই ধরনের কোনো কর্ষণ যা মাটির জৈবজীবন ও গাছদের মূল-ব্যবস্থার (root system) ক্ষতি করে — কার্যত তা নিষ্ফল। বহু মাস বা বছর ধরে সৃষ্ট বহু মাইল ধরে বিস্তৃত মূলের সূক্ষ্ম তন্তুর জাল (ওপরের সক্রিয় শীর্ষ অঞ্চল) মাত্র এক ঘন্টা মাটির কর্ষণে হারিয়ে যেতে পারে।

“কর্ষণের ফলে যদি এমনকি মূলের সামান্য অংশের ক্ষতি হয় বা তা জলে প্লাবিত হয় তাহলে তাৎপর্যপূর্ণভাবে সালোকসংশ্লেষের কার্যকারীতা কমে যায়। সংগৃহীত সৌরশক্তির বেশীরভাগটাই ব্যয় হয় আঘাতপ্রাপ্ত মূল জালিকার পুনরুজ্জীবনে। ফলে ফুল ও ফলের বৃদ্ধিতে ব্যবহারযোগ্য সৌরশক্তির অভাব দেখা দেয়। এছাড়া গাছকে কেন্দ্র করে তাকে জোগান (input) সরবরাহের জন্য যেখানে নিয়মিতভাবে কর্ষণ করা হয়, সেখানে সুবিস্তৃত মূল-ব্যবস্থা গড়ে উঠতে পারে না। ফল ধরার ফলে যদি গাছের ওজনের উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি ঘটে, তবে তা দুর্বল ও বৃদ্ধিতে বাধাপ্রাপ্ত মূল-ব্যবস্থা (stunted root system) নিয়ে গাছের স্থায়িত্বের সমস্যা সৃষ্টি করে। গাছ ‘মনে মনে’ তার মূল-ব্যবস্থার এই দুর্বলতার কথা জানে। তাই সঙ্গত কারণেই তার ফল আসুক সে চায় না।

আবার সমভূমিতে ‘মঞ্চ এবং খাদ’ ব্যবস্থার আর একটা সুবিধা হল এই যে এটি মাটির জীবদের জন্য একই সাথে ভিজে ও শুকনো পরিবেশ দেয়। এটি বর্ষার সময়ে গুরুত্বপূর্ণ। তখন কেঁচো ও অন্যান্য পোকারা অতিরিক্ত ভিজে খাদগুলি থেকে একটু ওপরে মঞ্চের দিকে সরে যায় যেখানে মাটি তুলনামূলকভাবে শুকনো। আর এটা করতে গিয়ে তারা মাটি কর্ষণ করে এবং মাটির (মঞ্চের) ওপরে উঠে এসে মলত্যাগ করে — যে মল বা কেঁচো সার পুষ্টিতে অত্যন্ত সমৃদ্ধ।

কোথায় তাদের জল প্রয়োজন

তা গাছেরা জানান দেয়

বর্ষীয়ান জৈবচাষি শ্রী মহেন্দ্র ভাই তাঁর মনোমুগ্ধকর অভিজ্ঞতা ভাগ করে নিতে জানান যে গাছেরা আসলে কোথায় তাদের আর্দ্রতা প্রয়োজন তার

সংকেত দেয়। তিনি কৃষকদের সুপারিশ করেন যে তারা যেন প্রতিটি প্রজাতির পাতাদের বৈশিষ্ট্যগুলি অধ্যয়ন করে। “যদি বৃষ্টি হয় অথবা গাছের ওপরে জল ছোটানো হয়, তখন গাছের পাতাদের আকার ও বিন্যাস (pattern) লক্ষ্য করুন — দেখবেন এসব কিছু পাতার ওপরে পড়া জলকে নিচের দিকে গড়িয়ে দেয়। আপনি এটা দেখতে পাবেন যে আখ, কলা, আদা ইত্যাদি গাছে জল টুপ টুপ করে গড়িয়ে গাছের কেন্দ্রীয় কাণ্ডের গোড়ায় মাটিতে পড়ছে। পেঁপে, আম, সবেদা, নারকেল (বাস্তবিকই বেশিরভাগ ফলের গাছ) ইত্যাদি অন্যান্য গাছের ক্ষেত্রে পাতাগুলি থেকে গাছের ছাতার সীমানা বরাবর জল পড়ার প্রবণতা দেখা যায়। এর থেকে একজন চাষি এই সিদ্ধান্তে আসতে পারে যে বিভিন্ন প্রজাতির গাছেরা নিজ নিজ ভাবে ঠিক করে তাদের কোথায় জল প্রয়োজন।

কখন সেচ দিতে হবে

কখন সেচ দিতে হবে, কতক্ষণ বা কতদিন অন্তর তা দিতে হবে এবং কতটা — এসব বিষয়ে ভাস্কর সাভের অন্তর্দৃষ্টি (insight) অত্যন্ত প্রখর। তিনি জানেন যতক্ষণ তার ফলের গাছগুলোর গায়ে যাবতীয় ক্রোটন (এক ধরনের বিরঞ্) ‘জলমিটার’ (water meters) খাড়াই ও চনমনে ভাবে দাঁড়িয়ে থাকে, ততক্ষণ মাটিতে যথেষ্ট পরিমাণে আর্দ্রতা থাকে এবং গাছে জল দেবার প্রয়োজন হয় না।

বাগিচায় ফলের চারাগাছগুলি (দু-বছর বয়সের কম) যেখানে থাকে, প্রধানত সেখানেই জলসেচ দেবো বলে দিলে গাছের ক্ষতি হতে পারে। তাই যে চারাগাছগুলি বাড়ছে তাদের পাশে দাঁড়ানো ক্রোটন গাছগুলি যদি বিমিয়ে পড়ে — তাহলে এই সংকেতই তাকে সচকিত করে যে চারাগাছগুলির শীঘ্রই জলের প্রয়োজন — সেই দিন বা পরের দিনে।

বাগিচার যে অংশে গাছেরা বড়ো হয়ে গেছে, সেখানে ক্রোটনের পাতারা বিমিয়ে পড়লেও বড়ো গাছগুলির গভীরতর মূল-ব্যবস্থার ফলে সেই গাছেরা মাটির গভীরতর অঞ্চল থেকে আর্দ্রতা শুষে নিতে পারে। এর বিপরীতে ক্রোটনের মূল মাটির নিচে বড়ো জোর ৯ ইঞ্চি পর্যন্ত যেতে পারে। কখন কখনও এই অগভীর মূলের গাছেরা দুপুরে কুঁকড়ে যেতে পারে। কিন্তু তা সন্ধ্যায় চনমনে হয়ে পাতা মেলে ধরে। দিনেরবেলায় এই পাতা কুঁকড়ে যাওয়ার ফলে বাষ্পমোচনের হার অনেকটা মন্দীভূত হয় এবং গাছকে জল ধরে রাখতে সাহায্য করে।

ক্রোটন ‘জলমিটারদের’ সংবেদের (response) ভিত্তিতে ভাস্কর ভাই সাধারণ প্রত্যাশার বিরোধী এক আবিষ্কার করেছিলেন — গ্রীষ্মকালে

গাছেদের সেচের প্রয়োজন হয় শীতকালের চেয়ে কম। গ্রীষ্মে ২৫-৩০ দিন অন্তর একবার সেচ দিতে হয়, কিন্তু শীতে এক পক্ষকালে অন্তত একবার সেচ দিতে হয়। এর কারণ হল এই উপকূল অঞ্চলে গ্রীষ্মে বাতাসে আর্দ্রতা থাকে শীতকালের চেয়ে বেশী এবং দিনে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা গাছের ছায়ায় কখনও খুব বেশি বাড়তে পারে না। ভোরের দিকে শিশিরও ঘনীভূত হয় খুব বেশি। হিউমাস বা পাতা পচা সার এইরকম পরিস্থিতিতে আর্দ্রতা শোষণ করে খুব বেশি।

যারা এই যুক্তি মানতে নারাজ ভাস্কর সাভে তাদের আরও বিশদে ব্যাখ্যা দেন, “শীতে আমাদের ঠোঁট ও ত্বক বেশি ফাটে। তার কারণ হল শুকনো বাতাস। তেমনিভাবে কাপড় কেচে আমরা যে দড়ি বা তারে শুকোতে দিই তাও শীতকালে তাড়াতাড়ি শুকায় কারণ কাপড়ের জল/আর্দ্রতা গ্রীষ্মের গুমোট আবহাওয়ার চেয়ে শীতের শুকনো বাতাস বেশি তাড়াতাড়ি শোষণ করে।”



বিমানো ফ্রেটন



খাড়াখাড়ি দাঁড়িয়ে থাকা ফ্রেটন

এটাও তাৎপর্যপূর্ণ যে ভারতের জঙ্গলের বহু গাছে গরমকালে বর্ষা আসার আগেই নতুন পাতায় ভরে ওঠে। বিষয়টি বছরের এই সময়ে আবহাওয়ার উচ্চতর আর্দ্রতার (humidity) সাথে যুক্ত। মাটির হিউমাস রাত্রি বেলায় এই আর্দ্রতাকে শুষে নেয়। সেখান থেকে গাছও আর্দ্রতা/জলকণা সংগ্রহ করতে পারে।

শীতকালের থেকে গ্রীষ্মকালে কম সেচের প্রয়োজন — এই বিষয়টি অবশ্যই শুখা অঞ্চলের (arid region) ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। কারণ শুখা অঞ্চলে গ্রীষ্ম অত্যন্ত গরম ও শুকনো হয় এবং সেখানে গাছেদের বৃদ্ধি হয় এত কম যে খামারের মধ্যে ক্ষুদ্র-আবহাওয়া সৃষ্টির জন্য আর্দ্রতা ধরে রাখা সম্ভব হয় না।

কম হলে আরও ভালো, কিছু না হলে সবচেয়ে ভালো

পরিণত গাছেরা তাদের পরিবেশ এবং আমাদের দেখভাল করে। এর বদলে তাদের চামচে করে খাইয়ে লালন করা হাস্যকর। যখন ছোটো চারার বড়ো হয়, তাদের ছাওয়া বাষ্পীভবনের কারণে জলের অপচয় কমিয়ে আনে। মাটিও তখন বেশি জল শোষণ করতে পারে এবং উর্বর হয়ে ওঠে। ফলে প্রথম বছরের তুলনায় অত ঘনঘন সেচ দেওয়ার প্রয়োজন পড়ে না। সার দেওয়ার প্রয়োজনও কমে আসে।

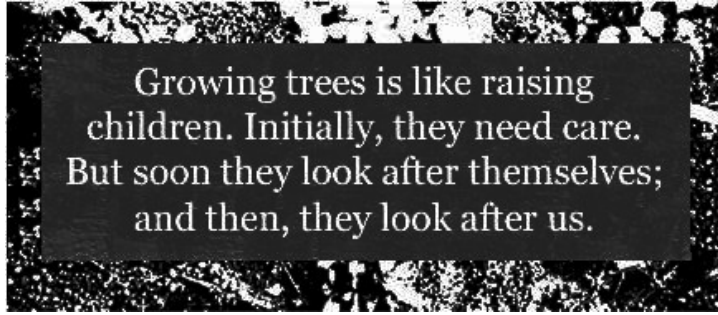
“একজন মায়ের পক্ষে তার নবজাত সন্তানের প্রতি পরিপূর্ণ নজর দেওয়াই স্বাভাবিক। এইরকম সুকোমল বেড়ে ওঠার সময় শিশুটি তার মায়ের দুধ, উষ্ণতা ও যত্নের ওপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল। কিন্তু যখন শিশুর সমস্ত দুধ-দাঁত বের হয়ে যায়, তখন এই নির্ভরশীলতা অর্ধেক কমে যায়। যখন সে নিজে নিজেই হাঁটতে পারে, চান করতে পারে, তখন তার নির্ভরশীলতা আরও কমে আসে। শেষে যখন সে প্রাপ্তবয়স্ক হয়, তখন সে সম্পূর্ণভাবে আত্মনির্ভরশীল হয়ে ওঠে।

সেইরকম গাছ যখন বাড়তে থাকে এবং তার মূলগুলির বৃদ্ধি হতে থাকে, চাষির জোগানের (input) ওপর তার নির্ভরশীলতা ধীরে ধীরে কমে আসে। এটার কারণ হল বিস্তৃত মূলেরা গাছকে সাহায্য করে যাতে সে মাটির দূরতর ও গভীরতর এলাকা থেকে আর্দ্রতা ও পুষ্টির প্রয়োজন মেটাতে পারে। ইত্যবসরে প্রাকৃতিক কৃষির নীতি অনুসরণ করে মাটির স্বাস্থ্য বিশেষত তাতে (মাটিতে) উদ্ভিজ্জ সার বা হিউমাসের বৃদ্ধি ঘটে যাতে সমস্ত রকম উদ্বেগের কারণ থেকে মুক্তি পাওয়া যায়।

ভাস্কর সাভে বলেন, “আমাদের উচিত মানুষের লালন কর্মের বাইরে থাকা জঙ্গলের কাছ থেকে অনুপ্রেরণা খুঁজে পাওয়া।” তবুও যদি আমাদের মনে হয় আমাদের পরিণত ফলস্তু গাছেদের সেবা করা উচিত, তাহলে গাছগুলির শৈশব অবস্থায় আমরা যতটা সার দিতাম তার ৫% থেকে ১০% পর্যন্ত দিতে পারি। উদ্যানবিজ্ঞানের (horticulture) এটি একটি কাণ্ডজ্ঞান-নির্ভর নীতি। “ছোটো গাছদের পরিচর্যা লাগে কম, তারা ফল

দেয় কম। পরিণত গাছদের পরিচর্যা লাগে কম, তারা বেশি ফল দেয়।” কিন্তু একথার মানে এই নয় যে সামগ্রিক ভাবে মাটির চাহিদা ও স্বাস্থ্য সম্পর্কে একজন চাষি উদাসীন থাকবে।

“দুর্ভাগ্যজনকভাবে অনেক চাষি বাড়ন্ত চারাদের যা লাগে তার বিপরীতটাই করে। তারা জোগান (input) (জৈব অথবা রাসায়নিক) ১২৫% থেকে ১৫০% পর্যন্ত বাড়িয়ে দেয় একথা ভেবে যে বড়ো গাছের চাহিদা বেশি এবং জোগান বেশি দিলে ফলনও বেশি হবে। এটি লোভের বশবর্তী হয়ে অবিবেচকের মতো অত্যাচার। অতিরিক্ত জোগান শুধুমাত্র অপচয়ই নয়, বরং অনেক সময় তা ক্ষতিকারকও বটে।



গাছপালাদের বড় করা শিশুদের প্রতিপালনের মতো।

শুরুতে তাদের যত্নের প্রয়োজন

কিন্তু শীঘ্রই তারা নিজেদের দেখভাল করে

আর তারপর, তারা আমাদের দেখভাল করে

কেজি কেজি আলমন্ডস, পেস্তা ইত্যাদি দামি সব বাদাম জোর করে খাইয়ে আপনি আশা করতে পারেন না যে কাউকে আপনি শক্তিশালী করে তুলতে পারবেন। অতিরিক্ত প্রোটিন শরীরকে বিষিয়ে দেয়। যতক্ষণ কিডনি সক্রিয় থাকে স্বাস্থ্যবান শরীর সেই বিষ শরীর থেকে বের করে দেয়। সেইরকমই একটা গাছে যদি জোর করে অতিরিক্ত পুষ্টি সরবরাহ করা হয়, সাধারণভাবে সে তা গ্রহণ করে না।

এটাও তাই মোটেই আশ্চর্য্য হওয়ার বিষয় নয়, চাষিরা যে তাদের ফসলে বিপুল পরিমাণ ইউরিয়া প্রয়োগ করে, তা ভূতলে বয়ে গিয়ে ঝরনা এবং নদীগুলিকে দূষিত করে নতুবা চুইয়ে মাটির তলে প্রবেশ করে ভূগর্ভস্থ জলাধারগুলিকে দূষিত করে তোলে। আবার এই ইউরিয়ার অনেকটা অংশ

বাষ্পীভূত হয়ে বাতাসে মিশে যায়।

হিউমাস ও রাসায়নিক জোগানের (input) খন্দ

গাছের মূলোরা খাদ্য হিসাবে হিউমাসকে খুবই পছন্দ করে। এটা একটা সহজ পরীক্ষার মধ্য দিয়ে পরিষ্কারভাবে বোঝা যায়। হিউমাসে ভরা একটি জার (jar) নিয়ে তার মুখটা খোলা রেখে জৈবভাবে সক্রিয় কোনো গোচারণভূমির ভূতলের চার ইঞ্চি নিচে বসান। ছয় সপ্তাহ পরে দেখা যাবে স্পঞ্জের মতো বাদামি বস্তুটি (যা আসলে হিউমাস) অদৃশ্য হয়ে গেছে এবং জারটি সাদা রোম সহ (hair) অসংখ্য মূলে জমাট হয়ে ভরে আছে। সমস্ত হিউমাস খেয়ে ফেলে — মাটির শেষ বিন্দুটি পর্যন্ত গ্রহণ করে — মূলোরা ভীষণ বিস্তৃতি পেয়েছে। অর্থাৎ সমস্ত হিউমাস উদ্ভিদ শরীরে রূপান্তরিত হয়েছে।

১৯৫০-৬০ দশকে যখন রাসায়নিক সারের প্রসার ঘটানো হচ্ছিল বিরাট ভাবে, তখন কৃষিবিজ্ঞানীরা রাসায়নিক সারের ব্যবহারের পক্ষে যুক্তি দিয়ে দাবি করেছিল যে তারা আসলে উদ্ভিদের প্রয়োজন অনুসারে অজৈব রূপে (organic form) পুষ্টি সরবরাহ করছে। এটা কিন্তু তাদের চোখ এড়িয়ে গেল (overlooked), প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ায় যে হিউমাস তৈরি হয় তাকে জৈব বস্তু থেকে অজৈব খনিজরূপে অনেক কার্যকর ভাবে পুনঃচক্রাকারে (recycled) ব্যবহার করা হয়। আমাদের সমৃদ্ধ বনভূমিতে ও ঐতিহ্যশালী মিশ্র খামারগুলিতে এটাই ঘটে থাকে যাতে করে বনভূমি বা মিশ্র খামারের উর্বরশক্তি হাজার হাজার বছর ধরে মোটেই কমে না।

ক্রান্তীয় (tropical) ও আধা-ক্রান্তীয় (sub-tropical) অঞ্চলগুলিতে জৈব বস্তুর পচন ও বিশ্লিষ্টকরণের (decomposition) হার ইউরোপ ও আমেরিকার বেশিরভাগ নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের থেকে অনেক বেশি, বিশেষত ক্রান্তীয় ভিজে অঞ্চলে (wet tropics) গরম, আর্দ্র পরিবেশে মাটির সংস্পর্শে আসা জৈব বর্জ্যকে ভেঙে ফেলার জন্য অনেক বেশিসংখ্যক ব্যাক্টেরিয়া সক্রিয় থাকে। তাই গাছেরা পৌনঃপুনিকভাবে প্রচুর পরিমাণ খনিজ পুষ্টি পেয়ে থাকে।

অবশ্য ক্রান্তীয় বর্ষা (tropical monsoon) মাটির উপরিভাগের (top-soil) কাছে নতুনভাবে চক্রাকারে (recycled) পুষ্টিগুলি জড়ো হয়।

মুশলধারে বৃষ্টি হলে এবং ঝোড়ো বাতাস বইলে সেগুলির দ্রুত ক্ষয় হয় অথবা তারা মাটির নিচে চুইয়ে প্রবেশ করে। এর ফলে মাটিকে রক্ষা করতে গাছ-গাছালি দিয়ে ঢেকে রাখা বাধ্যতামূলক এবং মাটির ওপর জৈববস্তু যেমন বর্জ্য পাতা, ফসলের অবশেষ, যেমন খড় ইত্যাদি দিয়ে তৈরি একটা

হিউমাস — স্বাস্থ্যের পরশপাথর

হিউমাস হল একটি ঘন, স্পঞ্জের মতো খুব ভালো শোষণকারী (absorbent) বস্তু যা স্বাস্থ্যকর মাটির উপরিতলে থাকে। এটি মূলত আংশিকভাবে জারিত (oxidised) বা উদ্ভিজ্জ ও প্রাণীজ অবশেষের অর্ধবিল্লিষ্ট (half-decomposed) অংশ। এর সাথে মিশে থাকে ছত্রাক (fungi) বা ব্যাক্টেরিয়া থেকে নির্গত বিভিন্ন ধরনের পদার্থ যেগুলি এই বর্জ্য বস্তুদের গঠনকারী উপাদানে ভেঙে ফেলে।

হিউমাস আবার আঠাল ‘সিমেন্টের’ জোগান দেয় যা মাটির ভিতরে ক্ষুদ্র ধাতুকণাগুলিকে যুক্ত করে বৃহত্তর কণায় পরিণত করে এবং তা করতে গিয়ে মাটির কণাগুলির ভিতরে ছিদ্রগুলির ব্যবধান বজায় রাখে এবং মাটির ক্ষয় আটকায়। অনুরূপভাবে বর্জ্য পাতার, মৃত উদ্ভিদ ও প্রাণীদের অর্ধবিল্লিষ্ট (semi decomposed) অবশেষ — যা তার আদি তন্তুজ গঠনের কিছুটা বজায় রাখে — মাটির সুস্ফূর্তত ধাতুকণাগুলিকে জল আকারে রক্ষা করে এবং ভূমিক্ষয় রোধ করে।

হিউমাস বৃষ্টির জল সহ বিল্লিষ্ট বস্তু (decomposed matter) থেকে পাওয়া দ্রবীভূত খনিজ ধরে রাখে যা থেকে গাছ তার পুষ্টি সংগ্রহ করে। এছাড়া শীতল হিউমাস বাতাসের বাষ্প থেকে সরাসরি আর্দ্রতা শুষে নিতে পারে এবং তা করতে গিয়ে এমনকী বৃষ্টির অনুপস্থিতিতেও মাটির আর্দ্রতা বা ভেজা ভাব বজায় রাখে। প্রতি ২৪ ঘন্টায় এইভাবে প্রতি বর্গ ফুট জমি ২৫০ থেকে ৫০০ মিলি বাতাসের ভাসমান জলকণাকে শুষে নিতে পারে, বিশেষ করে যেখানে মাটির হিউমাস বর্জ্য পাতা ও খড়ের আচ্ছাদনের দ্বারা সুরক্ষিত থাকে।

যেহেতু প্রকৃতিতে জৈববস্তু বিল্লিষ্ট হয়ে খনিজ রূপে পরিবর্তিত হওয়ার প্রক্রিয়া চলতেই থাকে, ভূতলের পুষ্টি জোগানও অব্যাহত থাকে, আর তাই হিউমাস দ্রুতগত পুনরুৎপাদিত হতে থাকে।

প্রকৃতির জীবনচক্রে ভাঙন ও পুনঃবৃদ্ধির (regrowth) মধ্যে সুন্দর এক ভারসাম্য থাকে। কিন্তু কৃষি রাসায়নিকের ব্যবহারে শুধু ক্ষয়ের প্রক্রিয়াটি ত্বরান্বিত হয়, যদি না জরুরি ভিত্তিতে তাকে থামানো যায়, তা প্রাকৃতিক পুনঃসৃষ্টির (regeneration) শেষের শুরুকে চিহ্নিত করে।

নাইট্রোজেন জাতীয় সার — যার শুরু পাশ্চাত্যের অস্ত্র শিল্পে — হিউমাসের ওপর এক দানবীয় আক্রমণ। এটি মাটির জৈব পদার্থের জারণ প্রক্রিয়াকে দ্রুততর করে। এতে জল শোষণকারী মাটির ভারী কণাগুলি ধ্বংস হয়ে ক্ষুদ্র ধূলিকণায় পরিণত হয় এবং বাতাস ও বৃষ্টির দ্বারা উড়ে যায়। ফলে মাটির বাতাস ও জলধারণ ক্ষমতা হারিয়ে যায়।

কেঁচো, পিঁপড়ে, উই ও অন্যান্য জীব —যারা মাটি খোঁড়ে — তারা কৃষি রাসায়নিকদের বিষাক্ত প্রভাব ও অক্সিজেনের অভাবে মারা যায়। এই সমস্যা আরও বেশি বেড়ে যায় গভীর কর্ষণ ও অতিরিক্ত সেচের জন্য। এইভাবে চাষি নির্ভরশীলতার এক পাশ্চাত্য জড়িয়ে পড়ে যাতে তাকে আরও বেশি বেশি জোগান (input) ও অতিরিক্ত শক্তির (energy) খরচের জোগান দিতে হয়।

অবশ্য যদি চাষি হিউমাস তৈরির প্রক্রিয়াকে সাহায্য করে তাহলে ফসলের ওপর তার গভীর প্রভাব পড়ে। অ্যালবার্ট হাওয়ার্ড বলেন, “উর্বর মাটি ও সমৃদ্ধ কৃষির চাবিকাঠি হল হিউমাস। পাতারা স্বাস্থ্যে বলমূল করে, ফুলেদের রঙ হয় গভীর, মূলের বৃদ্ধি ঘটে বিপুলভাবে। মান, স্বাদ ও ধারণ শক্তিতে শাক-সবজি ও ফলেরা হয় উৎকৃষ্ট। পরিমাণে কম খাবার খেলেই পুষ্টি পাওয়া যায় ... পোকামাকড় ও ছত্রাক জনিত রোগের বিরুদ্ধে প্রতিরোধী ব্যবস্থাও হয় মজবুত।

হিউমাসের কার্পেট বা গালিচা দিয়ে মাটিকে বেঁধে রাখতে হয়।

বিপরীতে, কৃষি-রাসায়নিকদের দ্বারা সৃষ্ট সমস্যা হল কম ভয়ংকর এবং ইউরোপ ও আমেরিকার নাতিশীতোষ্ণ পরিস্থিতিতে সেগুলি ধীরে ধীরে প্রকাশ পায়। সেখানে মাটিতে শুধু বিল্লিষ্টকারী (decomposing) ব্যাক্টেরিয়া কম থাকে তাই নয়, শীতে তুষারপাতের ফলে নিচের জৈব বস্তুদের অজৈব ধাতুতে ভেঙে যাওয়া আটকিয়ে তা সংরক্ষণ করতে সাহায্য করে। একারণেই নাতিশীতোষ্ণ দেশে মাটির জৈব বস্তুর গুণমানের অবস্থান (status) যথেষ্ট উন্নত। কার্বনজাত দ্রব্যের একটা অতিরিক্ত কুশান বা ঢাকা থাকার ফলে

মাটি অধিক পরিমাণে কৃত্রিম নাইট্রোজেন শুষতে পারে।

সেখানে রাসায়নিক জোগান (input) নাতিশীতোষ্ণ ভূমিতে জৈব বস্তুকে গঠনকারী উপাদানগুলিতে ভেঙে ফেলার কাজকে দ্রুততর করলেও ত্রাস্তীয় ও আধা-ত্রাস্তীয় অঞ্চলের মতো মাটি থেকে জৈব বস্তুদের ক্ষয় সাধন করে না। কারণ সেখানে স্বাভাবিকভাবেই এই বিস্ত্রিকরণের হার ইতিমধ্যেই বেশি, আবার সেখানে ভারতের মতো ভারী বর্ষণও হয় না। ফলে নাতিশীতোষ্ণ দেশগুলিতে রাসায়নিক সারের ব্যবহারে মাটির ক্ষয় ও দূষণ উভয়ই তুলনামূলকভাবে কম।

এমনকী নাতিশীতোষ্ণ দেশগুলিতেও কৃষকদের ঈশিয়ারি দিয়ে সুপারিশ করা হয়েছিল যাতে তারা রাসায়নিক সারের সাথে যথেষ্ট পরিমাণে জৈব সারেরও ব্যবহার করে। আবার চাষিদের এটাও শেখানো হয়েছিল যাতে তারা সূক্ষ্মভাবে জোগানগুলির (inputs) মাত্রা ও অনুপাত বজায় রেখে চাষের খেতে প্রয়োগ করতে পারে। এতদসত্ত্বেও এটা লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে পাশ্চাত্য দেশগুলিও রাসায়নিক পদ্ধতি থেকে উল্লেখযোগ্যভাবে ঘুরে দাড়াচ্ছে। সেখানে কয়েক দশক আগে, কেউ যা স্বপ্নে ভাবতে পারত না, তার চেয়েও দ্রুতগতিতে জৈব চাষের আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ছে।

দুর্ভাগ্যজনকভাবে মনে হচ্ছে, ভারতের কৃষি পরিচালনের সংস্থাগুলি মাটির সম্পূর্ণ ধ্বংসের লক্ষ্যে ঝুঁকে পড়ে নতুনতর গতিতে এগিয়ে চলেছে। এটা চলতেই থাকবে যতক্ষণ না আমাদের সুস্থ বোধ ফিরে আসবে। বর্তমানে উত্তরোত্তর বেশি পরিমাণে রাসায়নিক ব্যবহারের লাগাম টেনে ধরার কোনো ইঙ্গিতই দেখা যাচ্ছে না। বরং ভারতের পূর্বাঞ্চলে যেখানে রাসায়নিকের ব্যবহার জাতীয় গড়ের চেয়ে অনেকটাই কম, সেখানে সবুজ বিপ্লব ছড়িয়ে দেবার কথাবার্তা চলছে।

প্রকৃতিতে ফেরা

অবশ্য এখনও সব কিছু শেষ হয়ে যায়নি, কারণ নিজেকে সুস্থ করে তোলা এবং আমাদের দেখভাল করার এক বিরাট ক্ষমতা রয়েছে প্রকৃতির। ভাস্কর সাভে বলেন, “যা মাটি থেকে এসেছে তা মাটিকে ফেরত দেওয়া হল আমাদের ধর্ম বা কর্তব্য। উদ্ভিদের ধর্ম বা জীবনের উদ্দেশ্য হল বেড়ে ওঠা ও ফল দেওয়া।”

“বীজ বপন করার পর তা অঙ্কুরিত হয় প্রাকৃতিকভাবে। মাটিতে তার মূলের বৃদ্ধি ও ঘটে প্রাকৃতিকভাবে। তেমনি পাতা, ফুল ও ফলের আবির্ভাব — এসবও প্রাকৃতিক ব্যাপার। যখন ফল পরিণত হয়, আমাদের কাজ

শুধুমাত্র তা তোলা। ফলে এখানে সমস্যাটাই বা কোথায়?”



২০৫০ সাল পর্যন্ত তেল থাকতে পারে।

আমাদের মাটি থাকবে না

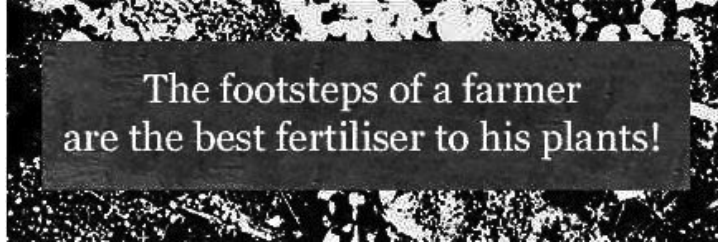
বাস্তবিকই যতদিন কৃষিকাজকে ধর্মজ্ঞান করা হত — মনে করা হত এটি জীবনধারণের জন্য প্রয়োজন মেটানোর উপায় — ততদিন কৃষিকে কেন্দ্র করে কোনো সমস্যা ছিল না। একজন চাষি জানত প্রকৃতির ক্ষেত্র (domain) কোনটি এবং মাটির থেকে তুলে খেতে হলে তার কী করা উচিত আর কী করা উচিত নয়, সে ভালোভাবেই জানত।

প্রাকৃতিক উপায়ে কৃষিকাজ এই বিষয়টি সম্পর্কে সচেতন যে এক রহস্যময় অব্যর্থ বুদ্ধি (a mysterious unfailing intelligence) সমস্ত প্রাকৃতিক প্রক্রিয়াগুলিকে পরিচালনা করে। এর এক সোনালি নিয়ম হল “অপ্রয়োজনীয় হস্তক্ষেপ এড়িয়ে চল”। কিন্তু যেখানে লোভের আধিপত্য, সেখানে প্রকৃতির প্রাজ্ঞতায় বিশ্বাস রাখা কঠিন। এ কারণেই ভাস্করভাই বলেন যে প্রাকৃতিক কৃষি ও আত্মিক স্বাস্থ্য বিবর্তনের একীভূত প্রক্রিয়ায় হিংসাকে পরিহার করে হাত ধরাধরি করে চলে।

ভাস্করভাই বলেন, “যখন বীজ অঙ্কুরিত হয় তখন দুর্জয়ভাবে (miraculously) অসংখ্য জীবাণুর আবির্ভাব ঘটে। নবান্ধুরের চারপাশের মাটি — যদি আগে আচ্ছন্ন অবস্থায় থাকত তা আবার সজীব হয়ে ওঠে। প্রথম পাপড়ির মতো যে পাতারা আবির্ভূত হয়, তাদের দেখে মনে হয় তারা যেন ক্ষুদ্র হাতগুলি প্রার্থনার ভঙ্গিতে জড়ো করে মিনতি করে বলছে, “আমাদের ফুটে উঠতে দাও।” এই কারণেই বীজ বপনের পর কোনো রকম কর্ষণ বা মাটিকে আঘাত করা প্রাকৃতিক চাষে নিষিদ্ধ। এর ফলে শুধু মাটির জীবাণুরাই নয়, মূলতন্তুগুলিও রক্ষা পায়।

কিছু না করা? (do nothing?)

যদিও প্রাকৃতিক খামারে কায়িক শ্রম লাগে আধুনিক খামারের চেয়ে অনেক কম, কিন্তু সেখানে দৈনন্দিন সমান দৃষ্টি দেওয়া বাধ্যতামূলক, তাই বলা হয়, “চাষির পদক্ষেপগুলিই তার গাছদের জন্য সেরা সার।” বৃক্ষের (tree) ক্ষেত্রে প্রথম কয়েক বছর ধরে এটি বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। ধীরে ধীরে তারা যত আত্মনির্ভরশীল হয়ে ওঠে, চাষির কাজও তত কমে আসে। শেষে ফসল তোলা ছাড়া তার আর কিছুই করার দরকার পড়ে না।



একটি কৃষকের পদক্ষেপগুলি হল
তার গাছপালার শ্রেষ্ঠ সার।

মাঠ-ফসল যেমন ধান, গম, বিবিধ ডাল ও শাক-সবজি বৃদ্ধির জন্য বছরের পর বছর ধরে তাদের নিজ নিজ মরশুমে কিছু নজর না দিলেই নয়। এ একারণেই ভাস্কর সাভে তার মাঠ-ফসল বৃদ্ধির পদ্ধতিকে নাম দিয়েছেন জৈব চাষ। আর পরিণত গাছ-ফসলের ক্ষেত্রে ‘কিছু না করা’ প্রাকৃতিক কৃষির (do nothing natural farming) বিশুদ্ধ রূপই তিনি অনুসরণ করেন। অবশ্য মাঠ-ফসলের ক্ষেত্রেও প্রকৃতির প্রাজ্ঞতার শ্রেষ্ঠত্বকে সম্মান জানিয়ে কৃষকের হস্তক্ষেপকে ন্যূনতম রাখাই বাঞ্ছনীয় যাতে হিংসার প্রকাশও হয় ন্যূনতম।

কৃষির পাঁচটি ভাবনা

পৃথিবী জুড়ে কৃষিকে কেন্দ্র করে সমস্ত কর্মকাণ্ডের পাঁচটি প্রধান ক্ষেত্র রয়েছে। সেগুলি হল ১। কর্ষণ ২। উর্বরতা বৃদ্ধির জন্য জোগান (input), ৩। আগাছা পরিষ্কার করা, ৪। সেচ এবং ৫। ফসলের সুরক্ষা। ভাস্কর সাভে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী ও অভিজ্ঞতা অনুযায়ী কৃষি অনুশীলনের এই পাঁচটি প্রধান দিক নিয়ে সংক্ষিপ্তসার করেন এইভাবে :

১। কর্ষণ

গাছ-ফসলের ক্ষেত্রে কর্ষণ একবারই অনুমোদনযোগ্য। চারাগাছ পোঁতা বা বীজ বপনের আগে মাটি আলগা করার জন্য কর্ষণ করা হয়। চারা রোপণের পর মাটির ভেদ্যতা (Porosity) বা ঝুরঝুরু ভাব এবং মাটিতে বায়ু চলাচলের (aeration) দেখভালের কাজগুলি সম্পূর্ণ ছেড়ে দেওয়া হয় মাটির জীব ও মাটিতে গাছের মূলগুলির ওপর।

২। উর্বরতার জন্য জোগান (fertility inputs)

নিরবচ্ছিন্ন উর্বরতার জন্য ফসলের অবশেষ ও জীব-ভর (bio-mass) খামারের মাটিতে মিশিয়ে দেওয়া এক অতি আবশ্যিক কর্ম। যে খামারে জীব-ভরের অভাব, সেখানে প্রাথমিকভাবে জৈব প্রদেয় জোগান দেওয়া ভালো। অবশ্য কোনো রকম রাসায়নিক সার ব্যবহার করা উচিত নয়।

আগাছা নাশ করা (weeding)

আগাছা নাশ করা ব্যাপারটিকে এড়িয়ে যেতে হবে। যদি আগাছারা বৃদ্ধিতে ফসলকে ছাপিয়ে যায় এবং তা ফসলের উদ্ভিদের ওপর সূর্যালোককে ঢেকে রাখে তাহলেও তাদের উপড়ে ফেলা উচিত নয়। তাদের ওপর থেকে ছেঁটে ফেলে সেই ছেঁটে ফেলা বর্জ্য দিয়ে মাটিকে ঢেকে দিতে হবে। কিন্তু কোনো রকম গুল্মনাশক (Herbicides) ব্যবহার করা উচিত নয়।

সেচ

সেচ হওয়া উচিত সংরক্ষণশীল। মাটিতে একটা ভেজাভাব (dampness) বজায় রাখার জন্য যতটুকু জলের প্রয়োজন ততটুকুই দিতে হবে। মাটি যদি গাছ-পাতায় সম্পূর্ণ ঢেকে রাখা যায়, বিশেষত বহু-স্তরের (multi-storied) গাছপালায় এবং মাটির ওপরে যদি ঘাস-পাতার ঘন আস্তরণ (mulching) রাখা যায়, তাহলে জলের প্রয়োজন অনেকাংশে কমিয়ে আনা সম্ভব।

ফসলের সুরক্ষা

প্রকৃতির বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় প্রাকৃতিক ভাবে সৃষ্ট খাদক (predators) প্রজাতির দ্বারা জৈব নিয়ন্ত্রণের ওপর ফসলের সুরক্ষা সম্পূর্ণভাবে ছেড়ে দেওয়া যেতে পারে। স্বাস্থ্যবান মাটিতে স্বাস্থ্যকর জৈব পদ্ধতিতে নানাবিধ ফসলের চাষ (Poly-cultures) করলে তা মারীপোকা আক্রমণকে সফলভাবে বাধা দিতে পারে। এক্ষেত্রে ক্ষয়ক্ষতিও হয় ন্যূনতম এবং ক্ষতি আপনা-

আপনিই বন্ধ হয়ে যায়। বড়ো জোর কিছু অরাসায়নিক ব্যবস্থা যেমন নিম, দেশি গরুর চোনা লঘু করে ব্যবহার করা যেতে পারে। কিন্তু এটাও শেষ বিচারে অপ্রয়োজনীয়। ('পতঙ্গ, মারীপোকা নয়', এই অধ্যায়টি দেখুন)

এইভাবে প্রকৃতিতে ফিরে — আদিত্যে যে কাজগুলি ছিল প্রকৃতির — সেগুলি তাকে সমর্পণ করলে ভগ্নপ্রায়, আধুনিক চাষি তার পিঠের বিশাল ভার থেকে মুক্ত হয়। আর শুরু হয় মাটির পুনরুজ্জীবনের কাজ।

স্থানিক পরিবেশ-পরিস্থিতির সাথে খাপ খাওয়ানো

ভাস্করভাই তাঁর খামারের ভ্রমণার্থী চাষিদের সতর্ক করে বলেন যে তারা যেন তাঁকে অন্ধের মতো অনুসরণ না করে। তিনি বলেন, “আমার ভুল হতে পারে ... অথবা আমি যা করছি তা আমার পরিস্থিতিতে সঠিক হতে পারে। কিন্তু আপনার পরিস্থিতিতে তা নাও হতে পারে। ... অনুকরণ করার বদলে আপনি বরং উদ্ভিদের চাহিদাগুলির পিছনে কোন বুনীয়াদি নীতিসমূহ রয়েছে এবং প্রকৃতি কীভাবে কাজ করে সেগুলি বুঝতে চেষ্টা করুন এবং এই বোধের সাথে আপনার অভিজ্ঞতাকে মেলান। যতক্ষণ না আপনি নিজের নিরীক্ষণ ও বুদ্ধিমত্তাকে ব্যবহার করছেন সেগুলি থেকে আপনি শিখতে পারবেন না এবং ভুল করতেই থাকবেন। কিন্তু প্রাকৃতিক প্রক্রিয়াগুলিতে হস্তক্ষেপ (interfere) করার আগে আপনি যদি দশবার ভাবেন তাহলে আপনি সুরক্ষিত আছেন এটা মনে করা যুক্তিসঙ্গত হবে। বিশেষ পরিবেশ পরিস্থিতিতে কী করতে হবে এবং কী করতে হবে না — এই বোধ আপনার আসবে ধীরে ধীরে নিজস্ব অভিজ্ঞতা থেকে।”

আধুনিক চাষের বৈশিষ্ট্য হল, এই চাষে কিছু বাঁধা ধরা ফরমুলা অনুসরণ করা হয়। সেখানে প্রাকৃতিক চাষে কিন্তু প্রত্যক্ষ নিরীক্ষণের (observation) কোনো বিকল্প নেই। চাষিকে তার জমি ও আবহাওয়ার সাথে বাধ্যতামূলক ভাবে খাপ খাইয়ে নিতে হয়। আসলে আমাদের সংকীর্ণ মানসিক-খাঁচাকে আমরা প্রকৃতির ওপর জোর করে চাপাতে গিয়েই দুঃসহ অবস্থাকে ডেকে আনি। এমনকী প্রাকৃতিক কৃষির বুনীয়াদি নীতি অনুসরণকারী তথাকথিত বিশেষজ্ঞদের স্থানিক পরিবেশ-পরিস্থিতি এবং উদ্ভিদের বৈচিত্র্য সম্বন্ধে অভিজ্ঞতার প্রয়োজন।

উদাহরণ স্বরূপ সাভে বলেন, একই রকমের মাঠ-ফসল, যেমন ধান বা গম ফলানো যেতে পারে। কিন্তু একজন চাষিকে তার নিজের জায়গা থেকে ৩০০ কিমি দূরে পাঠান, সেখানে গ্রীষ্ম, বর্ষা ও শীত — আমাদের এই তিনটি প্রধান ঋতুতে প্রকৃতিতে পরিবেশ-পরিস্থিতি কেমন থাকে তা বুঝতে

তার একবছর লেগে যাবে। অঞ্চলের খাপ খাওয়া প্রজাতিগুলি ও তাদের বৈচিত্র্য বুঝতে অঞ্চলের চাষিদের কাছ থেকে তার বুদ্ধি-পরামর্শ নেওয়ার প্রয়োজন হবে।

সমগ্র ভারত জুড়ে এবং প্রতিটি রাজ্যেই রয়েছে জমির বিপুল বৈচিত্র্য। শুধুমাত্র স্থান-বৃত্তান্তই যথেষ্ট বৈচিত্র্যময়। ধাপহীন (un-terraced) জমির ঢাল যেখানে ৩০ ডিগ্রির বেশি — সেখানে, বিশেষত, ভূমিক্ষয় রোধে ও মাটিতে সর্বোচ্চ জল শোষণের জন্য বৃক্ষই সবচেয়ে উপযোগী। মৃদুভাবে আন্দোলিত জমিতে স্থানীয় জোয়ার (local millet), বিভিন্ন ধরনের ডাল, শাক-সবজি, কন্দ ও তিল ইত্যাদির চাষ করা যেতে পারে। বর্ষায় জল জমে থাকে এমন নাবাল জমিতে শুধুমাত্র ধান ছাড়া কার্যত আর কিছু চাষ করা যায় না।

স্থানিক জলবায়ু, ক্ষুদ্র পরিসরে আবহাওয়ার অবস্থা (micro-climatic conditions) মাটির জীব ও অণুজীব ইত্যাদি ছাড়াও মাটির প্রকৃতি, জলধারণ ক্ষমতা, নিকাশি ইত্যাদি ব্যাপারেও এদেশে মাটির বিপুল বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায়। অনুরূপভাবে এদেশে প্রাকৃতিক বৃক্ষাদি ও গাছপালার বিপুল বৈচিত্র্য দেখা যায়। এ সমস্ত কিছু পর্যালোচনা করেই একটি অঞ্চলে কোন কোন ফসল ও দেশজ কোন প্রজাতিগুলি উপযোগী হবে এবং ভালোভাবে বেড়ে উঠতে পারে তা নির্ধারণ করতে হবে।

কল্পবৃক্ষে একটি সাইনে (sign) লেখা এক সূত্র বলছে, “কবিতা রচনা বা ফুলের মালা গাঁথার মতোই প্রাকৃতিক কৃষি হল এক কোমল, সুন্দর ও সংবেদনশীল কাজ।”

টীকা এবং উল্লেখিত গ্রন্থাদি

- ১। Secrets of the Soil by Peter Tomkin and Christopher Bird, Perennial Library, HARper and Raw, 1990, pg. 4. এই বইটির লেখকরা আরো হিসাব করেছেন যে সমস্ত অণুজীবগুলির শরীরের ওজনের যোগফল হল মানুষ সহ সমগ্র প্রাণীদের শরীরের ওজনের ২৫ গুণ।
- ২। An Agricultural Testament by Sir Albert Howard, (first Published in London, in 1940,) Indian Edition, Earthcare Books, 2006, pg.116. “মাটির বিভিন্ন জীবসহ সক্রিয় মূলদের অক্সিজেনের নিরবিচ্ছিন্ন যোগানের প্রয়োজন, ১৩৯ পৃষ্ঠায় হাওয়ার্ড আরো বলেছেন, “বর্ষার শুরুতে ও শেষে যখন মাটিতে ভূতলের মাটিতে প্রচুর পরিমাণ বাতাস ও আর্দ্রতা থাকে, তখন মূলের বৃদ্ধি হয় সর্বোচ্চ। ভারী বর্ষণের সময় মাটিতে এ বায়ু চলাচল ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তখন গাছের মূলেরা মাটির গভীরে না গিয়ে মাটির উপরিতলে শুরফাচে বাড়তে থাকে বেপোরোয়াভাবে অক্সিজেনের সন্ধানে।
- ৩। অধ্যাপক দাভোলকার বিষয়টিকে আরেক রকমভাবে বুঝিয়েছেন। একটি উদ্ভিদকে মাটি থেকে উপড়ে ফেলুন। তার মূলে যতটা মাটি লেগে আছে তা ধুয়ে ফেলুন, এবার উদ্ভিদটিকে খুব ভালভাবে শুকান, আর তারপর একটি ধাতু পাত্রে সম্পূর্ণ পুড়িয়ে ফেলুন। পাত্রে যতটা ছাই পড়ে রইল সেই ওজনই উদ্ভিদটি মাটি থেকে সংগ্রহ করেছে, বায়ু বা জল থেকে নয়। তিনি আরো বলেন একটি কিচেন গার্ডেনে ১০০ বর্গফুট অঞ্চল জুড়ে যতটা উদ্ভিদ থাকে তাদের থেকে এইভাবে দুই বা তিন মুঠো ছাই পাওয়া যাবে — সেটা হল মাটি থেকে আহরণ করা সমস্ত খনিজের সমান। (Ref. 'City Farming, S.A. Dabholkar Dr. Joshi City Farming Institute', 1994, pg.5)
- ৪। The Web of Life by John Storer, 1953, Mentor, pg.32.
- ৫। পূর্বে উল্লেখিত, পৃষ্ঠা – ৩২।
- ৬। An Agricultural Testament (at) pg.23- তে স্যার অ্যালবার্ট হাওয়ার্ড লিখছেন যে উদ্ভিদের ভাল বৃদ্ধির প্রাথমিক শর্তটি হল ভূতলের ভিতর দিকে (Internal Surface) –মাটির কণাগুলির মধ্যবর্তী ছিদ্রগুলি (The pore Space) যতবড় হয় তত ভাল। এই ছিদ্রগুলির দেওয়ালগুলিতে জলের সুক্ষ্ম ফিল্ম গুলিতে ঘেরা থেকে, মাটির ব্যাকটেরিয়া, ফানজী, ও অণুজীবদের গুরুত্বপূর্ণ কর্মকান্ড গুলি ঘটে, এই সমস্ত কর্মকান্ড শ্বসনের ওপর

নির্ভর করে, যার জন্য যথেষ্ট পরিমাণ অক্সিজেনের যোগান অত্যন্ত জরুরী। তাই মাটিতে যাতে অক্সিজেন চলাচল করতে পারে এটা দেখা বাধ্যতামূলক।

৭। (The web of life by John H. Storer, 1953, Mentor, pg. 32 চ। মূলের আঁশের মত রোমগুলি অল্প নিঃসরণ করে, যা পাথরের গায়ে খনিজগুলিকে দ্রবীভূত করে। এই খনিজকে দ্রবীভূত করার প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়েই রোমেরা পাথর খেয়ে খেয়ে পাথরের ভিতর দিয়ে বাতাস, আর্দ্রতা ও মাটির পথিকৃৎ জীবগুলির প্রবেশের পথ করে দেয় এবং এরই ফলে পাথরের ক্ষয় (Weathering) চলতেই থাকে। তাপমাত্রা বদলের ফলে পাথরে চিড় দেখা যায় এবং বিভিন্ন ঋতুতে পাথরের বৃদ্ধি ও সংকোচন ও দেখা যায়। তাছাড়া বৃষ্টি পড়বার সময় তারা বাতাস থেকে কার্বন ডাই-অক্সাইড শোষণ করে কার্বনিক অ্যাসিডে রূপান্তরিত হয়। কার্বনিক ও অন্যান্য অ্যাসিড ও সৃষ্টি হয় মাটিতে জৈব বস্তু পচনের ফলে। বহুবছর ধরে এই অ্যাসিডরা ধীরে ধীরে পাথরের তল থেকে আরো বেশি মাত্রায় খনিজকে দ্রবীভূত করে, এই প্রক্রিয়ায় পাথরের নীচের স্তরে অনেক গর্ত (Crevices) সৃষ্টি হয় যেখানে জল জমতে পারে। যে আর্দ্রতা দ্বারা পাথরের নীচের স্তরের লবণ দ্রবীভূত হয় তারা গাছের মূল ব্যবস্থার (root system) উপরিতলে উঠে আসে, যেখানে এই মূল ব্যবস্থা বিশাল সব পাম্পের মত কাজ করে।

৯। বিভিন্ন মাটির বিভিন্ন জলধারণ ক্ষমতা নিম্নলিখিত পরীক্ষার দ্বারা বোঝা যায়।

এক কেজি করে বিভিন্ন ধরনের (শুকনো) মাটির নমুনা সংগ্রহ করুন। প্রতিটি মাটির নমুনাকে একটি কাপড়ে ভালভাবে মুড়ুন। এরপর এই কাপড় মোড়া মাটি জলে ভিজিয়ে রাখুন —প্রতিটিই পনের মিনিটের জন্য। এবার প্রতিটি নমুনা থেকে কাপড় সরিয়ে তাদের আলাদা আলাদা করে মাপুন, যাতে করে প্রতিটি মাটির নমুনা কতটা করে জল শুষেছে তা বোঝা যায়। কয়েক ঘন্টা পর প্রত্যেকটিকে আবার মাপুন। এবার মাটি কতটা জল ধরে রেখেছে তা আপনি ওজন থেকে বুঝতে পারবেন। দেখা যাবে যে জৈব, ভেদ্য মাটি রাসায়নিক সেবিত মাটির থেকে অনেক বেশি জল শুষেছে এবং ধরে রেখেছে।

এই পরীক্ষার এক সামান্য বদলানো রূপেও দেখা যাবে যে সমস্ত জৈব (জীবিত) মাটিতে জল নিকাশও হয় খুব দ্রুত —উপরিতলে জমে থাকা জল ত্রুমাগত নীচে চুইয়ে পড়ে অতিরিক্ত জল বের করে দেয়। তারা আবহমন্ডলীর সাথে সরাসরি সম্পর্ক স্থাপন করে বেশি হাওয়ার

যোগানের ব্যবস্থা পুনরায় ফিরিয়ে আনে। রাসায়নিক মাটিতে জল শোষণের কম ক্ষমতার সাথে সাথে জলনিকাশের ক্ষমতাও খুব কম। ভারী মাটি যেমন কাদা ও পলি ক্ষুদ্র কণাসহ আটসাঁট ভাবে জড়িয়ে থাকে —সেই মাটির জল ধারণ ক্ষমতা খুব বেশি। কিন্তু যেহেতু এই জাতীয় মাটির নিকাশী ক্ষমতা খুবই কম, এই মাটি বায়ুর অভাবে ভোগে। ক্ষেলের আরেকটি দিকের শেষে —মোটা আলগা দানার মাটিতে জল নিকাশ হয় অত্যন্ত ভাল এবং তা শুকায় ও খুব তাড়াতাড়ি, কিন্তু বাতাসের অভাবের সমস্যা এই ধরনের মাটিতে বিরল।

বাস্তবত সমস্যাটির দু’টি চূড়ান্ত দিক হল জল জমে থাকা অথবা খুব বেশি মাত্রায় জল বেড়িয়ে যাওয়া —এই দুটি ত্রুটিই শুধরানো যায় মাটি বেশি পরিমাণে জৈব বস্তুর যোগান দিয়ে। কারণ মৃত গাছ-পাতাদের একটা দারুণ ক্ষমতা হল তারা আলগা গঠনের বালি মাটিকে বেঁধে রাখতে পারে। তারা আবার কাদা ও পলির মত ঘন মাটিকে ভেঙে ফেলতে পারে এবং এই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে তারা বেশ সুক্ষ্ম দানার দোঁয়াশ মাটি তৈরি করে যার রয়েছে দুটি সুবিধা : ১। ভাল জল ধারণ ক্ষমতা, ২। ভাল জল নিকাশী ক্ষমতা।

১০। এটি তাৎপর্যপূর্ণ যে গাছের মূলেদের শ্বসন ক্রিয়া কখন বৃষ্টির দ্বারা বিঘ্নিত হয় না। কিন্তু আপনি বৃষ্টি সমপরিমাণ জল কোনো গভীর বোর ওয়েল থেকে দিন, দেখবেন গাছের মূলের শ্বসনের ক্ষতি হবে। কারণ গভীর বোর ওয়েলের জলে দ্রবীভূত অক্সিজেনের মাত্রা কম। কিন্তু বৃষ্টি হল অক্সিজেন সংস্পৃক্ত দ্রবন।

১১। (Turning up the Heat by Fred Pierce, Paladin, 1989, pg.5)

১২। ‘The Viloence of Green Revolution’, by Vandana Shiva, 1989, pg. 88, Third World Network.

১৩। পূর্বে উল্লেখিত পৃষ্ঠা ৫৪, PAO স্ট্যাটিসটিকস্ উদ্ধৃতি করা হয়েছে,

১৪। বিল মলিশন লিখেছেন যে বেশির ভাগ গাছেদের ক্ষেত্রে মূল ব্যবস্থার (root system) ৮০-৯০% থাকে মাটির ওপরের দিকে ৬০ সেনিমির মধ্যে। এটি হাজার হাজার কিলোমিটার বিস্তৃত মূলরোম দিয়ে তৈরি যা ভূতলের কাছাকাছি একটা মাদুরের মত ছড়িয়ে থাকে। মাত্র ১০-১২% মূলভর এর নীচে থাকে (দু ফুটের নীচে)। কিন্তু কিছু কিছু মূল পাথর ভেদ করে ৪০ মিটার গভীরে প্রবেশ করতে পারে। (‘Permaculture : A designor's MAnual’ by Bill Mallison, Tagari, 1988, pg. 150.)

১৫। Personal correspondence from Shri Mahendra Bhall, an organic farming acitivist since several decades

১৬। সাধারণত অপরাহ্নে বা সন্ধ্যায় সেচ দেওয়া ভাল। এতে বাষ্পীভবন কম হয় এবং গাছের মূলের আঘাত বা শক কম হয়। তাছাড়া কম বয়সী কোন গাছের পরিণত গাছের তুলনায় একটু বেশি বা বার বার জল দিতে হয়। গাছ বড় হওয়ার সাথে সাথে তার মাথার ওপর পাতার ছাতা বিকশিত হলে মাটি হয় ছায়াময়, বাষ্পীভবনও কম হয় ফলে, সেচের প্রয়োজনও কমে আসে। অভিজ্ঞ চাষিরা যাদের দেখার চোখ তৈরি হয়েছে তারা দেখতে পান ‘জানান দিচ্ছে’ তাদের আছে কিনা।

১৭। উপকূল অঞ্চলে গাছেদের ওপর ঘনীভবন (condensation) (এবং মাটির হিউমাস দ্বারা বায়ুমণ্ডলের আর্দ্রতার সরাসরি শোষণ) বিভিন্ন রূপে মাটিতে যে জল নেমে আসে সেই অধক্ষেপের (Precipitation) সমগ্র পরিমাণের প্রায় ৮০-৮৫% পর্যন্ত হতে পারে, একথা লিখেছেন বিল মলিসন, op at pg. 144

১৮। বর্জ্য পাতারা মাটিকে ঢেকে রেখে তীব্র রোদ ও বৃষ্টির বাড়ির হাত থেকে রক্ষা করে, বর্ষা জোরদার হয়ার আগেই নতুন গাছ-পাতারা সজীব ও সবুজ হয়ে ছড়িয়ে পড়ে যা বৃষ্টির হাতুড়ির বাড়ির থেকে মাটিকে আরো বেশি সুরক্ষা দেয়। তা না হলে বৃষ্টির আঘাতে প্রচুর উপরিতলের মাটি নষ্ট হতে পারত বিশেষত ঢালু অঞ্চলে।

১৯। যদি ফসলে সমস্ত অবশেষ ও আবর্জনা ধর্মীয় নিষ্ঠায় মাটিতে ফেরৎ দেওয়া হয়, তাহলে দিনে দিনে মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি পাবে। যেহেতু পরিণত গাছের মূলের মাটির নীচের স্তর থেকে (Sub-soil) এবং নীচে পাথর গুলি থেকে দ্রবীভূত খনিজ পাম্প করে মাটির ওপরে তোলে, গাছেরা পুষ্টির অভাবে ভোগে না।

২০। মোহন দেশ পান্ডে, জৈব চাষি, ১৯৯৪ সালে বিদাদা কচ্চে একটি জমায়েতে বলেছিলেন, যেখানে ভাস্কর সাভেও অংশগ্রহণ করেছিলেন, শ্রী দেশপান্ডে তার বক্তৃতা শুরু করেন নাটকীয়ভাবে, ‘কে বলে কচ্চে বৃষ্টি হয় না।’

২১। “যুদ্ধের শেষে আমেরিকায় ১৮টি নতুন অ্যামোনিয়া কারখানা, যেগুলি তৈরি করা হয়েছিল বিস্ফোরক প্রস্তুত করবার জন্য —তাদের উদ্বৃত্ত উৎপাদনের জন্য নতুন বাজার ধরা বাধ্যতামূলক হয়ে দাড়ালো। ডু-পন্ট, ডাউ, মনসাটো, আমেরিকান সিনামাইড তাদের যুদ্ধকালীন বিশাল লাভ সহ আরো বেশি বেশি সার উৎপাদন করতে লাগল অক্লান্ত চাষিদের ওপর ঢালবে বলে।

(`Secrets of the Soil` op cit. pg. xvii)

২২। `An Agricultural Testament` by Albert Howard op cit pg. 28-30

২৩। `Organic farming`, pg. 18 transcript and key note address by Dr Shailendra Nath Ghosh at the National Convention on Organic farming`, Sambardhan, 1984.

২৪। ফলের গাছগুলির চারপাশে সাধারণত কর্ষণ কাজ করা হয়। কিন্তু ভাস্কর সাভে তা করেন না। শুরুতে তার লক্ষ্য হল মাটিকে সবুজ গাছ-পাতায় (তা আগাছা হোক অথবা শাক-সব্জী) ঢেকে দেওয়া এবং তা বজায় রাখা। এটিই হল বাগিচা প্রস্তুত করার ক্ষেত্রে তার প্রথম কাজ এবং কর্ষণের কাজ কখনও নয়, আগাছে খুব বেড়ে গেলে, বড়জোর তাদের অতিরিক্ত বৃদ্ধি ঠেকাতে তাদের ছেঁটে ফেলে তা দিয়ে মাটির ওপর আচ্ছাদন তৈরি করা যেতে পারে। এইরকম ছাঁটার কাজ বছরে এক বা দু'বার করা যেতে পারে। এর ফলাফলও হয় খুব ভাল।

ফুকুওকা বলেন, কুড়ি বছর আগে জাপানের কোনো বাগিচায় ঘাসের একটাও ফলক (blade) দেখা যেত না। আমার মত বাগিচা লক্ষ্য করে লোকজন বুঝতে শুরু করল যে ফলের গাছ আগাছা বা ঘাসেদের মধ্যে বেশ ভালোভাবেই বাড়তে পারে। আজ ঘাসে ঢাকা বাগিচা সারা জাপান জুড়ে খুবই সাধারণ দৃশ্য।’’

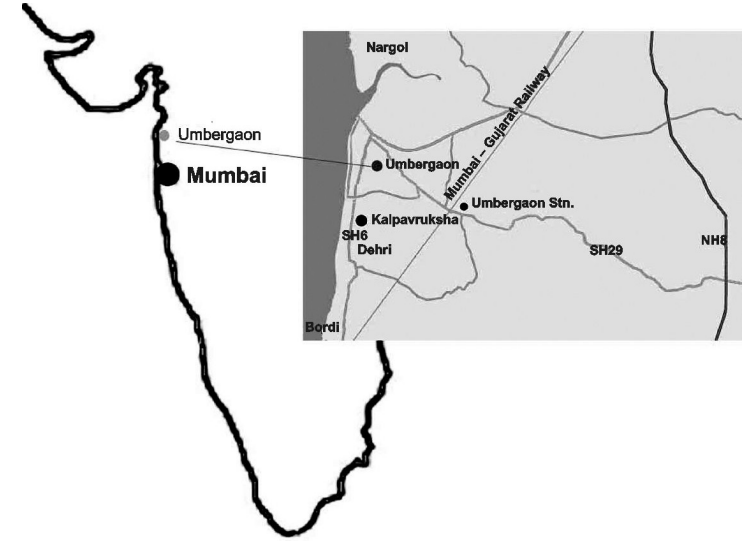
স্মৃতি : (Remembrance)



ভাস্কর সাভে জন্মেছিলেন দক্ষিণ গুজরাতে সীমান্তবর্তী অঞ্চলে সমুদ্রের লীলাভূমি উপকূলের এক মনোরম গ্রাম দেহরিতে। দিনটা ছিল ১৯২২ সালের ২৭ জানুয়ারি। তাঁর মা ও বাবা জানকী ও হীরাজি ছিলেন ওয়াডোল সম্প্রদায়ের।

চাষবাস বইছে সাভে পরিবারের রক্তে আর ওয়াডোল কথাটার অর্থ হল খামার-লালনকারী। গ্রামের ভূমির খতিয়ান-রক্ষক অফিসে লিপিবদ্ধ আছে ভাস্কর সাভের পূর্বপুরুষদের নাম, যারা আট প্রজন্ম ধরে ওই অঞ্চলে চাষবাস করে আসছে।

তাঁর ছেলেবেলার দিনগুলির কথা স্মরণ করে ভাস্করভাই স্মৃতিমেদুর কণ্ঠে বলে চললেন, “তখন জীবন ছিল সরল। যদিও তখন বিদ্যুতের মতো





গাছটির মা এবং আদিবাসী উপকথা

মনোমুগ্ধকর শৈশবের স্মৃতি প্রসঙ্গে সাভে বললেন, “আমাদের বাড়ির কাছে একটা ছোটো গাছ বেড়ে উঠছিল। একদিন আমার মনে হল, “গাছটা আমার চেয়ে বেশি দ্রুত বাড়ছে। একই জায়গায় দাঁড়িয়ে থেকে কী করে গাছটা তার সমস্ত চাহিদা মেটায়? আমার যখন খিদে পায় আমি রান্নাঘরে যাই, আর মা আমাকে খেতে দেয়। গাছটার মা কে হতে পারে?”

“আমার কৌতূহল বেড়েই চলল। গাছটার ভিতরে কী আছে তা দেখতে আমি তার ছাল ছাডলাম। আরও বোকামি করে গাছের মূলগুলো খুঁড়লাম — আর মায়ের চড় খেললাম। কিন্তু প্রশ্নটা আমার মনে রয়েই গেল।”

ছেলেবেলায় আশপাশের অঞ্চলে যাওয়ার সময় বাবার সঙ্গে হত ভাস্কর। গরুর গাড়ি চড়ে জঙ্গলের ভিতর দিয়ে যেতে যেতে তার মনে হত যেন সে এক স্বপ্নের সুড়ঙ্গ দিয়ে যাচ্ছে — তার চারপাশ জুড়ে নানা রহস্যের আবরণ। অপূর্ব এক সুগন্ধ। একটা পাখি ডেকে উঠল, বাতাসে আন্দোলিত পাতাদের শব্দ, স্যাত করে কী একটা জীব ছুটে গেল, কানের ভিতরে কীসের এক গুনগুন, একটু ফাঁকা মাঠে রোদ পড়েছে, কুমড়ো লতা মাটিতে বয়ে চলেছে ... আর তারপর সুন্দর সব ছোটো ছোটো বাড়িঘর, তাদের মাটির দেওয়ালে অপূর্ব সব আঁকজোক।

ভাস্কর সেখানকার ওরলি আদিবাসীদের সাথে পরিচিত হলেন। এই আদিবাসীদের জীবনশৈলী ও সংস্কৃতি যেন এক মুগ্ধতার ঝরনাধারা। ঈশ্বর গাছেদের মাঝে বাস করেন — তাদের এই বিশ্বাসে তিনি মুগ্ধ হলেন। এই গাছেদের কখনও কাটা হত না, যতক্ষণ না তারা শুকিয়ে গিয়ে শরীরের শেষ সবুজটুকু বোঁড়ে ফেলে ... কয়েক দশক পরে বৃক্ষরোপণ হয়ে উঠল সাভের এক তীব্র আবেগ — ঈশ্বরকে এক আনন্দময় আমন্ত্রণ।

আধুনিক সুবিধাগুলো ছিল না, মানুষজন ছিল যথেষ্ট সুখী। কৃষি ছিল এক ভরিয়ে তোলার পেশা — আধুনিক পদ্ধতির দ্বারা যা হয়ে উঠেছে উদ্বেগে ভরা এক বিচ্ছিন্ন লড়াই — এমনটা নয়, লোকজন তাদের শ্রম ভাগ করে নিত এবং প্রায়শই একে অপরের জমিতে গল্প করতে করতে, রঙ্গ রসিকতা করতে করতে, আবার কখনও বা সমবেতভাবে গান গাইতে গাইতে বীজ বুনত বা ধান কাটত।

বর্ষার আগমনের সাথে সাথেই শুরু হত ব্যস্ততার মরশুম। অঞ্চলের বেশিরভাগ গ্রামবাসীদের মতোই সাভে পরিবার চাল, ডাল ও শাকসবজি ফলাত। গাছ-ফসলের রোপণ তাদের চিরাচরিত কৃষিকাজের অন্তর্ভুক্ত ছিল না। সম্ভবত এর কারণ হল চারপাশের সমৃদ্ধ বনভূমি ও গ্রামের প্রতিবেশ থেকে প্রচুর পরিমাণে ফল-ফলাদি ও বৃক্ষ-জাত উৎপন্ন ফসল পাওয়া যেত। তাই ফসল ফলানোর থেকে ফসল সংগ্রহ করার দক্ষতার প্রয়োজন ছিল বেশি।

অবশ্য লোকজন জঙ্গল থেকে তাদের তাত্ক্ষণিক প্রয়োজন মেটানোর চেয়ে বেশি গ্রহণ করত না। এই অঞ্চলে জঙ্গল থেকে অতিশোষণ শুরু হল এখানে বহিরাগত ব্যবসায়িক স্বার্থ প্রবেশ করার সাথে সাথে — এর শুরু ইংরেজ উপনিবেশিকদের আগমনের সাথে।



ভাস্কর সাভে ও তার পরিবারের সাথে মাসানোবু ফুকুওকা, ১৯৯৭



জঙ্গলের ওরলি আসিবাসীগণ

আদিবাসীরা হল প্রাচীন ভারতের আদি বাসিন্দা। বস্তুত আদি-বাসী কথাটির অর্থ হল আদি-কাল বা স্মরণাতীত কাল থেকে বসবাসকারী মানুষজন। ব্রিটিশদের আগমনের পূর্বে আদিবাসীরা সামূহিকভাবে বিশাল অঞ্চলের জমির অধিকার ভোগ করত।

ভাস্কর সাভের খামার সংলগ্ন অঞ্চলের ওরলি আদিবাসীদের বসুন্ধরা-বান্ধব (earth-friendly) জীবন-সংস্কৃতির ওপর মনোমুগ্ধকর এক নিবন্ধে উইনিন পেরেরা লিখেছেন, “তারা নিজেদের জঙ্গলের রাজা বলে ঘোষণা করে ... যদিও তারা জঙ্গলের শোষণ-কারী নয়, বরং জঙ্গলের রক্ষকের মতো আচরণ করে। জঙ্গলের বদান্যতাকে তারা কখনও অতিরিক্ত ভোগের দ্বারা নষ্ট করে না।”

“কিন্তু ওরলিদের জঙ্গল কেড়ে নেওয়ার পর ব্রিটিশরা জঙ্গলের ধ্বংস শুরু করল। তারা তাদের নৌবাহিনী, রেলপথ ও সামরিক প্রয়োজনে নিধন করল জঙ্গল।”

পেরেরা বলছেন, “স্থানীয় আদিবাসীদের কাছে প্রকৃতি হল পবিত্র এবং তাঁকে তারা পূজা করে। তারা তাদের ঈশ্বরকে ‘হিরবা’ নামে ডাকে। ‘হিরবা’ মানে হল সবুজ। হিরবাকে ঐতিহ্যগতভাবে সমস্ত সম্পদের উৎস মনে করা হয়। তারা প্রকৃতির উৎপাদনকে মানুষের শ্রমের ফসল বা তাদের সম্পত্তি বলে মনে করে না, বরং মনে করে তা হিরবার দান। মা-মাটিকে তারা জীবন্ত ধরিত্রী — তাদের সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ দেবী বলে মনে করে। কানসারি হল তাদের শস্যের দেবী, গাভভারী হল গরুর দেবী, পালঘাট হল বৃক্ষ ও উর্বরতার দেবী। জীবনের প্রতি তাদের এই ভালোবাসা ছুঁয়ে যায়, এমনকী ক্ষুদ্রতম জীব ও উদ্ভিদকে।

উইনিন পেরেরা আরও বলেন, “যদি একটি অতি প্রভেদকারী (differentiated) সমাজ আত্ম-ধ্বংসী হয় অথবা অন্যদের শোষণ করে টিকে থাকে, সেই সমাজ নিজেকে সভ্য বলে দাবি করার অধিকার হারায়। ... (বিপরীতে) সৃষ্টির অখণ্ডতাকে সংরক্ষণ করার ক্ষমতা হল সভ্যতার একটি মাপকাঠি। তাদের (ওরলী) সংস্কৃতি আধ্যাত্মিক ও বৈষয়িককে, প্রাণ (living) ও জড় (non-living) —কে এক অচ্ছেদ্য অখণ্ডতায় বেঁধে রেখেছে।” (১২১ পৃষ্ঠায় দেখুন “ওরলি আদিবাসীদের সুস্থায়ী জীবন-সংস্কৃতি)



ভাস্কর সাভে জানালেন যে এই অঞ্চলে সবেদা বাগানের প্রসার ঘটে ইরানিরা এখানে বসবাস করার পর। যদিও পারসিরা পারস্য থেকে জলপথে এখানে এসেছিল বহু শতাব্দী আগে। তারা উজানে ভেসে আসে ভারলী নদীর মুখ পর্যন্ত, যেখানে নদীটি সমুদ্রে মিশেছে, সেখানে তারা উমের গ্রাম ছাড়িয়ে কয়েক কিলোমিটার উজানে সঞ্জুন গ্রামের কাছে নামে। বাহমান কাইকোবাদ লিখিত আদি ফার্সি কবিতা থেকে ভাষান্তরিত ‘কিসসে-ই-সঞ্জুন’ নামক গ্রন্থে এই কাহিনি লিপিবদ্ধ রয়েছে।

কয়েক শতাব্দী পরে যখন ইরানিরা আসে, পারসিরা ইতিমধ্যেই হয়ে উঠেছে বিরাট সব জমির মালিক, যেখানে আদিবাসী শ্রমিকরা আবর্তন পদ্ধতিতে বিভিন্ন মাঠ-ফসল চাষ করত। এই অঞ্চল সংলগ্ন প্রাচীনতম পারসি আবাসস্থলগুলি হল সাবগল, সঞ্জুন, দেহরি ও সারন্দা। ইরানিদের মতো অনেক পারসিও বাগিচা ফসলে, বিশেষত সবেদা বাগান তৈরিতে উদ্যোগী হয়।

স্থানীয় আদিবাসী ও অন্যান্য কৃষকদের বেশিরভাগই বর্ষার জলে ধান, ডাল ও শাক-সবজি ফলিয়ে পাশাপাশি কিছুটা বনজ ফসল ও সমুদ্র-জাত খাদ্য সংগ্রহ করেই খুশি থাকত। এখানে পুষ্টির কোনো সত্যিকারের অভাব ছিল কার্যত বিরল। স্বাস্থ্য সম্পদে মানুষ বলমল করত, এই সমৃদ্ধ অঞ্চলে এখনও বহু মানুষ তাই করে।

ধান কাটার পর অন্যান্য কাজকর্ম থাকে। আবার দেখার, ভাবার ও প্রকৃতির দানগুলিকে উপভোগ করবার জন্য তাদের যথেষ্ট অবকাশ থাকত। সুসময় জুড়ে প্রায়শই উদ্‌যাপন হত সামাজিক উৎসবের। কিন্তু কোনো মরশুমে হয়তো কারোর ফসল ভালো হল না, তখন সে বা তারা প্রতিবেশী বন্ধুদের দ্বারস্থ হতে পারত যারা তাকে/তাদের পূর্ববর্তী বছরের উদ্বৃত্ত ফসল দিয়ে সাহায্য করত।

এরকম একটা পরিবেশে ভাস্কর সাভে বেড়ে উঠেছিলেন। তাঁর শিক্ষাগত যোগ্যতা হল পুরোনো ব্যবহার সপ্তম শ্রেণী পর্যন্ত (আজকের দশম শ্রেণীর সমতুল্য)। তারপর তিনি প্রাইমারি ট্রেনিং সার্টিফিকেট (পিটিসি) পাশ করেন এবং স্কুলে শিক্ষকতার যোগ্যতা অর্জন করেন। তিনি দশ বছর ধরে স্কুলে শিক্ষকতা করেন।

সমুদ্রের এক উপহার ও অন্যান্য মাইলস্টোন

১৯৪০ সালে ১৭ই অক্টোবর এক ভয়ঙ্কর সামুদ্রিক ঝড়ে সব লগুভঙ হয়ে গেল। কয়েকদিন পর গ্রামবাসীরা আনন্দের সাথে লক্ষ্য করল যে ঝড়ের

দাপটে শত শত ঝুনো নারকেল সমুদ্র সৈকতে এসে জড়ো হয়েছে। আসলে এটি ঘটেছিল এক ব্যবসায়ীর জাহাজ সমুদ্রের ঝড়ে ডুবে যাওয়ার ফলে।



মালতিবেন ও ভাস্করভাই সাভে

ভাস্করের বয়স তখন ১৮। তিনি আর তাঁর বন্ধু জগণ্ড ছিলেন পোক্ত সাঁতারু। নারকেলগুলোকে গোল করে ঘিরে ভাসিয়ে নিয়ে আসার জন্য একটা দীর্ঘ তার নিয়ে তাঁরা সাঁতরে ঢুকে পড়েছিলেন সমুদ্রের অনেকটা গভীরে। বেশ কয়েক ঘণ্টা পরে তাঁরা ক্লান্ত, অবসন্ন হয়ে ফিরে এসেছিলেন — অবশ্য তাঁদের সঙ্গে ছিল বিরাট এক নারকেলের স্তুপ যেগুলি আজও রয়ে গেছে বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়ে। সমুদ্র থেকে পাওয়া এই নারকেলের অনেকগুলোকে রোপণ করা হয়েছিল গোপাল বাগে। কৃষ্ণ-মন্দিরের পাশে এই বাগিচাটি ভাস্করের বাবা কয়েক বছর আগে লিজে নিয়েছিলেন। চারাগুলি স্বাস্থ্যকর গাছ হিসাবে বেড়ে উঠল এবং ফল দিতে লাগল। বহু বছর পর সাভে দ্বিতীয়

প্রজন্মের নারকেলগুলি রোপণ করেন তাঁর কল্পবৃক্ষ খামারে। এই গাছগুলি এখন প্রচুর পরিমাণে ফল দিচ্ছে। আবার তৃতীয় ও চতুর্থ প্রজন্মের নারকেল গাছগুলিও বেড়ে উঠেছে।

১৯৪০ দশকের মাঝামাঝি সময়ে ভাস্কর সাভে শিক্ষকতা শুরু করেন। তখন থেকেই শুরু হল তাঁর দীর্ঘ কর্মব্যস্ত দিনগুলি। কারণ জেগে থাকা সময়ের সমস্তটাই হয়ে উঠল তাঁর কাজের সময়। সকাল ৬টা থেকে ১০টা পর্যন্ত তিনি পারিবারিক খামারের দেখাশোনা করতেন। তারপর সামান্য খাবার খেয়ে জঙ্গলের মধ্য দিয়ে হেঁটে পৌঁছাতেন প্রতিবেশী এক গ্রামে তাঁর স্কুলে। বাড়ি ফিরতে সন্ধ্যা হয়ে যেত, কিন্তু বাড়ির অন্যান্য অনেক কাজকর্ম করে অনেক রাত হয়ে যেত।

শীঘ্রই ভাস্করভাই একটি অতিরিক্ত আংশিক সময়ের কাজ পেলেন, সেটি হল সকালবেলায় ২ ঘণ্টা ধরে চিঠি বিলির কাজ। এই কাজের জন্য তিনি যে সাইকেলটি পেলেন তাতে তাঁর স্কুলে যাতায়াতে শ্রম ও সময়ের সাশ্রয় হল।

১৯৫১ সালে ভাস্করভাই মালতি বেনকে বিয়ে করলেন। দীর্ঘ ৫৮ বছর ধরে মালতি বেন ছিলেন ভাস্কর সাভের শ্রম ও সুখ-দুঃখের সাথি। (তিনি ২০০৯ সালে দেহত্যাগ করেন।) ১৯৫১ সালেই সাভে পরিবার সম্মিলিতভাবে তাদের কুয়ো খুঁড়তে শুরু করেন। ১৯৫২ সালের বর্ষার আগে কুয়ো খনন সম্পন্ন হয় এবং শীঘ্রই কুয়োটি মিষ্টি জলে ভরে ওঠে। ভাস্কর সাভের বাবা হীরাজি আহ্লাদিত হন। কয়েক মাস পরে তিনি শান্তিতে চোখ বোজেন।

রাসায়নিকের ব্যবহার শুরু ও ত্যাগ করা (১৯৫২—১৯৫৯)

১৯৫২ সালে সাভের পরিবার কুয়োতে একটি জলচাকা স্থাপন করেন। এটি চালাবার জন্য তাঁরা একটি মোষ কিনলেন। বর্ষার ধান কাটার পর তাঁরা সেচ দিয়ে শাক-সবজি চাষ করলেন এবং জীবনে প্রথমবার সবজির গাছগুলিতে গোবরসারের সাথে কিছুটা রাসায়নিক সারও ব্যবহার করলেন। তিনি ইতিমধ্যে চাষ বিষয়ে গুজরাতি বা মারাঠিতে সেসব লেখা পেতেন পড়তেন।

পরের বছর ভাস্কর সাভে বর্ষার ধান চাষেও রাসায়নিক প্রয়োগ করলেন। তিনি সাম্প্রতিককালে জাপান থেকে আনা একটি আধা-বামন প্রজাতির ধান রোপণ করলেন। (জাপানই হল প্রথম জাতি যারা ধানের খর্বকায় ‘রাসায়নিক সার-সংবেদী’ প্রজাতিগুলি থেকে এমন ধান নির্বাচন করেছিল যেগুলির উগা দেশজ লম্বা প্রজাতির মতো রাসায়নিকের ব্যবহারে ঝুঁকে গিয়ে পড়ে যেত না।)

সাভে যে ফসল পেলেন তা বিরাটভাবে নজর কাড়ল। গুজরাতে ফার্টলাইজার কর্পোরেশনের একজন ডিরেক্টর সাভের সাথে দেখা করে তাঁকে অভিনন্দন জানানলেন এবং রাসায়নিক সার বিক্রির জন্য তাঁকে এজেন্সি দিতে চাইলেন। সেক্ষেত্রে সার বিক্রির সাথে সাথে তাঁর কাজ হল সেই সারের ব্যবহারে চাষীদের পথ দেখানো। সারের প্রতি ব্যাগ বিক্রি পিছু তাঁকে আকর্ষণীয় কমিশন দেওয়ারও প্রতিশ্রুতি দেওয়া হল।

শীঘ্রই সাভে এই নতুন প্রযুক্তির এক আদর্শ চাষিতে পরিণত হলেন। পুণে ও অন্যান্য জায়গায় বহু কৃষিবিজ্ঞানী তাঁদের ক্ষেত্র-পরীক্ষাগুলির (field-trials) জন্য ভাস্কর সাভের অভিজ্ঞতাগুলি অনুসরণ করতেন। ১৯৫৪-৫৫ সালের মধ্যে তিনি যথেষ্ট অর্থ উপার্জন করেছিলেন যা দিয়ে তিনি ২.৫ একর ধানজমি কিনলেন। এই কেনা জমিতে শুরু হল তাঁর কল্লবৃক্ষ খামার।

যদিও ভাগ্যলক্ষ্মী সাভের ওপর প্রসন্ন ছিলেন, কয়েক বছরের মধ্যেই তিনি উপলব্ধি করলেন যে ইতিমধ্যে উৎপাদিত ফলনের পরিমাণ বজায় রাখতে তাঁকে আরও বেশি বেশি মাত্রায় রাসায়নিক ব্যবহার করতে হচ্ছে এবং অর্থ ব্যয়ও করতে হচ্ছে আরও বেশি। তিনি এটাও লক্ষ্য করলেন যে তাঁর মাটির জৈবজীবনও ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

প্রথম যৌবন থেকেই সাভে ছিলেন গান্ধীর “জ্ঞান গড়ে ওঠে শুধুমাত্র কাজের সাথে আন্তরিক সম্বন্ধ ও ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ওপর” — এই উক্তির দ্বারা ভীষণভাবে প্রভাবিত। এগুলি ছাড়া কারও কাছে সবচেয়ে বেশি হলে যা থাকে তা হল ‘অপরীক্ষিত তথ্য’। এই অন্তর্দৃষ্টি সাভেকে উদ্বুদ্ধ করেছে সমস্ত রকম পথে সত্যকে নিয়ে পরীক্ষা চালাতে। রাসায়নিক কৃষিকে অনুসরণ করে যখন মনে হচ্ছিল তিনি গান্ধীবাদী পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছেন, তখনও তিনি গান্ধী ও বিনোভা ভাবের লেখাগুলি — বিশেষ করে কৃষি সংক্রান্ত লেখাগুলি উপভোগ করতেন। এই দুজন মানুষকে ভাস্কর সাভে শ্রদ্ধা করতেন তাঁদের ন্যায়পরায়ণতার জন্য।

সাভে বিনোভার একটি লেখা পড়েছিলেন, যেখানে বলা হয়েছিল যে যখন কোনো ধানজমিতে জল জমে থাকে তখন কিছুকালের জন্য নতুন বর্ষাণের অভাবে সাদা ফিল্মের মতো একটি স্তর ভূতলের ওপরে জমা হয়। এটা থেকে বোঝা যায় যে ধানগাছের দ্বারা শোষিত হয়ে এই জলে অক্সিজেনের মাত্রা কমে গেছে। বিনোভা আরও লিখেছিলেন যে অনেক আদিবাসী সমাজ জানে যে যখন প্লাবিত ধানখেতে এরকম ঘটে তখন মাছেরা ছটফট করে এবং সেই খেত থেকে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করে। এই সময়টাই আদিবাসীরা মাছ ধরার জন্য ফাঁদ পাতে। ভাঁটি বাঁধে (downstream bund) ছোটো

একটা গর্ত কেটে ঠিক তার নিচে বাঁশের কঞ্চি দিয়ে তৈরি এক ছাকনি বুড়ি বসিয়ে জলের সাথে চুনো মাছগুলি এড়িয়ে যাবার পথ রেখে বড়ো মাছগুলিকে ধরে।

অণুসিদ্ধান্ত হিসাবে সাভে যুক্তি সাজালেন ধান গাছেরাও তো জল থেকে অক্সিজেন গ্রহণ করে। যখন মাঠে জমে থাকা পুরোনো জলকে (যাতে অক্সিজেন থাকে কম) বর্ষার নতুন জল (অক্সিজেন সম্পৃক্ত) পূরণ করতে না পারে, তখন ধান গাছেরাও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সাভে লেখাটি বারবার পড়লেন এবং সিদ্ধান্ত নিলেন যে তাঁর কোনো একটা জমিতে তিনি এ নিয়ে পরীক্ষা চালাবেন।

যখন বর্ষাণের এক দীর্ঘ বিরতি পাওয়া গেল, তিনি এক টুকরো ধানজমিতে বাঁধ কেটে জমে থাকা পুরোনো জল বের করে দিলেন। তারপর তিনি কাটা বাঁধটি মেরামত করলেন এবং বর্ষায় জমা জল ভরতি কুয়ো থেকে জল চাকা ব্যবহার করে জল দিয়ে আবার জমিটিকে প্লাবিত করলেন।

পরদিন খুব সকালে সাভে ছুটে গেলেন ধানগাছগুলি দেখবার জন্য। মনে হল ধানগাছগুলি সজীব হবার বদলে বরং ক্ষতিগ্রস্তই হয়েছে। তিনি হতাশ হলেন। অবশ্য ২-৩ দিনের মধ্যেই ধানগাছগুলি পুরোনো জল জমে থাকা অবস্থায় গাছগুলির থেকে অনেক বেশি স্বাস্থ্যকর দেখাল। এক সপ্তাহ পরে তিনি তাঁর এক প্রতিবেশীকে এই ফারাকটা দেখালেন। তিনি ভাবলেন সাভে তাঁর পরীক্ষাটি নিয়ে নিজের গুণকীর্তন করছেন। প্রতিবাদে সাভে বললেন, “আমাকে বোলো না যে তোমার কুয়োর জলে রাসায়নিক সার আছে”।

পরের বছর ভাস্কর সাভে ঠিক করলেন যে জৈব ধান নিয়ে পরীক্ষা চালাবেন, জমিতে জমে থাকা জলকে দুবার বদল করলেন। যেহেতু সেই বছর তিনি দেশজ লম্বা প্রজাতির ধান রোপণ করেছিলেন, চারাগুলি অন্যান্য গাছপালার বুনো প্রজাতিদের চেয়ে অনেক বেশি বৃদ্ধি পেল, ফলে আগাছা নির্মূল করার কোনো দরকার হল না। জাপানি বামন প্রজাতির ধানের আন্ত-কর্ষণ (inter-cultivation) বা আগাছা বৃদ্ধি আটকাতে কাস্তে দিয়ে উপড়াতে অনেক শ্রম বা লোকের প্রয়োজন। এটা একটা অবাপ্তি বা মেলো বলে মনে হল। পাশাপাশি এটা ব্যয়বহুলও বটে।

সাভে সংকল্প করেছিলেন যে তিনি ধীরে ধীরে জৈব চাষে ফিরে যাবেন — অন্তত ধান চাষের ক্ষেত্রে। কারণ যে শাক-সবজি তিনি বাজারে বিক্রি করতেন, তাতে তিনি রাসায়নিক ব্যবহার করতেন। কিন্তু গুজরাত ফার্টলাইজার কর্পোরেশন রাসায়নিক ব্যবহার কমিয়ে দেওয়াতে খুশি হল না। চাল হল অঞ্চলের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ চাষ আর কোম্পানি তাদের

রাসায়নিক সারের প্রসার বাড়ানোর একজন আকর্ষণীয় তারকাকে হারাচ্ছে বলে ভয় পেল।

এরপর থেকে ভাস্কর সাভে আধ একর জমি সম্পূর্ণভাবে সংরক্ষিত রাখলেন জৈব চাষের পরীক্ষার জন্য। এখানে তিনি অনুসরণ করলেন ফসলের আবর্তন (crop rotation)। জৈব ধান তোলার পর তিনি লাগাতেন গুঁটি (leguminous) ডাল (যেমন লাভলাব বীন) অথবা ছোলা। সাম্প্রতিক বর্ষার সময়ের বৃষ্টি থেকে মাটিতে যে আর্দ্রতা রয়ে যেত তা থেকেই এই গাছের বৃদ্ধি হত এবং অন্য কোনো ভাবে সেচের প্রয়োজন হত না। এরা বাতাস থেকে প্রচুর পরিমাণে নাইট্রোজেন সংগ্রহ করে মাটিতে চালান দিত যা থেকে পরবর্তী দানাশস্য উৎপাদন করা সম্ভব হত। ডাল ফসল তোলার পর তার ন্যাড়ার (ফসল কাটার পর মাটিতে থেকে যাওয়া খড়ের অবশিষ্ট অংশ) ওপর গবাদি পশু দিয়ে মাড়িয়ে দিয়ে মাটিতে কিছুটা গোবর সার মিশিয়ে দেওয়া হত যা থেকে যথেষ্ট (গোবর) সার পাওয়া যেত।

ফসল আবর্তনের মাধ্যমে পাওয়া ঐতিহ্যগত জৈব চাষের ফলন মোটেই কম হয় না। সাভে স্মরণ করলেন যে তিনি এক আদিবাসী অঞ্চলে দেখেছিলেন প্রায় দু-মাইল লম্বা এক গরুর গাড়ির লাইন। গাড়িগুলিতে ছিল অঞ্চলের উদ্বৃত্ত (surplus) ফসল। আর গাড়িগুলি ছিল পাইকারি ব্যবসায়ী ও তাদের মধ্যসত্ত্বভোগী দালালদের।

১৯৫০ সালে সাভেকে তাঁর বাড়ির কাছে একটি স্কুলে শিক্ষকতার কাজ দেওয়া হয়েছিল। এটি তাকে কৃষিকাজে আরও বেশি সময় দেওয়ার সুযোগ করে দেয়। কিন্তু ১৯৫৫-৫৬ সালে সরকারের নতুন জেলা শিক্ষা অধিকর্তা ওই একই স্কুলে কাজ চালিয়ে যাওয়ার সুযোগ দেওয়ার জন্য তার কাছে ঘুষ দাবি করেন। নীতিগত ভাবেই তা দিতে সাভে অস্বীকার করেন। শীঘ্রই তিনি দূরবর্তী একটি স্কুলে স্থানান্তরিত হওয়ার নির্দেশ পেলেন। এটির অর্থ হল তাঁকে যাতায়াতের জন্য অন্তত দু-ঘন্টা ব্যয় করতে হবে। প্রতিবাদে সাভে পদত্যাগ করলেন।

সাভে শিক্ষকতা ছাড়লেও তাঁর রাসায়নিকের এজেন্সিটি ছিল। কৃষিকাজে যে নানাবিধ পরীক্ষা-নিরীক্ষায় তিনি আগ্রহী ছিলেন, এখন সেগুলি চালাবার জন্য প্রচুর সময় পেলেন। সেই বছর তিনি তাঁর মাঠে গোবর সারের সাথে গ্রামের বিভিন্ন জায়গা থেকে সংগ্রহ করা আবর্জনাও ব্যবহার করলেন। এ জন্য তাঁকে আবর্জনা সংগ্রহ ও গাড়িভাড়ার খরচ দিতে হত। সেই সময় আবর্জনায় কোনো প্লাস্টিক থাকত না, বিক্রি করার জন্য যে শাক-সবজি তিনি ফলাতেন তাতে তিনি রাসায়নিকের ব্যবহার অব্যাহত রাখলেন।

ঐতিহ্যগত টেকসই বা সুস্থায়ী কৃষির সম্পদ)

ভারতীয় কৃষি হল ১০০০০ বছরের পুরোনো। এতগুলি সহস্রাব্দ জুড়ে ঐতিহ্যশালী জৈব চাষের সমৃদ্ধ জ্ঞান ভারতীয় উপমহাদেশের বিপুল জনসংখ্যার মুখে খাবার জুগিয়ে এসেছে। এই জ্ঞানই বৃহৎ এই প্রাচীন সভ্যতার সমৃদ্ধি ও সংস্কৃতিকে বিকশিত করেছে এবং তা সারা পৃথিবীর পর্যটকদের মুগ্ধ করেছে। তখন তো কোনো কৃষি রসায়ন ছিল না। অবশ্য তখন জমি ছিল — এখনও আছে — সারা বছর ধরে প্রচুর সূর্যালোকের আশীর্বাদ পুষ্ট, প্রচুর বৃষ্টিপাত, উর্বর মাটি এবং অসংখ্য বৈচিত্র্যময় ও উপ-বৈচিত্র্যময় প্রজাতির ফসল সহ জৈব বৈচিত্র্যের অপার সম্পদ।

উইনিং পেরেরা তাঁর ‘মাটির লালনকর্ম’ (১৯৯৩) (Tending the earth) নামক গ্রন্থে বিস্তারিতভাবে দেখিয়েছেন, ভারতের ঐতিহ্যশালী কৃষি কীভাবে “সামগ্রিক উৎপাদনশীলতা, স্থায়িত্ব, আত্মনির্ভরশীলতা, বৈচিত্র্য ও দেশজ জ্ঞানের গভীরতায় সব দিক দিয়েই উচ্চস্থানাধিকারী।”

ঠিক একশো বছর আগে জে এ ভোয়েলকার — তাঁর সময়ের একজন প্রখ্যাত ইউরোপীয় কৃষিবিশেষজ্ঞ — ১৮৯৩ সালে তাঁর “ভারতীয় কৃষি প্রসঙ্গে রিপোর্ট”—এ লিখেছিলেন, ‘এটা নিশ্চিত যে সযত্নে লালন করা কৃষির এর চেয়ে বেশি চমৎকার ছবি আমি অন্তত দেখিনি’। ... জল উত্তোলন কৌশলের এমন বুদ্ধিদীপ্ত প্রয়োগ, বিভিন্ন ধরনের মাটি ও তাদের সক্ষমতা এবং বীজ বপনের ও ফসল তোলার নির্দিষ্ট সময়ের জ্ঞান — এগুলি ভারতীয় কৃষিতে যেভাবে পাওয়া যায় তা কেউ অন্য কোথাও দেখতে পাবে না। আর এরকম জ্ঞান শুধু সর্বোৎকৃষ্ট স্তরেই নয় — বরং সাধারণ স্তরে — চাষিরাই এই সব জ্ঞান ও কৃৎকৌশলের অধিকারী। ফসল আবর্তন, মিশ্রচাষ ব্যবস্থা, জমির উর্বরতা পুনরুদ্ধারে চাষ না করে ফেলে রাখা (fallowing) ইত্যাদি বিষয়ে তাদের অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান বিস্ময়কর।”

ভারতের উপনিবেশিক সরকারের সাম্রাজ্য সংক্রান্ত অর্থনৈতিক উদ্ভিদবিদ (The Imperial Economic Botanist) স্যার অ্যালবার্ট হাওয়ার্ড, যিনি এদেশে বহুদিন কাজ করেছেন, তিনি অনুরূপ স্বীকারোক্তি করেছেন, “আমি এই কৃষকদের আমার অধ্যাপক বলে সম্মান করতাম। কৃত্রিম সার ও কীটনাশকের বিন্দুমাত্র সাহায্য ছাড়া কীভাবে কার্যত রোগহীন সুস্থ ফসল ফলাতে হয় তা আমি এদের কাছে শিখেছিলাম।”

হাওয়ার্ড আরও বলেছেন, “প্রাচ্যে কৃষির অনুশীলন চূড়ান্ত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে। তা প্রায় প্রাচীন অরণ্য বা সমুদ্রের বাস্তুতন্ত্রের মতো স্থায়ী।”

বাজারে বিভিন্ন শাক-সবজির কীরকম চাহিদা ও দাম এগুলি সাভে লক্ষ্য করতেন। তিনি দেখলেন বাজারে ছোটো লাউয়ের খুব চাহিদা। বিশেষত বিয়ের মরশুমে এই সবজি থেকে ভালো দাম পাওয়া যেত। তিনি ঠিক করলেন প্রধানত এগুলিরই চাষ করবেন। সেই বছর দক্ষিণ গুজরাতে বহু চাষি এরকমই ভেবেছিল এবং ওই একই চাষ করেছিল, ফলে বাজারে চাহিদার থেকে জোগান হল বেশি।

সে বছর ডিসেম্বরে দাম ভীষণ ভাবে পড়ে গেল। সাভের পাইকারি ক্রেতা তাঁকে টেলিগ্রাম করে মাল পাঠাতে নিষেধ করলেন। কিন্তু সাভে ইতিমধ্যেই ২৭ বস্তা মাল ট্রেনে পাঠিয়ে দিয়েছেন। তাতে প্যাকিং ও যান খরচ ধরে তাঁর খরচ হয়ে গেছে ২০০ টাকা। জানুয়ারিতে সাভে তার ‘বিক্রির স্লিপ’ পেলেন। তা থেকে দেখা গেল, ২৭ বস্তা সবজি পাঠিয়ে তাঁর লাভ হয়েছে ২৬ টাকা।

এই তিক্ত অভিজ্ঞতায় ভাস্কর সাভে এমন বিরক্ত হলেন যে তাঁর মনে হল, আর দেরি নয়, তিনি অর্থকরী ফসলের অজৈব চাষ, শীঘ্রই বন্ধ করে দেবেন। এই ধরনের চাষ দিনে দিনে বেশি ব্যয়বহুল হয়ে পড়েছিল, কারণ বছরে বছরে বেশি বেশি রাসায়নিকের দরকার পড়ছিল আর দামও বাড়ছিল হু হু করে।



সেরাটা কি শেষের জন্য তুলে রাখব?

যখন সাভে পদত্যাগপত্র জমা দিলেন, তাঁর বন্ধু ও অগ্রজরা সাভেকে ব্যাপারটা পুনর্বিবেচনা করতে বললেন। তাঁরা ভাবলেন যে সামাজিক সম্মানজনক নির্ভরযোগ্য উপার্জনের এমন একটা সরকারি চাকরি ছেড়ে দেওয়া হল বোকামির কাজ। তাঁরা পরামর্শ দিলেন, যতক্ষণ না তুমি আর্থিকভাবে সুরক্ষিত হচ্ছ, ততক্ষণ কাজটা চালিয়ে যাও।

ভাস্কর সাভে বিষয়টা নিয়ে বেশ কিছুদিন ভাবলেন। তিনি তার পরামর্শদাতাদের সেই প্রশ্নগুলিই করলেন, যেগুলি তাঁকে যন্ত্রণাবদ্ধ করেছে। কিন্তু প্রশ্নগুলির কোনো সদুত্তর তাঁদের কাছে ছিল না।

যতক্ষণ না আমরা সুরক্ষিত হব, ততক্ষণ কি আমরা আত্মমর্যাদা গিলে ফেলব? আমরা যদি অন্যায়ের প্রতিবাদ বা প্রতিরোধ না করি, আমরা কি আরও বেশি অন্যায়কে আমন্ত্রণ জানাই না? তাহলে কি আমরা এই (অন্যায়) ব্যবস্থাটাকে চলতে দেওয়ার অপরাধে অপরাধী নই?

যদি পরিস্কার ভাবে বোঝা যায় যে ব্যবস্থাটাকে বদলে ফেলা দরকার,

তাহলে সেই কাজটা পরে করব বলে ফেলে রাখার কী মানে? আমাদের যৌবনের প্রত্যয় ও আকাঙ্ক্ষাগুলিকে দাবিয়ে রেখে আমাদের সেরাটা কি শেষের জন্য তুলে রাখতে আমরা বাধ্য থাকব? আমাদের স্বপ্নগুলো পরে পূরণ করার কল্পনা কি এক ভ্রম নয়? তখন আমাদের উদ্দীপনা ও শক্তি শেষ হয়ে যাবে না? আর আমরা কতদিন বাঁচব সেটাই বা কে জানে।



কার্যকর একটা বিকল্প ফসলের কথা ভাবতে গিয়ে সাভের দৃষ্টি গিয়ে পড়ল অঞ্চলের ইরানি ও পার্সি বাগিচাগুলির দিকে। তিনি ভাবতে লাগলেন যে তিনিও ফল/বাদাম গাছগুলির চাষে নামবেন কিনা? প্রবৃত্তিগতভাবে তিনি এদিকে আকৃষ্ট হলেও এক্ষেত্রে অর্থ ফেরত পাবার দীর্ঘ মেয়াদের কথা ভেবে তিনি দমে গেলেন। সাভে ঠিক করলেন যে এপথে তিনি এগোবেন ধাপে ধাপে। তার পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু হয়ে গেল তৎক্ষণাৎ।

১৯৫৪ সালে ভাস্কর সাভে তাঁর খামারের জমিটি কিনেছিলেন। সেটা ইতিমধ্যেই বেড়ে হয়েছে ৪.৫ একর। ১৯৫৭-৫৮ সালে তিনি সেখানে একটা ছোটো বাড়ি করলেন। এরপর এক কিমি কম দূরত্বে, দেহরি গ্রামে তাঁর পুরোনো আবাসস্থল ছেড়ে সেখানে তিনি সপরিবারে উঠে গেলেন। জৈব শাক-সবজির মাঝে ফলের গাছের চাষ হয়ে উঠল তাঁর নতুন আকর্ষণ। আর তিনি চাইলেন যাতে এই কাজে তিনি আরও বেশি শ্রম ও ধ্যান দিতে পারেন। জৈব পথের ওপর তাঁর প্রত্যয় দৃঢ়ভাবে বাড়তে লাগল। এক্ষেত্রে শুধুমাত্র খরচই কমল না, দেখা গেল মাটি ও গাছপালা হয়ে উঠেছে আরও বেশি স্বাস্থ্যজ্জ্বল। ১৯৬০ সালের মধ্যে, বেশিরভাগ ভারতীয় চাষিরা তাঁদের জমিতে রাসায়নিক ব্যবহার শুরু করার আগেই, তিনি তাঁর জমিতে রাসায়নিক ব্যবহার বন্ধ করে দিলেন।

দু-দশক আগে গুজরাতে এক সর্বোদয় (গান্ধীবাদী) নেতা ভাস্করভাইকে বলেছিলেন, তিনি চাষিদের পরামর্শ দিন যাতে তারা রাসায়নিকের ব্যবহার হঠাৎ করে সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করে না দেয়, বরং তা খেপে খেপে কমিয়ে সম্পূর্ণ বন্ধ করে। কিন্তু ভাস্করভাইয়ের যুক্তি হল, “যখন রাসায়নিকের ব্যবহার কমানো হয় তখন মাটির ক্ষতি কমে আসে। কিন্তু তবুও তা ক্ষতিকর। তাতে মাটির ক্ষতি হতেই থাকে, যদিও কম দ্রুততার সাথে।”



রাসায়নিকের মাত্রা কমানো ভালো পরিচালন কৌশল নয়

ঘুরে দাঁড়ানোর বিন্দুতে (the turning point) — যেখানে ক্ষতি হওয়া বন্ধ হয়ে মাটির স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার শুরু হয় — তখনই পৌঁছানো যায়, যখন মাটির জৈব জীবনের ওপর যাদের বিষাক্ত প্রভাব আছে তাদের ব্যবহার সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করা হয়। বৃষ্টি যখন পুরোনো বিষ ধুয়ে দেয়, তখন মাটির অসংখ্য অণুজীব ও কেঁচোরা ধীরে ধীরে পুনরুজ্জীবিত হতে থাকে এবং মাটিতে হিউমাস (বা পাতাপচা সার) তৈরি হয়। এটাই হল মাটির স্বাস্থ্যের মূল ভিত্তি — যার অভাবে সুস্থ গাছপালার বৃদ্ধি ও স্বাস্থ্যকর খাবার তৈরি হয় না।

মাটির উর্বরতা বৃদ্ধির জন্য প্রাকৃতিক প্রক্রিয়াগুলি ধ্বংস করে কৃষি-রাসায়নিকগুলির অব্যাহত ব্যবহারের ওপর নির্ভরশীলতা তৈরি করা হয়। ফলে রাসায়নিকের ব্যবহার কমলেই ফলন কমে যায়। তখন চাষি উদ্বিগ্ন হয় এই ভেবে যে সে সার দিয়েছে কম, ফলে ফলন কমেছে। তখন সারের ব্যবহার বন্ধ করবে কি, বরং তখন সে আরও বেশি বেশি সার দিতে থাকে।

“রাসায়নিক ব্যবহারকারী চাষিদের মধ্যে যাদের সাথে আমি কথা বলেছি তাদের বেশিরভাগই পরিষ্কার বুঝতে পারে এবং প্রায়শই স্বীকার করে যে

তারা (খাদের দিকে) গড়িয়ে নামছে। তারা বোঝে যে এপথ দিয়ে এগোনো সম্ভব নয়। কিন্তু কৃষির পথ পরিবর্তনে তাদের প্রত্যয়ের অভাব রয়েছে। তাদের প্রতি আমার পরামর্শ হল যে তাদের অন্তত শুরু করা উচিত — তাদের জমির একটা অংশে রাসায়নিক সম্পূর্ণভাবে বর্জন করে এবং তার বদলে যেখানে যতটুকু জৈব সার পাওয়া যায় তা তাদের ব্যবহার করা উচিত।

সাভে বলেন, এরকম করলে প্রথম বছরে যদি ফলন বিশেষভাবে কমে যায়, এই পদ্ধতিতে খরচের সাশ্রয় হওয়ায় ক্ষতিটা অনেকাংশে কম হবে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় বছরের শেষে অবস্থার উন্নতি হয়ে পরিষ্কার লাভ পাওয়া যাবে। আর যদি এই জৈবসারে তৈরি খাবার কৃষকের নিজের পরিবার খায়, তাহলে তাদের স্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটবে। চাষির অভিজ্ঞতা ও প্রত্যয় যত বাড়তে থাকবে ততই ধাপে ধাপে বেশি পরিমাণ জমি পুনরুদ্ধার করে জৈব পদ্ধতিতে চাষ করা যাবে। এই নতুন জমিতে প্রতি বছর যে জৈব সার ব্যবহৃত হয় তা ঘনীভূত হয়ে মাটির স্বাস্থ্যের পুনরুজ্জীবনকে দ্রুততর এবং মাটির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করে। তাই জমি পুনরুদ্ধারে প্রাথমিক ফলাফল ভালো না হলে নিরুৎসাহ হবার কোনো কারণ নেই।

কৃষি-রাসায়নিকের পথ কেন আত্মহত্যার শামিল

গত পরিচ্ছদে যেমন বলা হয়েছে নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের জমির (temperate land) সঙ্গে তুলনায় গ্রীষ্মমণ্ডলের মতো আবহাওয়ার জমিতে/মাটিতে (tropical condition) জৈব বস্তু বেশি দ্রুত অজৈব বস্তুতে রূপান্তরিত হয়। তাই মাটিতে কৃত্রিমভাবে রাসায়নিক পুষ্টির জোগান দেওয়া শুধুমাত্র অপ্রয়োজনীয় নয় বরং বিশেষভাবে ক্ষতিকারকও বটে। ইউরিয়ার মতো নাইট্রোজেন-জাত সার মাটির ওপর জৈবতন্তু দ্বারা সৃষ্ট আসনের মতো স্তরটি ক্ষইয়ে দিয়ে রূপান্তর বা পচনের কাজটি ত্বরান্বিত করে। এই আসনের মতো স্তরটি মাটির সুরক্ষা কবচের মতো কাজ করে। ফলে এর ক্ষয়ে ভূমিক্ষয়ের প্রবণতা ও মাটির পুষ্টি দ্রব্যগুলির ক্ষয়ও বৃদ্ধি পায় যা গ্রীষ্মমণ্ডলীর বিপুল বর্ষণে মারাত্মক আকার ধারণ করে।

তা সে যাই হোক, সংশ্লেষিত সারের অজৈব যৌগগুলিতে গাছের প্রয়োজনীয় মৌল থাকে মাত্র কয়েকটি। এই কয়েকটি মৌলও আবার জোগান দেওয়া হয় ঘনীভূত রূপে। যেহেতু গাছপালা ঘনীভূত মৌলগুলিকে তৎক্ষণাৎ শোষণ করতে পারে না, পুষ্টিগুলি (nutrients) বহুলাংশে নষ্ট হয়। কিন্তু আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ হল এই যে বিষাক্ত রাসায়নিকগুলি মাটির জৈব

জীবনের ভীষণ ক্ষতি করে। বিশেষ করে মারাত্মক হল মাটির অণুজীব, কেঁচো ইত্যাদির ওপর কীটনাশকগুলির হত্যালীলা। এর অবশম্ভাবী ফল এই জীবগুলি মাটির তৈরি করার (কর্ষণের) যে কাজ করে থাকে তা নষ্ট হয়ে যায়, মাটির দানাগুলির ভেদ্য (porous) গঠন ভেঙে যায়, মাটি থেকে বাতাস বের হয়ে যায়, ফলে মাটি জলধারণ ও বায়ুধারণ — এই উভয় ক্ষমতাই হারায়।

এরপর আসে আরও অসংখ্য সমস্যা। কৃত্রিম কার্বন ও সেচের প্রয়োজনীয়তা বৃদ্ধি পায়। মারীপোকাকার সংখ্যা বাড়ে লাফিয়ে লাফিয়ে। তাদের ওপর কীটনাশক ছোটানো হলে তারা দ্রুত কীটনাশক-প্রতিরোধী হয়ে যায়। ফলে আরও শক্তিশালী, আরও বেশি মাত্রায় বিষ প্রয়োগ করতে হয়। কিন্তু এই মারীপোকাকারগুলির প্রাকৃতিক শিকারীগুলিও (natural predators) মাটি থেকে শেষ হয়ে যায়। মৌমাছি সহ পরাগমিলনে সাহায্যকারী অন্যান্য পতঙ্গরাও বিলুপ্ত হয় আর খাদ্যে বিষাক্ত বর্জ্যের মাত্রা মারাত্মকভাবে বেড়ে যায়। যেখানে আগে প্রকৃতিতে এসবই চলত সহজ স্বাভাবিকভাবে, সেখানে মানুষের চাতুর্যে কৃষকের ওপর কাজের বোঝা ও উদ্বেগ বেড়ে গেছে বহু গুণ।

ভারতে চাষিরা রাসায়নিক ব্যবহার শুরু করেছিল এই কারণে নয় যে তাদের ঐতিহ্যগত পদ্ধতিগুলি কার্যকর নয়, বরং এই কারণগুলির জন্য যে রাসায়নিকগুলির ওপর বিপুল ভরতুকি দেওয়া হত এবং সেগুলির ব্যবহারের দীর্ঘমেয়াদী কুপ্রভাবগুলি না জানিয়ে তাদের ব্যবহারে উৎসাহিত করা হতো। কৃষিতে ব্যবহার করার জন্য দেয় (inputs) জিনিসগুলি ক্রয় করার জন্য সহজলভ্য ব্যাঙ্ক ঋণ; দানাশস্য বাজারে বিক্রয়ে উৎসাহিত করার জন্য সহায়ক মূল্যে (support price) কিনে নেবার ব্যবস্থা — এগুলিও কৃষকদের কাছে গাজরের টোপ হিসাবে রাখা হত।

আয়তনে ও ওজনে নিরেট (compact) হওয়ায় রাসায়নিকগুলির ব্যবহার ছিল সুবিধাজনক। কিন্তু যেহেতু এই প্রযুক্তি ঐতিহ্যগত কৃষিকাজ থেকে সম্পূর্ণ আলাদা বা অচেনা, কখন কতটা রাসায়নিক ব্যবহার করতে হবে এ প্রশ্নে কোনোরকম সতর্কতা নেওয়া হত না। রাসায়নিকের প্যাকেটের গায়ে ক্ষুদ্র অক্ষরে যদি কিছু সতর্কতা বা ইঁশিয়ারির কথা লেখা থাকত, তা কেউ পড়ত না বা অগ্রাহ্য করত।

(এসবের ফলে) ক্ষুদ্রমেয়াদী আর্থিক বিবেচনা প্রাধান্য পেল, আর স্বাস্থ্যের ওপর এবং জীবনের সহায়তাকারী বুনিয়াদি ব্যবস্থাগুলি অবহেলিত হল।

ক্ষুদ্র-পুষ্টিগুলির নির্গমন (micro-nutrient Drain)

দীর্ঘদিন হল এটা জানা গেছে যে রাসায়নিকের সাহায্যে নিবিড় চাষের ফলে মাটিতে ক্ষুদ্র-পুষ্টিগুলির অভাব দেখা যাচ্ছে। এই ক্ষুদ্র-পুষ্টিগুলি হল জিংক, লোহা, তামা, ম্যাংগানিজ, ম্যাগনেসিয়াম, ক্যালসিয়াম, মলিবডেনাম এবং বোরন — এগুলি উদ্ভিদের বৃদ্ধিতে নানাবিধ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

উদাহরণ স্বরূপ পাঞ্জাবে ৪৭০৬টি সংগৃহীত মাটির নমুনা বিশ্লেষণ করে অর্ধেকের বেশি নমুনায় জিংক বা দস্তার অভাব লক্ষ্য করা গেছে। এর ফলে উল্লেখযোগ্যভাবে ফলন কমে যায়। কারণ জিংক উদ্ভিদের নাইট্রোজেন ও ফসফরাস ব্যবহার করার প্রক্রিয়াকে সাহায্য করে। আরও ক্ষতিকারক দিকটি হল (যা খালি চোখে দেখা যায় না) খাদ্যগুলির হ্রাস। ফলে মানুষের স্বাস্থ্য বিপন্ন হয়ে পড়ছে। চণ্ডীগড়ের পোস্টগ্রাজুয়েট ইনস্টিটিউট অফ মেডিক্যাল সায়েন্স-এর এক গবেষণা থেকে জানা গেছে যে জিংকের অভাব আছে এমন দানাশস্য খেলে শরীরের বৃদ্ধি ও যৌনতা বৃদ্ধিতে ক্ষতি হতে পারে; অভাব ঘটতে পারে কার্বোহাইড্রেট সহনশীলতায় এবং আঘাত সেরে ওঠার ক্ষেত্রেও বাধা সৃষ্টি হতে পারে।

আধুনিক ভূ-প্রযুক্তিবিদরা মাটির এইসব পুষ্টির অভাব পূরণ করতে পুষ্টিগুলিকে রাসায়নিক রূপে মাটিতে প্রয়োগ করার পরামর্শ দেয়। তবে তারা এটাও স্বীকার করে যে এইরূপ প্রয়োগের ফলে মাটিতে ও খাবারে বিষ জমতে পারে। এছাড়া কোনো ক্ষুদ্র-পুষ্টির অভাব যদি রাসায়নিক রূপে প্রয়োগ করে পূরণ করার চেষ্টা করা হয় তাতে অন্য ক্ষুদ্র-পুষ্টির অভাব ঘটতে পারে। কোনো কোনো স্থানে জিংকের প্রয়োগে লোহা ও ম্যাংগানিজের ঘাটতি দেখা গেছে। আবার অন্য কয়েকটি জায়গায় জিংকের অভাব পূরণ করতে গিয়ে তামা বা কপারের অভাব দেখা গেছে।

Only from healthy soil
will healthy plants grow

শুধুমাত্র সুস্থ মাটি থেকেই
বেড়ে উঠতে পারে সুস্থ গাছগাছালি

টাকা অর্থনীতির সাথে কৃষকরা বাঁধা পড়ে গেল। এমনকী তাদের জমি কৃষি রাসায়নিকে নেশাসক্ত হয়ে পড়ল। কৃষি হয়ে উঠল এক ঝঞ্ঝটপূর্ণ, ক্লান্তিকর ব্যাপার।

ভারতের কৃষি-খামারের অবনমনের (degradation) এক সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

এদেশে যুদ্ধের গর্ভজাত আধুনিক রাসায়নিক নিবিড় কৃষির (chemical intensive agriculture) ঐতিহাসিক আগ্রাসনের বয়স পাঁচ দশকের কম। কিন্তু এই সময়ের মধ্যেই তা ভয়ংকর ধ্বংসলীলা চালিয়েছে, এটা অনেকদিন ধরেই জানা ছিল যে মাটিতে কৃত্রিমভাবে নাইট্রোজেন জোগান দিতে অ্যামোনিয়া থেকে ইউরিয়া উৎপাদন করা যায়। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর, আমেরিকায় আঠারোটি নতুন অ্যামোনিয়া কারখানা — যেগুলি আদিতে বিস্ফোরক উৎপাদনের জন্য তৈরি করা হয়েছিল — সেগুলির অতিরিক্ত উৎপাদনসামগ্রী বিক্রির জন্য বেপরোয়াভাবে বিশ্ববাজারের প্রয়োজন পড়ল। পরবর্তীকালে বিশ্বজোড়া কৃষিযোগ্য মাটির ধ্বংসলীলা বিপুলভাবে বাড়ল।

এ ব্যাপারে কী ঘটতে চলেছে তার ঝঁশিয়ারি অনেক আগেই ১৯৩০ দশকে আমেরিকার বৃহৎ মন্দার সময়কালেই পাওয়া গিয়েছিল। এই সময়কার ভয়ংকর ধুলো-বাটিগুলি (Dust Bowels) হল অনেকাংশে মাটি ধ্বংস হয়ে যাওয়ার ফল। প্রায়শই এগুলি হয়েছিল বনভূমি উচ্ছেদ করে নিবিড় কৃষিকাজে বৃহৎ বাণিজ্যিকভাবে যথেষ্ট রাসায়নিক প্রয়োগের প্রথম দশকে।

ভারতে আমাদের খামারগুলি ও কৃষক সম্প্রদায়ের শোষণ শুরু হয়েছিল অনেক আগে ঔপনিবেশিক শাসনের যুগে, কৃষি-রাসায়নিকের আবির্ভাবের আগে থেকেই। বহু কৃষককে তাদের ঐতিহ্যগত মিশ্র চাষ ও ফসল আবর্তনের ব্যবস্থাকে পরিত্যাগ করতে বাধ্য করা হয়েছিল। তাদের সবচেয়ে উর্বর কৃষিজমিগুলিকে রপ্তানিযোগ্য বাণিজ্যিক ফসল, যেমন আফিম, তামাক, তুলো, নীল, চা, কফি উৎপাদনের জমিতে পরিণত করা হয়েছিল। এই জমিগুলিকে বিশ্রাম না দিয়ে তাদের অবিরাম বছরের পর বছর ব্যবহার করা হত বাণিজ্যিক ফসল উৎপাদন করতে।

জমিদারি ব্যবস্থা এবং তা থেকে ইংরেজ শাসকরা যে উচ্চহারে রাজস্ব আদায় করত, তার ফলে কৃষকদের জীবন দুঃখে ভরে গিয়েছিল। পুকুর, দীঘি — জলসম্পদের এইসব সামুদায়িক বা সামাজিক উৎসগুলি অবহেলিত হল। সেচ ব্যবস্থা ভেঙে পড়ল। কাঠের গুঁড়ির (timber) জন্য বিপুল সব

বনভূমিকে নিশ্চিহ্ন করা হল অথবা স্থানীয় অধিবাসীদের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য ‘সংরক্ষিত’ হিসাবের ঘোষণা করা হল। এর ফলে আশপাশের বিস্তৃত অঞ্চলের মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি করতে জঙ্গল থেকে যা কিছু দেওয়া হত তা কমে গেল।

ব্রিটিশরা ভারত ছাড়ার পর এবং দেশ ভাগের যন্ত্রণা যখন কিছুটা প্রশমিত হয়েছে, তখন ভারতীয় কৃষি আক্রমণের হাত থেকে ছাড় পেয়েছিল প্রায় বছর পনেরো। ভারতের প্রথম কৃষিমন্ত্রী কে এম মুন্সি গান্ধীর গ্রাম স্বরাজ বা গ্রামীণ স্ব-শাসন ও আত্মনির্ভরশীলতার দর্শনে উদ্বুদ্ধ হয়ে প্রতি গ্রাম ও জীব-অঞ্চলে (bio-region) পুষ্টি-চক্র (nutrients cycle) ও জল চক্রকে (Hydrological cycle) পুনরুদ্ধার করার অসামান্য গুরুত্বের ওপর জোর দিয়েছিলেন। সেটা ছিল ১৯৫১ সাল। ইতিমধ্যে জে সি কুমারপ্পা — গান্ধীর দ্বারা প্রভাবিত আর এক সুদূরপ্রসারী চিন্তক — ১৯৪৫ সালে ‘সুস্থায়ী অর্থনীতি’ (The Economy of Permanence) নামে একটি বই লিখে প্রকাশ করেছিলেন।

পরবর্তী দশ বছরে (১৯৫১-৬১) ভারতের কৃষি উৎপাদন স্থিরভাবে (steadily) বৃদ্ধি পেয়েছিল। এই উৎপাদনের বেশিরভাগটাই ভুক্ত হত গ্রামাঞ্চলে — সেখানকার মানুষ বিদেশি শাসনের দারিদ্র ও অভাব থেকে উঠে দাঁড়াচ্ছিল। তাড়াতাড়ি নষ্ট হয়ে যায় (perishable) এমন অসংখ্য খাদ্যের কিছু উদ্ভূত খামার থেকে বাজারে আসত। কিন্তু সেগুলি সংগ্রহ করে দূরবর্তী শহরের বাজারে পৌঁছানো ছিল প্রশাসনিক দিক দিয়ে অসুবিধাজনক। এটা যথেষ্ট পরিষ্কারভাবে বোঝা গিয়েছিল যে কৃষি রাসায়নিক ও শস্যের বার্ষিক প্রজাতির বিস্তৃত প্রসারের ঠিক আগের দশকে — ১৯৫০ দশক জুড়ে কৃষি উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা (প্রতি একর জমিতে ফলনের মাত্রা) — এই দুইই ছিল বেশি।

প্রথম যোজনাকালে (১৯৫১-৫৬) সমস্ত শস্যের মোট উৎপাদন চক্রবৃদ্ধি হারে গড়ে বেড়েছিল বছরে ৪.৯%, যেখানে চক্রবৃদ্ধি হারে মোট উৎপাদনশীলতার গড় বৃদ্ধি ছিল বছরে ১.৪%। দ্বিতীয় যোজনাকালে (১৯৫৬-৬১) অনুরূপ কৃষি উৎপাদনের গড় বৃদ্ধি ছিল বছরে ৩.১%। যেখানে উৎপাদনশীলতা বেড়েছিল বছরে ১.৮% হারে। তৃতীয় ও চতুর্থ যোজনাকালে (১৯৬১-১৯৭১) মিলিতভাবে মোট কৃষি উৎপাদনের তুলনীয় বৃদ্ধি ছিল বছরে ২% হারে, যেখানে উৎপাদনশীলতার বাৎসরিক বৃদ্ধির হার পড়ে গিয়ে হয়েছিল ১.৩%।

১৯৫০ দশকে ভারতীয় কৃষির প্রশংসনীয় পুনরুদ্ধার হলেও, জহরলাল নেহরুর শহর-শিল্পের (Urban-industrial) উন্নয়নের ধারাকে অনুসরণ করা সম্ভব ছিল, শুধুমাত্র যদি কৃষিজ উদ্বৃত্ত বিশেষ করে সহজে নষ্ট হয়ে যায় এমন সব প্রধান খাদ্যদ্রব্যগুলি শহরে আসত। সেই কারণে যোজনা কমিশনের কিছু সদস্য প্রস্তাব দিলেন যে কৃষি-খামারগুলিকে যদি রাসায়নিক ব্যবহারে আকৃষ্ট করা যায়, তাহলে তারা পরে এইগুলি কিনবার পয়সার জোগান পেতে বাজারে বিক্রি করা যায় এমন সব ফসল উৎপাদন করতে বাধ্য হবে।

নেহরুর মৃত্যুর পর লালবাহাদুর শাস্ত্রী কিছুকাল প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্বভার পালন করেন। ১৯৬৫ সালে মেক্সিকো থেকে ২৫০ টন বামন প্রজাতির গমের বীজ আমদানি করা হয়। এম এস স্বামীনাথনদের মতো টেকনোক্রাটরা বললেন যে এই বামন প্রজাতির বীজগুলির অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কারণ রাসায়নিক ব্যবহার করলে আমাদের দেশজ লম্বা প্রজাতির শস্যগুলির প্রবণতা হল মাথা ভারী হয়ে নুয়ে গিয়ে পড়ে যায় (lodge)। বোরলো — যিনি পৃথিবী জুড়ে সবুজ বিপ্লবের জনক বলে পরিচিত — তিনি ইতিমধ্যেই ১৯৬৩ সালে স্বামীনাথনের আমন্ত্রণে ভারতে এসেছিলেন।

রাসায়নিকের প্রয়োগ ও বামন প্রজাতির শস্যের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা নতুন কৃষিকে ত্যাগছাড়া করে ব্যাপক ভাবে গ্রহণ করায় বিপদ থাকতে পারে, এই মর্মে ঈশিয়ারি দিয়েছিলেন শাস্ত্রী। কিন্তু ১৯৬৬ সালে তাঁর রহস্যজনক মৃত্যুর পর এই বিদেশি প্রযুক্তির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ দুর্বল হয়ে পড়ে। আমেরিকান পরামর্শদাতা ও বিশেষজ্ঞগণ — এমনকী যোজনা কমিশনকে পাশ কাটিয়ে ভারতে তাদের কার্যক্রম লাগু করতে সক্ষম হল। সেই বছরই ভারত সরকার মেক্সিকো থেকে বিশাল পরিমাণ — ১৮ হাজার টন গমের (দুটি বামন প্রজাতির) বীজ আমদানি করে। সারা পৃথিবীতে একটি দেশ থেকে অন্য কোনো দেশে বীজের গমনের ইতিহাসে এটিই হল সর্বাধিক। রাসায়নিক আমদানির মাত্রাও তীব্রভাবেই বাড়তে লাগল ওই বছর থেকেই।

ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অব এগ্রিকালচারাল রিসার্চ (ICAR) দ্বারা প্রকাশিত ‘ভারতে কৃষির এক ইতিহাস’ গ্রন্থে এম এস রনধাওয়া লিখেছেন, “তৃতীয় যোজনায় রাসায়নিক সারের ব্যবহার বাড়ছিল স্থির ভাবে (steadily) এবং ১৯৬৬-৬৭ সালে এই বৃদ্ধির হার হল বিশাল, যা ছিল তার আগের বছরের চেয়ে ৬০% বেশি।” রনধাওয়া ছিলেন আইসিএআর-এর অবসরপ্রাপ্ত ভাইস প্রেসিডেন্ট। তিনি এই পদ্ধতিটির প্রসার ঘটিয়েছিলেন। অথচ ওই একই অনুচ্ছেদের শেষে তিনি আরও লিখেছিলেন, “যেহেতু (এই) শস্য উৎপাদনের

প্রযুক্তি রাসায়নিক সারের উত্তরোত্তর বেশি প্রয়োগের ওপর নির্ভরশীল, তাদের বাজারে জোগান ও চাহিদার মধ্যে যে ফারাক তা দিনে দিনে বাড়তেই থাকবে।”

ওই একই বইয়ে তিন পৃষ্ঠার পর একটি বার চার্ট-এর ছোট্ট নিরীহ পাদটীকায় (footnote) রনধাওয়া মন্তব্য করেছেন যে ১৯৭০ সালে ১ ব্যারেল তেলের দাম ছিল ১ ডলার ৮০ সেন্ট, যা ১৯৮০ সালে (১৩ গুণ বেড়ে) হয়েছিল ২৩ ডলার ৪১ সেন্ট, যা কৃষি-উৎপাদনের খরচ বিরাট পরিমাণ বাড়িয়ে দিয়েছিল। যেহেতু তেল একটি অ-নবীকরণযোগ্য সম্পদ, তার দাম বাড়তেই থাকবে। তাই সস্তা খাদ্যের স্বপ্ন শূন্যে মিলিয়ে গেছে।

১৯৭৩-এর অক্টোবর চাষিরা মোটেই সন্দেহ করতে পারেনি যে তাদের স্বল্পমেয়াদী কাঁচা টাকার রোজগার তাদের মূল পুঁজি খোদ জমির উর্বরতাকে খেয়ে ফেলছে। পাশাপাশি বাইরে থেকে কেনা সামগ্রী চাষের খেতে জোগান দেওয়ার ওপর নির্ভরশীলতাও বাড়িয়ে তুলছে। এক অর্থে তারা ভুল বুঝে ফাঁদে পড়ল। স্থির ভাবে (steadily) কৃষিকাজে উত্তরোত্তর খরচ বাড়তেই লাগল, প্রতি বছরে নতুন নতুন সমস্যা মাথা চাড়া দিতে লাগল, যাতে ভূমির ব্যাপক ক্ষতি ও গ্রামীণ দুর্দশা বৃদ্ধি পেল, বৃদ্ধি পেল ভূমির লবণাক্তকরণ, ভূমিক্ষয়, জলসংকট, শস্যনাশ — চাষিরা ঋণের ফাঁদে পড়ল এবং ব্যাপকভাবে আত্মহত্যার পথ বেছে নিল।

২৯-০৭-২০০৬ তারিখে স্বামীনাথনকে লেখা তার প্রথম চিঠিতে ভাস্কর সাভে ফসলের বৈচিত্র্য হ্রাসে সচেতন কারিগরি প্রয়াসের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। এই সচেতন কারিগরি প্রয়াসের ফলে আমাদের মাটিতে ঘটেছে জীব-ভরের (bio-mass) অভাব এবং আমাদের মাটি দিন-কে-দিন বন্ধ্যা হয়ে পড়ছে। তিনি লিখেছেন, “আমাদের শস্যগুলির অসংখ্য, লম্বা, দেশজ প্রজাতি হাজার হাজার বছর ধরে স্থানীয় পরিবেশ ও প্রয়োজনীয়তার সাথে খাপ খাইয়ে অনেক বেশি জীব-ভরের (bio-mass) জোগান দিয়েছে, মাটিকে সূর্যের আঘাত থেকে ঢেকে রেখেছে এবং ভারী বর্ষাঘের হাত থেকে রক্ষা করেছে। কিন্তু উৎপাদন বৃদ্ধির ছদ্মবেশে বিদেশি বামন প্রজাতিগুলি এদেশে ঢোকানো হল এবং তাদের প্রসার ঘটানো হল আপনাদেরই প্রচেষ্টায়।”

রাসায়নিক সার দ্বারা বৃদ্ধি করা এই বামনগুলি ‘মারীপোকা ও রোগ প্রবণ’ বলে কৃষি ক্ষেত্রে আরও বেশি বিষ (কীটনাশক) ঢালার দরজা খুলে দিল। কিন্তু আক্রান্ত কীট-প্রজাতিগুলি (বিষ) প্রতিরোধী হয়ে উঠল এবং দ্রুত সংখ্যা বৃদ্ধি করল। তাদের খাদক প্রাণীগুলি, যেমন মাকড়সা, সোনা

ব্যাঙ ইত্যাদি যারা এইসব কীট খেয়ে জৈব পদ্ধতিতে তাদের সংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করত — তারা এইসব বিষ প্রয়োগের ফলে নিশ্চিহ্ন হল। তেমনই নিশ্চিহ্ন হল কেঁচো, মৌমাছি ইত্যাদি অনেক উপকারি প্রজাতিগুলি।

কৃষি-ব্যবসায়ী ও টেকনোক্র্যাটরা আরও কড়া মাত্রায় বিষ ঢালার সুপারিশ করল; আরও নতুন, বিষাক্ত (এবং ব্যয়বহুল) রাসায়নিক ব্যবহৃত হতে লাগল। কিন্তু মারীপোকা ও রোগের সমস্যা আরও বাড়তে লাগল, এই পাকে পড়ে বাস্তুতান্ত্রিক আর্থিক ও মানবিক ক্ষতি আরও বাড়ল।

পরিবর্তন — দূরদৃষ্টির ফলে না বাধ্যবাধকতায়?

উর্বরতার প্রাকৃতিক চক্রটি ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। আজকের যুগে তা আমাদের বাধ্যতামূলকভাবে সারিয়ে তুলতে হবে। বড়ো বুশের ইরাক যুদ্ধ যদি আরও কয়েকমাস দীর্ঘায়িত হত, তাহলে হয়তো দ্রুততার সাথে আমরা আমাদের পথ শুধরে ফেলতে বাধ্য হতাম। জীবাশ্ম-জ্বালানির (ন্যাপথা সহ) দাম চূড়ান্ত বেড়েছিল আর সেখানে রয়ে গিয়েছিল অনেক মাস ধরে। ভারতের বিদেশি মুদ্রার ভাণ্ডার প্রায় শূন্যে নেমে এল। আর যেহেতু ভারতের বেশিরভাগ সার কারখানাগুলিতে ব্যবহৃত ন্যাপথার বিরাট অংশটিই উপসাগর থেকে আমদানি করতে হত, এটার ফল দাঁড়াত এদেশের বাজারে সারের যোগান ভয়ংকর ভাবে কমে যাওয়া এবং তার দাম দেশীয় বাজারে ভীষণভাবে বেড়ে যাওয়া।

স্বল্প মেয়াদে উৎপাদন কমে গেলেও এটা যদি সত্যিই ঘটত তাহলে তা হত ছদ্মবেশে আশীর্বাদ। সোভিয়েতের পতনের পর যখন আমেরিকা কিউবার ওপর অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞাকে দৃঢ়তর করেছিল, তা কিউবাকে বাধ্য করেছিল কার্যকরভাবে জৈবচাষে ঘুরে দাঁড়াতে এবং আত্মনির্ভরশীল সুস্থায়ী পথের শিক্ষা গ্রহণ করতে। কিন্তু বড়ো বুশ ইরাককে পিটিয়ে আত্মসমর্পণে বাধ্য করে এবং জীবাশ্ম জ্বালানির দাম কিছুদিনের জন্য পড়ে গিয়ে আবার বারংবার হেঁচকি তুলে ২০০৮-এর মাঝামাঝি তীব্রভাবে বেড়ে গেল।

পৃথিবী জুড়ে জীবাশ্ম-জ্বালানির ভাণ্ডার সুস্থিরভাবে ক্ষয়িষ্ণু আর তার চাহিদার বৃদ্ধি ঘটছে দ্রুতগতিতে। ফলে জ্বালানির দাম ও তার ফলশ্রুতিতে সারের দাম আবার নিশ্চিতভাবে বাড়বে, দেরিতে নয়, তা ঘটবে শীঘ্রই। আবহাওয়া পরিবর্তনের বাধ্যবাধকতায় এবং তার দুঃস্বপ্নের মতো ফলশ্রুতিগুলির জের জীবাশ্ম-জ্বালানি ও সারের দামের বৃদ্ধিকে অবশ্যম্ভাবী করে তুলবে।

ইত্যবসরে ভূমির উর্বরতা কমেই চলেছে। ভূমির উচ্চক্ষয় ও লবণাক্তকরণের

অন্তিম ক্ষেত্রগুলিতে — যেগুলি দিনে দিনে স্বাভাবিক ঘটনা হয়ে দাঁড়াচ্ছে — অতি উচ্চমাত্রায় কৃষি-রাসায়নিক ব্যবহার করেও মাটির পোট থেকে জোর করে বেশি ফলন বের করা সম্ভব হয় না। এটি নিশ্চিতভাবে এক পরাজয়ের পরিস্থিতি। এই পরিস্থিতিতে সুরাহার কার্যকর পদক্ষেপ নিতে যত দেরি হবে, ঘনায়মান সংকটগুলির মোকাবিলাও ততই কঠিন হয়ে পড়বে।

প্রাকৃতিক কৃষির ‘পূর্ব পদক্ষেপ’ হিসাবে জৈবকৃষি

ভাস্কর সাভে জোর দিয়ে বলেন যে উর্বরতা কমে গেছে এমন জমি পুনরুজ্জীবনের জন্য দেখতে হবে যাতে জমি থেকে বেরিয়ে যাওয়া কিংবা বিক্রি হওয়া জৈব দ্রব্যের পরিমাণ জমিতে বাইরে থেকে প্রয়োগ করা জৈব-ভরের (bio-mass) চেয়ে বেশি না হয়।

বরং তাঁর পরামর্শ হল যে শুরুতে ন্যূনতম খরচে হাতের কাছে পাওয়া যায় এমন জৈব বর্জ্য জমিতে বেশি করে ফেলতে হবে। সমস্ত রকমের নিবিড় জৈব পদার্থ — তাদের নির্দিষ্ট পুষ্টিমূল্য যাই হোক না কেন — তারা মাটিতে বাস করা জীব ও জীবাণুগুলির সংখ্যা বৃদ্ধি করতে পারে। এর ফলে মাটির ভেদ্যতা (Porosity) ও জলধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় ও গাছ-পাতা বৃদ্ধিতে দারুণভাবে সাহায্য করে।

কয়েক বছরের মধ্যে খামারে জৈব-ভর বৃদ্ধির সাথে সাথে মাটির স্বাস্থ্যের উন্নতি হয় আর তখন মাটি থেকে খাদ্য হিসাবে যতটা জৈব পদার্থ বেরিয়ে যায় ততটা জৈব পদার্থ জমিতে ফিরিয়ে দিলেই তা পূরণ করা যায়। আবার এর কয়েক বছর পরে এটাও আর তেমনভাবে প্রয়োজনীয় নয়, বিশেষ করে প্রাকৃতিক বনভূমির মতো একটি পরিণত প্রাকৃতিক বাগিচায়। অন্তত সমস্ত অ-খাদ্য জীব-ভর-ফসলের অবশিষ্ট অংশ ও পাতার আচ্ছাদন — এগুলি কিন্তু বিশেষ যত্ন সহকারে মাটিতে ফিরিয়ে দিতে হবে। সাথে দিতে হবে খামারে সৃষ্টি হওয়া সমস্ত পশু ও মানুষের বর্জ্য পদার্থ।

যে কৃষকরা রাসায়নিক পরিত্যাগ করছে তারা এই বাইরে থেকে কম মাত্রায় জোগানো দ্রব্যাদি (low external input) দিয়ে জৈব চাষ শুরু করতে পারে। যদি বুনিয়াদি দৃষ্টিভঙ্গীটা হয় অহিংস এবং প্রাকৃতিক যাবতীয় প্রক্রিয়ায় ন্যূনতম হস্তক্ষেপ। তবুও এটিকে প্রাকৃতিক চাষের এক অশুদ্ধ রূপ হিসাবে মনে করা যেতে পারে। তারপরে এই কৃষির শুদ্ধতর রূপ ‘কিছু না-করা’ (do-nothing) কৃষির অনুষীলনের কথা ভাবা যেতে পারে।

বিশেষত বৃক্ষ ফসলের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে বৃক্ষ যতই পরিণত হতে থাকে

ততই তারা আত্মনির্ভরশীল হয় আর তাদের জন্য বাইরে থেকে আমাদের আর কিছুই করার বা দেওয়ার প্রয়োজন হয় না। একজন ভালো চাষি, ভালো পিতা-মাতার মতো তার কচিকাঁচার জন্য উদ্বিগ্ন হতে পারে, কিন্তু সাথে সাথে তার এই বুদ্ধিরও প্রয়োজন যে গাছেরা (অথবা সন্তানরা) বেড়ে ওঠার সাথে সাথে ধীরে ধীরে নিজেদের দেখভাল করতে সক্ষম হয়ে ওঠে।

ভাস্কর সাভে আরও বলেন যে বছর্বর্ষজীবী গাছ-ফসলগুলির সবচেয়ে ভালো দেখভাল হয় বিশুদ্ধ ‘কিছু না-করা’ প্রাকৃতিক কৃষির দ্বারা। বাৎসরিক বা মরশুমি খেত-ফসলের ক্ষেত্রে সবসময় কিছু না কিছু নজর দেওয়া প্রয়োজন। এটি বিশেষভাবে সত্য আমাদের ত্রাণীয় জলবায়ু অঞ্চলে, যেখানে সারা বছরের বৃষ্টির বেশিরভাগটাই ঘনীভূত হয় বর্ষার ৩/৪ মাস জুড়ে। ফলে সারা বছর জুড়ে বিশাল ফাঁকা মাঠ প্রখর সূর্যের তাপে সঁকে শক্ত হয়ে যায়। এজন্য প্রতি বছর বীজ বুনবার আগে অন্তত অগভীর খননের (shallow tillage) প্রয়োজন হয়।

প্রাকৃতিক প্রাচুর্যের পুনরুদ্ধার

“প্রাকৃতিক উপায়ে কৃষিকাজ” গ্রন্থে বৌদ্ধ কৃষক ফুকুওকা জৈব খেতচাষকে হীনযান কৃষি বলে বর্ণনা করেছেন। হীনযান কথাটির আক্ষরিক অর্থ হল ‘ছোটো যান’। কিন্তু যোহেতু এই চাষ-ব্যবস্থা মাটিকে কতকগুলি মৃত রাসায়নিক পদার্থের সমষ্টি বলে মনে করে না, বরং মাটিকে এক সজীব, গতিশীল সত্তা বলে মনে করে, তা অজৈব ‘বৈজ্ঞানিক’ কৃষিকাজের চেয়ে অনেক উন্নত। ফুকুওকা লিখেছেন, “হীনযান জৈব কৃষিতে প্রকৃতির সঙ্গে সাযুজ্য খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা রয়েছে, যদিও তার সাথে সম্পূর্ণ মিলন এখন বাস্তবায়িত হয়নি”... কারণ জৈবচাষি এখনও খনন, আগাছা পরিষ্কার এবং বাইরে থেকে জৈব সারও প্রয়োগ করে।

কিন্তু ফুকুওকা বলেন, মহাযান (বড়ো যান) প্রাকৃতিক কৃষিতে মানুষের সত্তা, সমস্ত বিভেদ পরিহার করে প্রাকৃতিক ব্যবস্থার সাথে মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়। তিনি আরও বলেন, যারা এরকম জীবনযাপন করে, তারা বাস্তবিকই সন্ন্যাসী ও জ্ঞানী পুরুষ। এরকমই মানুষজন ছিলেন আমাদের ঋষিরা যাঁরা কাঁচাফল খেয়ে ও বনের ফসল সংগ্রহ করে বেশ স্বাস্থ্যসম্মতভাবে বনে বাস করতেন।

কৃষির আবির্ভাবের আগে পৃথিবীর অন্যান্য জীব-জন্তুদের মতো মানুষ তখনও তাদের চাহিদা মেটানোর জন্য যথেষ্ট খাবার পেত। দ্য গাইয়া

অ্যাটলাস অফ প্ল্যান্ট ম্যানেজমেন্ট-এর মতে পৃথিবীতে ভক্ষণ করা যায় এমন গাছ-গাছালির সংখ্যা হল আনুমানিক ৮০,০০০। এদের বেশিরভাগটাই হল অকৃষিজাত খাদ্য, প্রকৃতির দান, যেগুলি প্রকৃতিতে — সাধারণত বনাঞ্চলে — আপনিই বেড়ে ওঠে। যেজন্য সংগ্রহ করা ছাড়া আর কোনো মনুষ্যশ্রমের প্রয়োজন হয় না। এই ৮০,০০০ প্রজাতির মাত্র ১৫০টি বৃহদাকারে চাষ করা হয়। ভাবা যায়, এদের মধ্যে মাত্র ২০% প্রজাতি এখন ৯০% মানব-খাদ্যের জোগান দেয়!

ভারতে অনেক আদিবাসী, যারা জঙ্গলে বা জঙ্গলের কিনারায় বসবাস করে, তারা অসংখ্য বুনো ও অকৃষিজ গাছ-খাদ্য চেনে ও খায়। বনবাড়ি জঙ্গলের আদিবাসীরা বর্তমান লেখককে এমন তিন ডজন প্রজাতি অনায়াসেই চিনিয়েছিল। কিন্তু বনভূমির ধ্বংস বা বেড়া সৃষ্টির (enclosure) সঙ্গে সঙ্গে গাছ-গাছালির ঐতিহ্যগত জ্ঞান হারিয়ে যাচ্ছে। ফলে আমরা ক্রমাগত প্রকৃতির প্রাচীন সমৃদ্ধ ব্যবস্থা (order) থেকে দূর থেকে দূরে সরে যাচ্ছি। এখন আমাদের জরুরি প্রয়োজন হল সব কিছু সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়ে যাওয়ার আগে প্রকৃতির সঙ্গে সেই স্বাস্থ্যকর সম্বন্ধ ফিরিয়ে আনা।

বাণিজ্যিক জৈব চাষের সমস্যা

বর্তমান বাজারমুখী জৈব চাষে, বেশি আর্থিক লাভের জন্য বাইরে থেকে দেওয়া জৈবসারকে এক ধরনের কাঁচা মাল মনে করা হয়। এর বিপদ হল, জৈবসারগুলির ব্যাপক ব্যবহারের ফলে অন্য জমি সেইসব জৈব পদার্থ থেকে বঞ্চিত হয়। এর ফলে একটা ক্ষুদ্র শতাংশ চাষি যারা দাম দিয়ে জৈব সার/জৈব বর্জ্য কিনতে পারে, তারা গরিব চাষি ও সাধারণ জমির ক্ষতির বিনিময়ে লাভবান হয়।

জাপানের মতো দেশগুলিতে এটি ইতিমধ্যেই সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে। তাই ফুকুওকা এইরকম জৈব চাষকে (বাইরে থেকে প্রযুক্ত জৈবসারে চাষ করা) মনে করেন হীনযান — যা সবার মঙ্গল করতে পারে না। এছাড়া বহু বাণিজ্যিক জৈবচাষি ব্যাপকভাবে (দু)এক রকমের চাষ (monoculture) চালিয়ে যায় যাতে সহজে ফসল তুলে বিক্রি করা যায়। এর ফলে ক্ষুদ্র-পুষ্টির (micro-nutrients) অভাব, গাছের বিভিন্ন রোগ ও মারীপোকার আক্রমণ ইত্যাদি নানাবিধ সমস্যা দেখা দেয় — যেগুলি আবার চাষির অধিকতর হস্তক্ষেপ আদায় করে তাকে প্রাকৃতিক ব্যবস্থা (natural order) থেকে অনেক দূরে সরিয়ে নিয়ে যায়।

ভারতে সাম্প্রতিককালে বাণিজ্যিক জৈব চাষ উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। এটি ঘটেছে ১৯৯০ দশক থেকে, যখন সরকার এই চাষের প্রসারে সক্রিয়ভাবে বাঁপিয়ে পড়েছে। ব্যাপারটা এইজন্য নয় যে আমাদের জনসাধারণের বেশি করে স্বাস্থ্যকর খাবার খাওয়া উচিত, বরং এইজন্যে যে এখন ইউরোপীয় দেশগুলি ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আমাদের কাছ থেকে বিশ্বাসযোগ্য শংসাপত্র পাওয়া (certified) জৈব উপায়ে তৈরি খাদ্য কিনতে চাইছে। ওই দেশগুলিতে ক্রমাগত বেশি সংখ্যক মানুষ উপলব্ধি করছে যে জৈবচাষে উৎপাদিত খাদ্য স্বাস্থ্য (ও স্বাদের) দিক থেকে অনেক ভালো এবং তারা এই উন্নত গুণমানের জন্য অধিকতর মূল্য দিতে রাজি।

জি এম (Genetically Modified) বা জিন প্রযুক্তি দিয়ে বদলানো (modified) ফসল আরও সমস্যা ডেকে আনে।

অংশত কৃষি-রাসায়নিকের ব্যবহারের কুফল এবং সেগুলি যে আরও দীর্ঘদিন ব্যবহার করা সম্ভব নয় এই উপলব্ধি থেকে কৃষি-শিল্প (agro-industry) জীব-প্রযুক্তির (biotechnology) মধ্যে এক বাণিজ্যিক রাস্তা আবিষ্কার করেছে এবং সে পথটিকে কৃষকের নতুন রক্ষাকবচ বলে চালানোর চেষ্টা করছে। ভার্মিকালচার (কেঁচো সার), টিস্যু-কালচার, বিদেশী খাদক ও পরজীবী-প্রতিরোধক দ্বারা জৈব উপায়ে মারীপোকা নিয়ন্ত্রণ, নির্বাচিত অণু-জীবদের টীকাকরণ (inoculations of selectively bred micro-organisms) ও জিন বদল করা প্রজাতি — এগুলি চালু হয়েছে। এমনকী কৃষি-রাসায়নিক প্রতিষ্ঠানগুলির বিরাট সব স্থপতিরও এখন জীবপ্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান বা শিল্পগুলি চালাচ্ছে।

নতুন জীব-প্রযুক্তির (bio-technology) দাওয়াইগুলির জন্য সাধারণত প্রয়োজন বিপুল লব্ধি ও বাহ্যিক কৃৎকৌশল। যদিও তাতে আমাদের তাৎক্ষণিক (স্বল্পমেয়াদী) সুবিধার জন্য প্রকৃতির ওপর কারিগরির পুরোনো মানসিকতা পুরোমাত্রায় রয়ে গেছে। এটি প্রাকৃতিক চাষের মূল ভাবনা বা সত্তার পরিপন্থী। এই ভাবনা সংকীর্ণ দৃষ্টিসম্পন্ন প্রযুক্তি ক্ষেত্রটির বাইরে সর্বস্তরেই ক্ষতিকারক প্রভাব ফেলতে পারে।

তার নিজস্ব বিধানই এই জীব-কারিগরিবিদ্যার দৃষ্টিকোণটি অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। বিশেষত জিন বদলের ক্ষেত্রে — অবধারিতভাবে ক্ষুদ্র বাণিজ্যিক স্বার্থের কারণে — কয়েকটি সীমাবদ্ধ বৈশিষ্ট্যকে সামনে নিয়ে আসার চেষ্টা করা হচ্ছে, যেমন একটি বিরূপ-নাশকের বিরুদ্ধে (herbicide) এই বদল করা জিন কতখানি সহনশীল। কিন্তু এর ফলশ্রুতিতে কী বিশাল ক্ষতিকারক

প্রভাব পড়তে পারে সেগুলি না জেনেই তা করা হয়। এ প্রশ্নে সাভের মন্তব্য “প্রকৃতি তার বিশাল কর্মকাণ্ডে হাজার লক্ষ উৎপাদকদের মধ্য দিয়ে যে বিপুল সূক্ষ্ম ত্রিয়ার প্রতিক্রিয়ার কাজ করে চলে তা কার্যত দুর্জয় এবং তা উজ্জ্বলতম জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারদের পেশাগত উদ্বেগ ও জ্ঞানের সীমার অনেক বাইরে।”

মাসানোবু ফুকুওকা মন্তব্য করেছেন, “বিজ্ঞানের আয়ত্তাধীন প্রকৃতি হল ধ্বংসপ্রাপ্ত প্রকৃতির ভূত।” সাভে আরও বলেন, “জীবপ্রযুক্তিবিদদের হয়তো তাদের পৃষ্ঠপোষকদের নির্দেশে পরিষ্কার ভাবে নির্দিষ্ট কতকগুলি আর্থিক স্বার্থের কথা মনে রাখতে হয়, কিন্তু (প্রকৃতিতে) সেই সামগ্রিক ভারসাম্য যা বিপুল বৈচিত্র্যময় উপাদান ও শক্তিসমূহের সেই রহস্যময় ঐক্যতানে সকলের স্বাস্থ্যকে লালন করে, সেই ভারসাম্য সৃষ্টি করার কোনো চেষ্টার কথা তারা কল্পনাতেও আনতে পারে না।”

যেহেতু জিন-কারিগরিবিদ্যা আর তার শৈশবাবস্থায় নেই — যদিও সবে সে তা অতিক্রম করেছে — তার থেকে উদ্ভূত অনেক সমস্যা এখন পরিষ্কার ভাবে ফুটে উঠেছে। আন্তরিক কামনা এটাই যে আমাদের সভ্যতা যেন পারমাণবিক দানবের থেকেও বড়ো কোনো ফ্রাংকেনস্টাইনের জন্ম না দিয়ে ফেলে।

সাভে সওয়াল করেন, “যদি আমরা শুধুমাত্র এটা দেখতে সক্ষম হই যে হাজার লক্ষ বছর ধরে সময় পরীক্ষিত প্রকৃতি-সৃষ্ট প্রজাতিগুলির জিন কোডে কোনো কিছুরই অভাব নেই ... তাহলে আমরা উপলব্ধি করব যে আমাদের জীবনের ডিএনএ ফিতেকে বদল করার কোনো রকম প্রয়োজন নেই। আর সকলের মঙ্গলের জন্য আরও অনেক সুস্থ ও সুখকর পথ রয়ে গেছে।”

বস্তুত প্রকৃতি উদার হস্তে গড়ে তুলেছে এই বিস্ময়কর বৈচিত্র্য ও উৎপাদিকা শক্তি, যার সাক্ষ্য বহন করছে অপূর্ব সমৃদ্ধশালী ক্রান্তীয় বনভূমিগুলি। দূর্ভাগ্যবশত আধুনিক কৃষিতে টাকাই সব এবং এই কৃষি তার শিকড় থেকেই হিংসাত্মক। তা সমস্তরকম জীব ও গাছ-গাছালির প্রতি অসহিষ্ণু ও ধ্বংসাত্মক। তার একমাত্র লক্ষ্য হল (দু)এক ধরনের চাষে (monoculture) মাটিকে নিংড়ে নিয়ে ক্রমবর্ধমান বাজার ও মুনাফা।

ওয়েন্ডেল বেরি একজন অনুভূতিশীল চিন্তক, জৈবচাষি ও লেখক। তিনি বলেন “যখন আমরা আমাদের খাদ্য-উৎপাদনের পথ বদলাই, আমরা আমাদের খাদ্য, আমাদের মূল্যবোধ, আমাদের সমাজকেই বদলে ফেলি ...

প্রাকৃতিক চাষ আমাদের অসুস্থ সম্পর্কগুলি সারিয়ে তোলে।”

ভাস্কর সাভে আরও বলেন, “অহিংসা হল আমাদের সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক বিবর্তনের প্রধান চিহ্ন। শুধুমাত্র প্রাকৃতিক চাষের মাধ্যমে এটি অর্জন করা সম্ভব।”



ওরলি আদিবাসীদের সুস্থায়ী জীবন-সংস্কৃতি

সৃষ্টির অখণ্ডতা সংরক্ষিত রাখার ক্ষমতা হল ওরলি সভ্যতার এক মাপকাঠি। তাদের সংস্কৃতি আধ্যাত্মিক ও বস্তুগত, প্রাণী ও অপ্রাণীকে এক অখণ্ড সমগ্রতায় বেঁধে রেখেছে।

জঙ্গলে নানাবিধ গাছ-গাছালি ও জন্তু-জানোয়ারের সংরক্ষণ ওরলি সংস্কৃতির এক অচ্ছেদ্য অঙ্গ। তাদের অনেক গানের বিষয়বস্তুই হল এটি। তাদের বাদ্যযন্ত্রগুলি গাছের বিভিন্ন অংশ থেকে তৈরি করা হয়। প্রধান বাদ্যযন্ত্র তরপা তৈরি করা হয় শুকনো লাউ থেকে। ওরলি নৃত্যে সারা গ্রামের মানুষ হাতে হাত ধরে একসুরে এক তালে নাচে। তাদের কুঁড়ের মাটির দেওয়ালে বৃক্ষ বা উর্বরতার দেবী পালঘাটের ছবি আঁকা হল তাদের এক গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহ্য। যখনই কৃষিকাজে ও বাড়ি-ঘর তৈরিতে প্রয়োজন হয়, তখনই তারা একে অন্যের জন্য বিনা পয়সায় শ্রম দেয়। এভাবেই তারা শ্রমের বিভাজনের দ্বারা অর্থনৈতিক শ্রেণী বিভাজনকে এড়িয়ে চলে।

ওরলি সমাজে কোনো অবাঞ্ছিত শিশু নেই। শিশুরা যারা তাদের পিতামাতাকে হারিয়েছে অথবা কুমারী মায়ের গর্ভজাত — তাদের সকলকেই সমাজ স্নেহ ও ভালবাসা দিয়ে গ্রহণ করে। খাবারের অভাব ঘটলে প্রাপ্তবয়স্করা না খেয়ে থাকে। কিন্তু শিশুদের আগে খাওয়ানো হয়। শান্তির প্রশ্নে সন্তানরা পিতামাতা বা অভিভাবকদের প্রশ্রয় পায়। কারণ তাদের কাছে শিশুদের শান্তি দেওয়া হল বর্বরতা। আর ওরলিদের মধ্যে কোনো ভিখারি নেই।

ওরলিরা সাধারণত পুষ্টিগতভাবে সম্পূর্ণ খাবার গ্রহণ করে। ঐতিহ্যগত খাদ্যাভাসে তারা তাদের তৈরি জৈব ফসল ছাড়াও স্থানীয়ভাবে পাওয়া যায় এমন শ-খানেক ভক্ষণযোগ্য বুনো গাছ-গাছালি খেত। তাছাড়া ছিল মাছ, কাঁকড়া, ডিম ... (নুন ছাড়া তাদের প্রায় কোনো কিছুই কিনতে হত না)।

তারা দুধ খায় না। দুধ বাছুরের জন্য রেখে দেওয়া হয়। কারণ তারা মনে করে গরুর দুধের অধিকার বাছুরের, তাদের নয়। গরু বুড়ো হয়ে গেলে তাদের কাটবার জন্য বিক্রি করা হয় না, বরং বুড়ো বয়সে যেন তারা অবকাশের

মুক্তজীবন যাপন করতে পারে, সেজন্য তাদের ছেড়ে রাখা হয়।

ওরলিদের জ্ঞানভাণ্ডারটি বিশাল। এই জ্ঞান অসংখ্য প্রজন্ম পরম্পরায় প্রবাহিত হয় মুখে মুখে। একটি বারো বছরের ওরলি বালক গড়পড়তা অন্তত একশোটির বেশি বিরুণ (herbs) গুল্ম (shrubs), লতা ও বৃক্ষের নাম ও তাদের বিবিধ ব্যবহার জানে।

ওরলিদের জ্ঞানভাণ্ডারটি বিশাল। এই জ্ঞান অসংখ্য প্রজন্ম পরম্পরায় প্রবাহিত হয় মুখে মুখে। একটি বারো বছরের ওরলি বালক গড়পড়তা অন্তত একশোটির বেশি বিরুণ (herbs) গুল্ম (shrubs), লতা ও বৃক্ষের নাম ও তাদের বিবিধ ব্যবহার জানে।



- ১। Ashok Sanghavi, 'The Way to Health, Wealth and Happiness on Bhaskar Save, 2004, pg. 55.
- ২। Wininin Pereira, 'Asking the Earth', The other India Press, 1992, also Published as an independent essay, 'The Sustainable Lifestyle of the Worlis', Earthcare Books, 2010.
- ৩। পূর্বে উল্লেখিত,
- ৪। ডঃ জীবনজী মোদিদের মত গবেষকদের মতে পাসীরা ভারতে পৌঁছেছিল ৭৮৫ খ্রিস্টাব্দে —এই মন্তব্যটি করেছেন এইচ.ই.এডুলজী তার পাসী থেকে ইংরাজিতে অনূদিত 'কিস্-সে-ই-সনজন' বইটির মুখবন্ধে।
- ৫। বছরের শুখা আট মাস জুড়ে ভাস্কর ভাইয়ের বাবা প্রধান্ত গরুর গাড়ি করে খামার ও বনভূমির ফসল পরিবহনের কাজ করতেন।
- ৬। Ashok Sanghavi, op cit pg. 61-62
- ৭। পূর্বে উল্লেখিত, পৃষ্ঠা ৬৪।
- ৮। ভাস্কর সাতে বলেন যে এই আধা-বামন প্রজাতির ধাঁ হবিশচন্দ্র গোপাল পাতিল এনেছিল জাপান থেকে। সেখানে তিনি গিয়েছিলেন ১৯৫১-১৯৫২ সালে। সাধারণত বোরলো ও তার সহযোগীদের কৃতিত্ব স্বীকার করা হয় এই বলে যে তারা রাসায়নিক-সংবেদী বামন প্রজাতির গমের চাষের পথপ্রদর্শক। কিন্তু ঐতিহাসিক ঘটনা হল এটিই যে জাপানীরাই হল প্রথম যারা গম ও চালের উভয়েরই বেঁটে প্রজাতির নির্বাচন করে তা কার্যে রূপায়িত করার কৌশল (Strategy) লাগু করতে শুরু করেছিল এবং তাতে রাসায়নিক ব্যবহার করেও গম ও চালের প্রজাতির শীর্ষ মাথা ভারী হয়ে বুলে (lodge) পড়ত না। এটা ঠিক দ্য রকফেলার ও ফোর্ড ফাউন্ডেশন, বোরলো, স্বামীনাথন, আই.আর.আর.আই. এই ধারনাকে অন্যান্য দেশে ব্যাপক ভাবে প্রসার ঘটিয়েছিল। কিন্তু তারা যে বামন বা আধাবামন প্রজাতির 'গম ও ধানকে উন্নীত করেছিলেন এবং বিস্তারিত ভাবে প্রসার করেছিলেন তাদের বেশির ভাগ প্রজাতিই তারা জাপানী নবীন প্রজাতিগুলি থেকেই সংগ্রহ করেছিলেন।
- ৯। Ashok Sanghavi, op cit pg. 65.
- ১০। পূর্বে উল্লেখিত, পৃষ্ঠা ৬৫-৬৬।
- ১১। পূর্বে উল্লেখিত পৃষ্ঠা -৭৪।
- ১২। Report of India's National Commission on Farmers, 2006.
- ১৩। 'Tending the Earth', Traditional Sustainable Agricul-

- ture in India by Winin Pereira, Earthcare Books, 1993; reprinted 2009.
- ১৪। Agricole's 1986 reprint of Voelcker's Report, pg.11.
- ১৫। 'An Agricultural Testament' by Sir Albert Howard, 1940; Indian reprint published by Earthcare Books, 2006, pg.10.
- ১৬। Ashok Sanghavi, op cit pg. 80-81.
- ১৭। পূর্বে উল্লেখিত পৃষ্ঠা, ৮৪।
- ১৮। শুরুতে ভাস্করভাই তার ধাঁ জমিতে ছোট ছোট খন্ড জমিতে (plots) ভাগ করে নিলেন। প্রতি খন্ড জমির সর্বোচ্চ এলাকা হল আধ একর বা দেড় বিঘা। এই খন্ড জমিগুলির মধ্যে তিনি মাটির বাঁধ তৈরি করলেন এবং তাদের মাঝখানে বিভিন্ন শাকসব্জীর চাষ করলেন তার পরিকল্পনা ছিল যে নারকেল ও সরেদার চারাগুলি ভালভাবে বেড়ে ওঠার পর তারা তাদের মূল ছড়িয়ে দেবে আর এই বাঁধকে দুইদিক থেকে বেশি মাটিসহ শক্ত করে বেধে রাখবে আর এভাবে মঞ্ছের (Platform) মত বাঁধগুলি বিস্তৃতি পাবে। (Ashok Sanghavi, op cit pg. 89-90.)
- ১৯। 'The Violence of Green Revolution' by Vandana Shiva, 1989, pg. 77
- ২০। ২৭-০৯-৫১ তারিখে একটি সেমিনারে কে.এম.মুন্সী (তখনকার কেন্দ্রীয় কৃষি মন্ত্রী) উপস্থিত সমস্ত রাজ্য কৃষি আধিকারিকদের (Direcitors of Agriculture) তাদের দায়িত্বে থাকা প্রতিটি গ্রামের জলচক্র ও (মাটির) পুষ্টি চক্রকে পুনরুদ্ধার করার পরামর্শ দিয়েছিলেন। ('The Violence of Green Revolution' by Vandana Shiva, 1989, pg. 77)
- ২১। 'Handbook of Agriculture', Indian Council of Agricultural Research (ICAR), 1987, pg.105, 'Table Compound Rates of Growth in Production and Productivity for all crops'.
- ২২। 'The Green Revolution': A Historical Perspectice', Readings from the PPST Bulletin, Madras.
- ২৩। 'A History of Agriculture in India', by M.S. Randhawa, Indian Council of Agricultural Research, 1986, vol.4, pg.370.
- ২৪। পূর্বে উল্লেখিত পৃষ্ঠা -৭৪।
- ২৫। ('The Violence of Green Revolution' by Vandana Shiva, 1989, pg.8.

২৬। `A History of Agriculture in India`, op.cit.pg.370.
 ২৭। `Organic Revolution` The Agricultural Transformation of Cuba since 1990`, Bharat Mansata, Earthcare Books, 2008.
 ২৮। `The Natural Way of Farming` by Masanobu Fukuoka, Japan Publications, 1985, pg.93-95 (An Indian edition, 1993 has been published by Bookventure)
 ২৯। `The Gaia Atlas of Planet Management`, edited by Norman Myers, Pan Books, 1985, pg.156.
 ৩০। Ibid, pg.156.
 ৩১। অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী যোজনায় ভারতে কৃষি রপ্তানিতে ৩০০% বৃদ্ধি লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত হয়েছিল। কে.এল. চাড্ডা, ডেপুটি ডিরেক্টর জেলায় (হাটিকালচার) ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ এগ্রিকালচারাল রিসার্চ, `দ্য হিন্দু সার্ভে অফ ইন্ডিয়ান এগ্রিকালচার, ১৯৯৪, ১১১ পৃষ্ঠায় লিখেছেন, “জৈবচাষে সৃষ্ট বিভিন্ন ফল শাক-সব্জী ও তাদের বিবিধ উতপন্ন দ্রব্যের রপ্তানি বাজারে ভাল ভবিষ্যত আছে। তাদের রপ্তানি বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন পরিকল্পনা লাগু করা হয়েছে। এগুলির মধ্যে রয়েছে সুবিধা প্রাপকদের (benefisiaries) জন্য নিম্নলিখিত আর্থিক সহায়তা (এই সুবিধা প্রাপকরা হলেন, উৎপাদক, রপ্তানীকারী, উদ্যোগী)
 উদ্যোগটি লাভজনক হবে কিনা তা অধ্যয়নের feasibility study) জন্য ২ লক্ষ টাকা পর্যন্ত; উৎপাদিত দ্রব্যাদি সংক্রান্ত লেখা-জোকা (literature) প্রস্তুতির জন্য সর্বোচ্চ ১ লক্ষ টাকা পর্যন্ত, বিশেষ পরিবহনকারী গাড়ী কেনার জন্য ১.৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত, রপ্তানি প্রসারের জন্য ১০,০০০০০ টাকা পর্যন্ত, প্যাকেজিং এর উন্নতির জন্য ১ লক্ষ টাকা পর্যন্ত, গুণমানের উন্নতির জন্য ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত, ফসল তোলার পর তার নাড়াচাড়ার উন্নয়নকল্পে ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত, প্রতিটি সুবিধাভোগীদের জন্য আর্থিক সহায়তা হল তাই ১৬.৫ লক্ষ টাকা। (অবশ্য খামারে যারা কাজ করে ফসল ফলান তাদের আর্থিক সহায়তার কোন কথা সেখানে নেই, নেই সার ও চারা কিনবার জন্য কোন সহায়তার কথাও। শুধুমাত্র ঘটনাক্রমে কিছু ছায়া কার্যই shadow work সরকারি সহায়তার যোগ্য বলে বিবেচিত হয়।)
 ৩২। সাধারণত কিনি আনা বিদেশী প্রজাতির কেঁচো ও অণুজীবরা...স্থানীয় অঞ্চলের সাথে খাপ খাওয়াতে পারে না, তাই টিকে থাকতেও পারে না। ফলে চাষির লোকসান হয়। কারিগরী সমাধানগুলি নিকৃষ্টতর, জৈবভাবে

মারীপোকা নিয়ন্ত্রণের জন্য যদি কোথাও বিদেশী প্রজাতির খাদক (Predator) বা প্যারাসিটয়েডদের এনে ছাড়া হয়, দেখা যায় তারই সংখ্যায় ভীষণভাবে বৃদ্ধি পেয়ে, পুরোন সমস্যার বদলে নতুন সমস্যার জন্ম দেয়। জিনেকারীগরী বিদ্যার দ্বারা বদলানো প্রজাতির ক্ষেত্রে সমস্যাটি আরো বহুগুণ বৃদ্ধি পায়।
 ৩৩। Wendell Berry, in his preface (মুখবন্ধে) to Fukuoka's `The One Straw Revolution`, 1978, Rodale Press.

সজীব মিত্র :
পতঙ্গ, মারীপোকা নয়



সজীব মিত্র : পতঙ্গ, মারীপোকা নয়

“বার্তাবাহককে গুলি কোরো না”। এটা অবশ্যই কাণ্ডজ্ঞান। তবুও আমরা প্রায়শই সমস্যাটির মূলে না গিয়ে লক্ষণগুলিকেই সমস্যা বলে মনে করি। কোনো খামারে ফসল-খাদক পতঙ্গের আক্রমণ বৃদ্ধি পেলে আমরা এরকমই মনে করি। যারা সমস্যাগুলি খুঁটিয়ে বুঝতে চায়, তাদের জন্য এটি একটি বার্তা বহন করে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত আধুনিক ‘ম্যাচো’ প্রবৃত্তিতে মনে হয় — “যা তুমি দেখতে চাও না তাকে প্রচণ্ড আঘাত কর।”

যদিও ফসল-খাদক পোকা সহ অসংখ্য পোকা কল্লবৃক্ষে পাওয়া যায়, তাদের মাত্রা কখনও সমস্যা সৃষ্টি করে না, খামারের ফলনের বৃদ্ধি ঘটে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে। মাটিতে পাতাপচা ও উদ্ভিজ্জসার (humus) এখানে বেড়ে ওঠা গাছ-পালাদের স্বাস্থ্য ও শক্তি দেয়। সে কারণেই এখানের গাছ-পালারা সংশ্লেষিত বা কৃত্রিম সারে বেড়ে ওঠা গাছ-পালাদের মতো ‘রোগে’ বা মারীপোকায় আক্রান্ত হয় অনেক কম।

শুধুমাত্র অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতেই ফসল-খাদক পোকাদের কিছু প্রজাতি অনিয়ন্ত্রিতভাবে বেড়ে ওঠে ও চাষির মাঠে সর্বনাশ ঘটায়। সেক্ষেত্রে দ্রুত বিষ না ঢেলে বিষয়টিকে এভাবেই মনে করা উচিত যে মারীপোকার বৃদ্ধিতে প্রকৃতি সংকেত দিচ্ছে যে গাছের স্বাস্থ্যে কোথাও কিছু একটা গলদ রয়েছে। এর মূল কারণ হিসাবে সাধারণত খুঁজে পাওয়া যায় যে ফসল নির্বাচন ও চাষের পদ্ধতিতে গলদ রয়েছে।

কৃষি-শিল্প (agro-industry) দ্বারা বৃহৎভাবে সরবরাহ করা বাজারে পাওয়া যায় এমন সব বীজগুলির বেশিরভাগই এক অর্থে অপ্রাকৃতিক বা কৃত্রিম। বিশেষত গম ও চালের ক্ষেত্রে ‘সবুজ বিপ্লবে’র বামন প্রজাতিগুলি এমনভাবে তৈরি করা হয়েছিল যাতে তারা বেশি মাত্রায় জোগানো রাসায়নিক

সারকে সহ্য করতে পারে এবং সর্বাপেক্ষা অনুকূল নির্দিষ্ট কিছু পরিস্থিতিতে (optimal conditions) বেড়ে উঠতে পারে। কিন্তু যেহেতু এই ধরনের ফসলগুলির জিনগত ভিত্তি সংকীর্ণ এবং খামারে যে বাস্তব পরিবেশ পরিস্থিতিতে তারা বেড়ে ওঠে সেগুলি বিপুল বৈচিত্র্যে ভরা, সেহেতু এদের মধ্যে ভারসাম্যপূর্ণ প্রাকৃতিক বৃদ্ধি এবং স্থানিক পরিবেশের সাথে খাপ খাওয়ানোর অভাব দেখা যায়।

নাইট্রোজেন-জাত সারের ব্যবহার হয়তো স্বল্পমেয়াদে ফলনের পরিমাণ বাড়াতে পারে, কিন্তু গাছের বৃদ্ধির সঙ্গে তাল দিয়ে যথেষ্ট পরিমাণে অন্যান্য খনিজ ও অণুখাদ্য সরবরাহে এবং রোগ পোকার আক্রমণ থেকে রক্ষার কাজে অক্ষম হয়ে পড়তে পারে।

কিন্তু মাটিতে যদি যথেষ্ট পরিমাণ পাতাপচা বা উদ্ভিজ্জ সার (humus) থাকে, তাহলে গাছ তার প্রয়োজন অনুসারে মাটি থেকে প্রচুর পরিমাণে বৈচিত্র্যময় পুষ্টি সংগ্রহ করতে পারে। গাছের স্বাস্থ্যের জন্য মাটির যেসব গুণগুলি অত্যন্ত প্রয়োজন যেমন ছিদ্রময়তা (Porosity), বায়ু চলাচল (aeration), আর্দ্রতা বা জলীয়বাষ্প শোষণ করার ক্ষমতা ও জল-নিকাশের ক্ষমতা (drainage) ইত্যাদি গুণগুলি উদ্ভিজ্জসার মাটিকে প্রদান করে। মাটির এইসব অবস্থা বা গুণগুলি কৃষি-রাসায়নিকগুলির দ্বারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। এই ধ্বংসলীলায় প্রথমে তারা উদ্ভিজ্জসার (humus) ও মাটির জৈব-জীবন ধ্বংস করে, যার ফলশ্রুতিতে পূর্বে উল্লেখিত মাটির গুণগুলি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। এর ফলে ফসল দুর্বল ও রোগপ্রবণ হয়ে পড়ে।

রাসায়নিক সারগুলি আরও প্রত্যক্ষভাবে কয়েক ধরনের নির্বাচিত খনিজগুলিকে দেয় অত্যন্ত বেশি মাত্রায় — যে অতিরিক্ত মাত্রায় খনিজের ঘনত্বকে কমাতে উদ্ভিদ/গাছ মাটি থেকে আরও বেশি মাত্রায় জলীয় বাষ্প শোষণ করে। এর ফলে গাছের কোষগুলি স্থগীত হয় এবং কোষ-প্রাচীরগুলিও পাতলা হয়ে যায়। এগুলির সম্মিলিত প্রভাবে এবং তাদের বৃদ্ধির ভারসাম্যহীনতায় গাছগুলি সহজেই বিভিন্ন কীট-পোকা ও জীবাণুর আক্রমণের শিকার হয়ে পড়ে।

সমস্যাটি সবচেয়ে খারাপ অবস্থায় পৌঁছায় যখন মাঠে মাঠে (দু)এক রকমের প্রজাতির চাষ (monoculture) করা হয় — যে অভ্যাসটি দিন-কে-দিন বেড়েই চলেছে। এই দু(এক) ধরনের চাষে ‘মারীপোকাগুলিকে’ বিভিন্ন গাছের মধ্যে তাদের প্রিয় গাছগুলিকে খুঁজে বেড়াতে হয় না। তারা মাঠের যে কোনো দিক থেকে যে কোন দিকে ভোজন করতে করতে এগিয়ে যেতে পারে। এরকম এক পরিস্থিতিতে কীট-মারীপোকা খুব দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পায় এবং বুনো আগুনের মতো ছড়িয়ে পড়ে। এর ঠিক বিপরীত

পদ্ধতিটি হল মিশ্র চাষ (mixed farming) এবং ফসলের আবর্তন (rotation) বা বিভিন্ন ফসল ঘুরিয়ে ফিরিয়ে চাষ করা। এগুলির সাথে যদি মাটির ব্যবহারের জৈব ব্যবস্থা (organic soil management) করা হয়, তাহলে তা সম্ভাব্য কীট-মারীপোকাদের অস্বাভাবিক ভাবে বৃদ্ধির হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার সবচেয়ে ভালো পথ।

(দু)এক ধরনের চাষের সমস্ত গাছের একই ধরনের পুষ্টির প্রয়োজন। সেকারণেই একই মাঠে যদি বছরের পর বছর মরসুমি আবর্তন (seasonal rotation), মিশ্রচাষ (mixed cropping), মাটিকে ফেলে রেখে বিশ্রাম দেওয়া (following), ইত্যাদি ছাড়াই ক্রমাগত একই রকমের ফসলের চাষ করা হয়, তাহলে কিন্তু যে পুষ্টিগুলি (nutrients), গাছের পক্ষে বেশি প্রয়োজন সেগুলি মাটি থেকে নিঃশেষিত হয়, বিশেষত যেখানে ফসলের অবশিষ্ট অংশ মাটিতে ফিরিয়ে দেওয়া হয় না, সেখানে এটি ঘটে আরও প্রকট ভাবে। এর ফলে মাটির এই অক্ষমতা গাছের ভারসাম্যহীন বৃদ্ধিকে বাড়িয়ে তোলে, গাছ দুর্বল হয়ে পড়ে এবং সহজে রোগ ও পোকাকার আক্রমণের শিকার হয়।

মিশ্রচাষ বা মরসুমি আবর্তনের ক্ষেত্রে (seasonal rotation) প্রতিটি প্রজাতির উদ্ভিদের জন্য খনিজ পুষ্টির প্রয়োজনীয় আপেক্ষিক মাত্রা ভিন্ন। প্রায়শই গাছের মূলগুলি কত গভীরে কতটা বিস্তৃত তার তারতম্য অনুযায়ী এই খনিজগুলি মাটির বিভিন্ন স্তর থেকে আহরিত হয়। ফসলের অবশিষ্ট অংশ মাটিতে ফিরিয়ে দিলে মাটিতে পুষ্টির অভাব ঘটানোর কারণ থাকে না। বৈচিত্র্যময় গাছ-গাছালির পরিবেশ যেসব প্রাকৃতিক শিকারীদের লালন করে, তারা কীট-পোকাকার অনিয়ন্ত্রিত বৃদ্ধিতে প্রাকৃতিক প্রতিবন্ধকের কাজ করে।

ছদ্মবেশে আশীর্বাদ

“আজকাল চাষিরা তাদের ফসলে পোকামাকড় দেখলে অত্যন্ত পীড়িত হয়ে পড়ে। কল্পবৃক্ষেও এমন সব পোকামাকড় আছে, আমাদের খাবার অথবা বিক্রির জন্য আমরা যে ফসল ফলাই সেগুলি তারা খায়। কিন্তু তাতে আমি মোটেই বিচলিত হই না। এটাও কার্যত আমরা যে ফসল তুলি তার গুণ ও পরিমাণ বৃদ্ধিতে সহায়ক।”

এর ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে ভাস্করভাই একটি তুলনা দিলেন। একটি বাগিচা-খামারে যে গাছগুলি খুব কাছাকাছি পৌঁতা হয় সেগুলির মাথায় পাতার চাঁদোয়া যখন একে অপরকে জড়িয়ে ধরে, তখন গাছগুলিতে পর্যাপ্ত সূর্যালোকের অভাব ঘটে। সেখানে চাষি গাছের কয়েকটি শাখা কেটে দিতে পারে। এতে

অন্যান্য শাখাগুলিতে বেশি মাত্রায় সালোকসংশ্লেষ ঘটতে পারে, ফলে ফলনও ভালো হতে পারে।

তেমনি পোকারা কোনো গাছকে বা গাছের কোনো অংশ যা পচে যাচ্ছে বা সূর্যের আলো কম পাচ্ছে — এমন দুর্বল অংশ খেতে থাকে। তারা তাদের শরীর-জাত বর্জ্য পদার্থ মাটিতে ফেরত দেওয়ার মাধ্যমে (যা খাওয়া হয়েছে) সেই ক্ষতি পূরণ করে। গাছের স্বাস্থ্যকর অংশগুলি আরও বেশি সূর্যালোক ও পুষ্টি পায়, ফলে ফলনও বাড়ে।

ফসলভুক পোকারা তাই একটা সময় জুড়ে গাছের প্রজাতির উন্নতি সাধনে সাহায্য করে। একজন ধানচাষি যেমন তার সেরা বীজটা না খেয়ে পরের বছরগুলিতে বপনের জন্য বাঁচিয়ে রাখে, তেমনি পোকারাও বীজের প্রাকৃতিক নির্বাচনের প্রক্রিয়াকে সাহায্য করে। তারা দুর্বল গাছগুলিকে খায় এবং তেজী স্বাস্থ্যবান গাছগুলিকে ছোঁয় না, যাতে তারা প্রতি ফসল চক্রে তেজী থেকে আরও তেজী হয়ে ওঠে এবং আরও বেশি বৃদ্ধি পায়।

জৈব নিয়ন্ত্রণ (Biological control)

একজন কৃষক ভাস্করভাইকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন ক্ষতিসাধন করার ক্ষমতা আছে এমন পোকা তাঁর খামারে থাকলেও তিনি কী করে জানতে পারেন যে ওই পোকা অনিয়ন্ত্রিত ভাবে বৃদ্ধি পেয়ে তাঁর খামারটিকে শেষ করে দিতে পারবে না। সাভে বললেন, “একটা সাধারণ ‘পোকা’, ধরুন ‘ইদুর’ — আমাদের কল্পবৃক্ষে সব সময় কিছু ইদুর থাকে, কিন্তু এত বছর ধরে কখনই তারা সংখ্যায় খুব বেশি বাড়েনি ...

“এর কারণ হল প্রকৃতিতে জটিল খাদ্যচক্র জৈব নিয়ন্ত্রণের একটি প্রাকৃতিক প্রক্রিয়া ক্রমাগত কাজ করে চলেছে। খামারে থাকা বিভিন্ন ধরনের



জীব জীবস্য জীবনাম
জীবন নির্ভর করে জীবনের ওপর

খাদক-প্রজাতি সম্ভাব্য ক্ষতিকারক পোকাগুলিকে খেয়ে তাদের সংখ্যাকে খুব বেশি বাড়তে দেয় না।” সাভে উদাহরণ দিয়ে বললেন যে প্যাঁচা,

সাপ, বেজি, বনবিড়াল, এমনকী লাল পিপড়ে (বড়ো ধরনের মাংসাশী লাল পিপড়ে) ইত্যাদিরা প্রাকৃতিক এজেন্ট হিসাবে ইঁদুরের সীমাহীন বৃদ্ধিকে নিয়ন্ত্রণ করে।

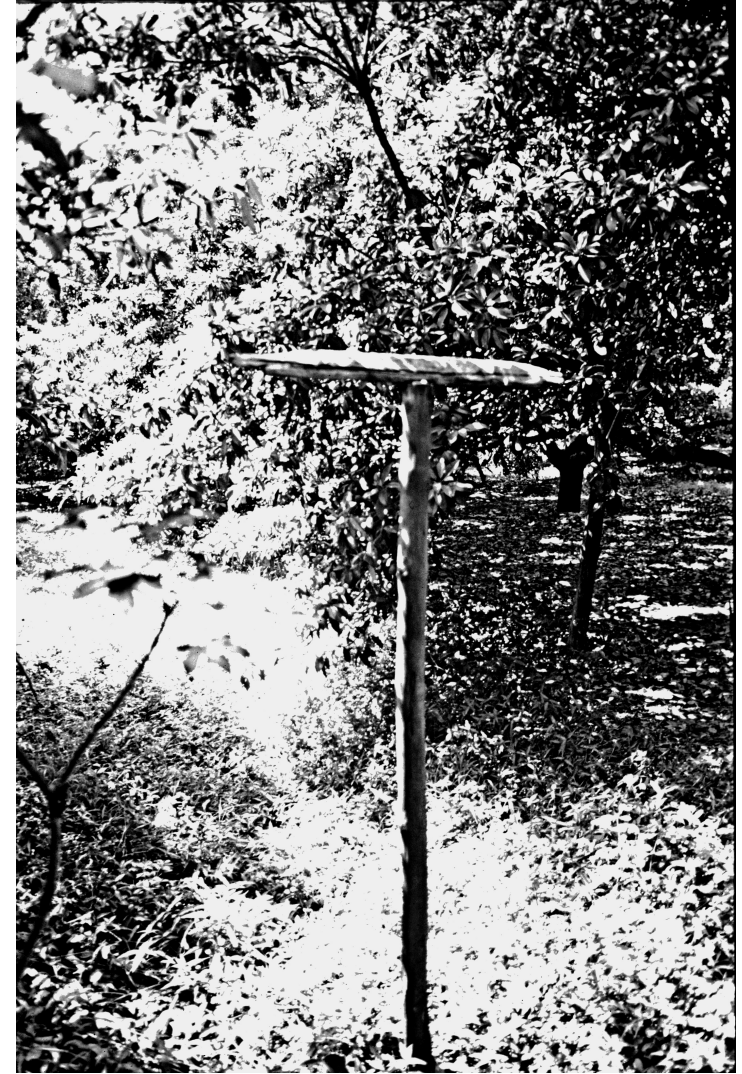


বড়ো লাল পিপড়েরা ফসলের ক্ষতি করে না। বরং তারা তাদের রক্ষা করে। এই জীবদের কয়েকটা যদি বড়ো কোনো জন্তুকে কামড়ায়, সেই কামড়ের জ্বালায় সে তাদের অঞ্চল থেকে পালায় এবং যেহেতু এরকম অনেক লাল পিপড়ে কল্লবৃক্ষ খামারে পুলিশের মত কাজ করে ইঁদুরের মতো তীক্ষ্ণ দাঁতের তস্করদের ফল ফসলের কাছে পৌঁছানোই অনেকাংশে দুষ্কর।

কখনও বা কোনো বেজি খামারের প্রতি আকৃষ্ট হয় (যদিও আজ এটি প্রায়শই দেখা যায় না), কারণ সে খামারের মোটা সব কেঁচোগুলোকে খেতে ভালবাসে। এই জীবটি পরিচিত ইঁদুর ও সাপ খাদক, ফলে বেজি ইঁদুর ও সাপের জনসংখ্যা বৃদ্ধিকে নিয়ন্ত্রণ করে।

তেমনি সাপেরা — যাদের বেশিরভাগ প্রজাতিই বিষহীন এবং মানুষের কোনো ক্ষতি করে না — তারাও ইঁদুর খায় এবং একটি প্রাকৃতিক খামারের বাস্তুতন্ত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বিশেষত ড্যামনা বা ইঁদুরথেকো সাপকে সাধারণভাবে কৃষকের বন্ধু বলে মনে করা হয়। এটি ইঁদুরের মতো তীক্ষ্ণ দাঁতের প্রাণীদের সংখ্যা নিয়ন্ত্রণে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কখনও কখনও একটা বনবিড়াল দেখা যেতে পারে। ইঁদুররা এই জীবকে দেখে ভয়ে পাথর হয়ে যায়। এমনকী এদের মলের গন্ধ পেলে তারা ভয়ে পালায়। এই অঞ্চলে কিছু আদিবাসী তাদের খেতের চারপাশে বনবিড়ালের মল রেখে দেয় যার ফলে তারা ইঁদুরের উৎপাত থেকে বাঁচে। বাড়ির পোষা ও গ্রামের বিড়ালের মলও এক্ষেত্রে কার্যকর।

অবশ্য ইঁদুরের সবচেয়ে পরিচিত ‘শত্রু’ হল প্যাঁচা। বড়ো প্যাঁচারি এক রাতেই তিনটে বা তারও বেশি ইঁদুর শিকার করে। প্যাঁচাকে শিকারে সাহায্য করার জন্য ভাস্করভাই খামারে কিছু ৭ ফুট উচ্চতার T আকৃতির দণ্ড বসিয়েছেন। গাছের ডাল থেকে শিকারের ওপর ঝাঁপাতে গেলে ডালপালা বা পাতার শব্দে ইঁদুররা সতর্ক হয়ে যেতে পারে, তাই প্যাঁচারি তাদের



কল্লবৃক্ষ-তে প্যাঁচা বসার একটি টি-পোল

প্রয়োজনে এই ধরনের দণ্ডে বসা পছন্দ করে। তাছাড়া এই উচ্চতা থেকে ঝাঁপালে ইঁদুর কিছু বুঝে পালাবার আগেই প্যাঁচা তাকে ধরে ফেলতে পারে।

পাখি, মাকড়সা ও ব্যাঙেরা

একটি মিশ্র-খামারে গাছ সহ বৈচিত্র্যময় উদ্ভিদের উপস্থিতিতে অন্যান্য বহু রকমের পাখি আকর্ষিত হয় — অবশ্য যদি না সেখানে রাসায়নিক ছেটানো হয়। পালকে ভরা এই জীবদের অনেকেই পোকামাকড়দের খায় আর তাই তারা কৃষকের ভালো বন্ধু। যদিও পাখির কিছু ফলে ঠোকরাতে পারে, কিন্তু তার ক্ষতি পোকা নিয়ন্ত্রণের সুবিধার ফলে পুষিয়ে যায়। পাখিদের গোটা কয়েক প্রজাতি ছাড়া বেশিরভাগ পাখি চাষির পোতা ফসলের চেয়ে পোকা খেতে বেশি পছন্দ করে।

ভাস্করভাই স্মরণ করলেন যে অনেক শকুন মাটিতে খাবারের সন্ধানে অনুসন্ধানী চোখে এই অঞ্চলের আকাশে উড়ে বেড়াত। এই পাখিরা পৃথিবীর সবচেয়ে কার্যকর প্রাথমিক প্রতিনিধিদের অন্যতম, যারা মানুষ ও জীবজন্তুর শবদের শরীরের উপাদান ভেঙে ফেলে মাটিতে মেশায়। মাটির উর্বরতা চক্রাকারে মাটিতে পুনরায় সরবরাহ করার কাজে তারা এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। দুর্ভাগ্যবশত বাস্তুতন্ত্রে (eco-system) মারীপোকানাশক ও বিষাক্ত দূষণকারী পদার্থ বেশি পরিমাণ জমার ফলে এদেরও অন্য অনেক পাখির মতো সংখ্যা দ্রুত কমছে।



একটি মাকড়সা ও তার ফানেল-আকৃতি জাল, ভ্যান বাদি বন-এ। ছবি কৌশিক রাম

কোনো জমি যেটি এখনও রাসায়নিকের হাত থেকে পুনরুজ্জীবন প্রক্রিয়ায় রয়েছে, সেখানে এমনও ঘটতে পারে যে কোনো এক ধরনের পোকাকার সংখ্যা হঠাৎ করে খুব বেড়ে যাচ্ছে। কিন্তু যদি কেউ প্রাকৃতিক চাষের মৌলিক নীতিগুলি অনুসরণ করে, তাহলে উদ্বেগের কোনো কারণ থাকে না। প্রায়শই মানুষের হস্তক্ষেপ ছাড়াই আপনা-আপনিই সমস্যাটি নিয়ন্ত্রিত হয়।



ভ্যান বাদি-তে একটি গাছ-মাকড়সা। ছবি কৌশিক রাম

রাতারাতি হয়তো মাঠে দেখা গেল গাছগুলির ওপর রূপালি কুয়াশা মাখানো মাকড়সার জালের বিপুল বিস্তৃতি। এইরকম শৈল্পিকভাবে বোনা জালের সাহায্যে মাকড়সারা বিশাল সংখ্যক পোকাকে ফাঁদে ফেলে তাদের খাবার হিসাবে। তাদের খাবার কাজটি যখন সম্পন্ন হয় — আর খাবার জন্য কিছু পড়ে নেই, তখন তারা যেমন হঠাৎ এসেছিল তেমনই হঠাৎ মিলিয়ে যায়।

বহুশত রকমের মাকড়সা রয়েছে। কিছু মাকড়সা পাওয়া যায় জঙ্গলের গাছের মগডালগুলোতে, কিছু ফাঁকা পাথরের ওপর, আবার অনেক মাকড়সা দেখা যায় উপকূলের বালির ওপর, খেত-খামারে বা গোচারগভূমিতে। তারা প্রতি বছরে বিপুল পরিমাণ পোকা খায়। ব্যাঙ, গঙ্গা ফড়িং ও শিকারি মেনটিস পোকারাও ফসল আক্রমণকারী বিপুল বৈচিত্র্যময় পোকামাকড় খায়। এই উপকারি জীবেরা এবং মৌমাছি, কঁচো ইত্যাদি জীবেরাই মানুষের ছেটানো মারাত্মক মারীপোকানাশকের শিকার হয় প্রথমেই। আর তাই শিল্পীয়

ব্যাঙের ঠ্যাং রপ্তানি ও মারীপোকানাশকের আমদানি

বড়ো সোনা ব্যাঙ রাসা ট্রাইগ্রিনা — যাদের কঙ্কন অঞ্চলে সাধারণত বর্ষাকালে দেখা যায় — তারা বহু রকমের পোকামাকড় খায়। এমনকী তারা ছোট ইঁদুর ও কাঁকড়াও খায়। তাই তারা ধান ফসলের কার্যকর রক্ষক। ছোটো ব্যাঙরাও ফসলের মরসুমে অন্তত তাদের শরীরের সমান ওজনের পোকামাকড় খেয়ে থাকে। তারা তাদের লম্বা চটচটে জিভ পোকাকে লক্ষ্য করে মুখের বাইরে ছুঁড়ে দেয়। যে পোকাদের সাথে তাদের জিভের ছোঁয়া লাগে তারা জিভে আটকে যায়।

১৯৬৩ সাল থেকে ব্যাঙের ঠ্যাংয়ের রপ্তানি চাহিদা বাড়তে থাকায় (সুখাদ্য হিসাবে) বিপুল সংখ্যক ব্যাঙ মারা যেত। এতে তাদের সংখ্যা কমায় মারীপোকার সংখ্যা বৃদ্ধি ঘটে। তাতে যে পরিমাণ শস্যহানি হয় তার অর্থনৈতিক মূল্য ব্যাঙের ঠ্যাং রপ্তানি করে যে রোজগার হয়েছিল তার থেকে অনেক বেশি।

বহু বছর ধরে কৃষিবিজ্ঞানীরা কাণ্ড-ফুটো-করা (stem-borer) পোকাদের দ্বারা আক্রান্ত ধানগাছকে পুড়িয়ে দেওয়ার সুপারিশ করতেন। ব্যাঙের ঠ্যাংয়ের রপ্তানি যখন বন্ধ করা হল, ব্যাঙের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে লাগল এবং ফসল হানিকর পোকাদের প্রাদুর্ভাব স্থায়ীভাবে (steadily) কমেতে লাগল। আজ ওই অঞ্চলে (কঙ্কনে) কাণ্ড-ফুটো-করা পোকাদের কোনো বড়ো রকম উৎপাত একেবারেই বন্ধ হয়ে গেছে।

প্রযুক্তি যে সমস্যাকে সমাধান করতে চায় তাকেই বহুগুণ বাড়িয়ে তোলে।

বাগিচায় রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে ভাস্করভাই হঠাৎ মাটিতে একগুচ্ছ চোঙাকৃতি গর্তের দিকে ঝুঁকে পড়লেন। “তোমরা কি সমুদ্র কাঁকড়া দেখেছ, সমুদ্রে বালি তুলে গর্ত করছে? এখানে এগুলি অবশ্য কাঁকড়া নয়, বরং একটা ছোটো জীব, এদের বলে সিংহ-পিঁপড়ে (ant-lion)। কোনো উদ্ভাস্ত পোকা যদি চোঙাকৃতি গর্তের ঢালে এসে পড়ে, অথবা যদি হামাগুড়ি দেওয়া পোকা এখানে এসে পড়ে, তা গড়িয়ে গিয়ে ফাঁদে পড়ে। বেশি শক্তিশ্রম সিংহ-পিঁপড়েরা বেশি বালি সরিয়ে, বেশি গর্ত করতে পারে এবং বেশি পোকা ধরতে পারে।

আমি সৈকত থেকে কিছু বালি এনে এখানে ফেলেছিলাম যাতে বর্ষায় এই রাস্তা কর্দমাক্ত ও পিচ্ছিল না হয়। সিংহ-পিঁপড়েরা ঠিক এইরকম খাবার ধরতে এই মাটি আদর্শ। এরা কখনও কাদামাটিতে যায় না। এ ধরনের জীবও

প্রকৃতির পরিকল্পনার অঙ্গ এবং প্রাকৃতিক চাষির এটিকে স্বাগত জানানো উচিত।

“অবশ্য এটার মানে এই নয় যে জৈব নিয়ন্ত্রণের জন্য কল্পনাপ্রবণ জটিল কৃৎকৌশলের প্রয়োজন আছে। যেমন ধরো, কোনো অঞ্চলে বিজাতীয় খাদক-প্রজাতি নিয়ে আসা। এসবের কোনো দরকার নেই। চাষিকে শুধু প্রাকৃতিক চাষের বুনিয়াদি নীতিগুলিকে অনুসরণ করতে হবে এবং নজর রাখতে হবে। তাতে সে মুগ্ধ হয়ে দেখতে পাবে কীভাবে বৈচিত্র্য উন্মোচিত হয়ে পোকা বা রোগের সমস্যাগুলিকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে মোকাবিলা করে সাম্যে ফিরিয়ে নিয়ে আসছে।”



প্রাকৃতিক চাষে

অপেক্ষা, নজর, এবং মুগ্ধ হওয়া!

সাদা ও লাল পিঁপড়েরা

কল্পবৃক্ষে এক শনিবার দর্শনাথীদের সাপ্তাহিক জমায়েতে একজন কৃষক বললেন যে তাঁর বাগিচায় উই বা সাদা পিঁপড়েরা সমস্যা সৃষ্টি করছে, যা বছরের পর বছর বেড়েই চলেছে। উত্তরে ভাস্করভাই বললেন, “উইপোকারা কার্যত মোটেই ক্ষতিকারক নয়। বরং তারা মাটিকে পুষ্টি ফিরিয়ে দিতে যথেষ্ট সাহায্য করে। কিন্তু কৃষি পদ্ধতির কোনো ভুলে আমরা তাদের সমস্যায় পরিণত করি।”

হাঁটতে হাঁটতে কিছুটা এগিয়ে গিয়ে তিনি একটা বড়ো উইয়ের ঢিবি দেখালেন। তিনি বললেন, “আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমার এখানে অনেক উইপোকা আছে। ওই যে দুর্গের মতো ঢিপি যেটা উইপোকারা বানিয়েছে তাদের সহজাত স্থাপত্য শিল্পীর নৈপুণ্য দিয়ে — ওটি মাটির পক্ষে খুব ভালো। ওটি প্রচুর পুষ্টিতে পূর্ণ এবং তা মাটিকে ছিদ্রময় (porous) করে রাখে।

এরপর সাভে তাঁর অনেকগুলি স্বাস্থ্যবান নারকেল গাছ দেখালেন। প্রতিটি গাছ থেকেই ঝুলছে বিশাল বড়ো সব নারকেলের কাঁদি। “উইপোকারা ক্ষতি করেছে এমন কোনো চিহ্ন কি দেখতে পাচ্ছেন? দুর্ভাগ্যবশত আমরা বুঝতে পারি না যে জ্যাস্ত, সবুজ গাছ-গাছালি উইপোকার স্বাভাবিক খাবার নয়। তারা সাধারণত জড়ো হয় মৃত, মুমূর্ষু অথবা রোগগ্রস্ত উদ্ভিজ্জ বস্তুর কাছে, বিশেষত শুকনো ডালপালা, কাটা ডাল বা মৃত মূলের কাছে।

জঙ্গলে অনেক গাছ আছে যারা তাদের বাইরের বাকল ঝেড়ে ফেলে এবং তাদের নিচ থেকে নতুন কলা (tissue) গজায়। এগুলিও উইয়ের সুডঙ্গে ঢেকে যেতে পারে। কিন্তু মূলত মুমূর্ষু বা মৃত জীবভরই (biomass) হল উইপোকাদের স্বাভাবিক খাবার। এই জিনিসগুলি খেয়ে তারা মাটিতে পুষ্টি ফিরিয়ে দেবার স্বাভাবিক কাজটি করে। পাশাপাশি তাদের খোঁড়াখুড়ির কাজের দ্বারা তারা শীর্ষ-মাটিকে (top-soil) বেশি ছিদ্রময় করে তোলে। তা সত্ত্বেও যদি কোনো কৃষক দেখে যে উইপোকা জ্যাস্ত গাছটাকে আক্রমণ করছে, তবে তার ভাবা উচিত এটা কেন হচ্ছে। কারণ এটি বেশ অস্বাভাবিক। মাটির উপরিভাগ থেকে শুকনো পাতা ডালপালা এবং এইরকম সব জৈব বস্তুকে ঝেঁটিয়ে পরিষ্কার রাখার ফলে নিরুপায় হয়ে উইপোকারা তাদের খাবারের জন্য জ্যাস্ত বস্তুর দিকে নজর দিতে বাধ্য হতে পারে। মাটিতে তাদের প্রাকৃতিক আবাসস্থল (habitat) ও মাটির উপরিভাগে খাবারের উপস্থিতি কীটনাশক ও ছত্রাকনাশকের দূষণে ধ্বংস হওয়ার ফলে উইপোকা আক্ষরিক অর্থেই বিতাড়িত হয়ে গাছে আশ্রয় নেয়। সেখানেও তারা সাধারণত গাছের শুকনো ডালপালাই খেয়ে থাকে।

ভাস্কর সাভে বলে চললেন, “আবার যদি প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ায় ছেড়ে দেওয়া হয়, তাহলে উইপোকারা নিশ্চিতভাবে বড়ো লাল পিপড়েদের এলাকায় ঢুকবে না, কারণ তারা পেটুকের মতো উইপোকাদের খেয়ে ফেলে। একটি প্রাকৃতিক খামারে উইপোকা প্রচুর খাবার পায় আর মাটিতে পায় এক দূষণহীন আবাস। স্বাস্থ্যবান গাছ-ফসলগুলিকে তাদের আদি উপাদানে ভেঙে ফেলা উইপোকাদের পক্ষে আরও কঠিন, স্বাভাবিকভাবে খাদ্যের জন্য গাছ-ফসলের দিকে তাদের তাকানোর কোনো প্রয়োজন নেই।

ছোটো উইপোকাদের মতো বড়ো লাল পিপড়েরাও কৃষকের এক বন্ধুর উদাহরণ, কৃষকের এক বগগা ব্যবসায়ী মন এদের শত্রুতে পরিণত করেছে। একজন স্থানীয় কৃষক বললেন, “আমরা ভালো করেই জানি যে লাল পিপড়েরা মাংসাশী আর তারা ফসলের ক্ষতি করে না। কিন্তু তারা সত্যিই

এক সমস্যার সৃষ্টি করে, যখন মজুররা নারকেল বা সবেদা গাছে উঠে ফল পাড়ে, তাই বাধ্য হয়েই আমরা কীটনাশক ছেটাই।”

ভাস্করভাই উত্তর দিলেন, “আমাদের নারকেল গাছের ক্ষেত্রে কোনো মজুর ফল পাড়তে গাছে ওঠে না, (সে অপেক্ষা করে কখন ফলগুলি পেকে আপনিই পড়ে যায়।) এখানে লাল পিপড়ের উপস্থিতি শুধুমাত্র গাছকে ইঁদুর ও চোরাদের হাত থেকে বাঁচায়। সবেদার ক্ষেত্রে — ওই দেখুন মেয়েরা গাছে উঠে বড়ো বড়ো আকশি দিয়ে ফল পাড়ছে, লাল পিপড়েরা এই মজুরদের সাথে পরিচিত এবং তারা কোনো ভারী সমস্যা সৃষ্টি করে না, কখনও কোনো দর্শনাধী তাদের কামড় খেতে পারে, কিন্তু মজুরদের ক্ষেত্রে তা বিরল।

“তাহলে প্রশ্ন ওঠে, এই পিপড়েরা এখানে ক্ষতিকারক নয়, অথচ তারা আপনার বাগিচায় কেন একটা বড়ো সমস্যা? আপনার বাগিচায় তাদের সংখ্যা কি এখানকার তুলনায় অনেক বেশি? তাদের অন্য কোনো স্বাভাবিক আবাস না থাকায় তারা কি আপনার সবেদা গাছগুলিতে জড়ো হয়েছে? নাকি আপনার বাগানে বিষাক্ত কীটনাশক ছেটানোর ফলে তারা আরও মারাত্মক হয়ে উঠেছে?

“আমাদের মনে রাখতে হবে যে পোকামাকড়ের উপস্থিতি একটা প্রাকৃতিক ঘটনা। কোনো গাছে যদি তারা অতি বেশি সংখ্যায় থাকে, সেটা কোনো রোগের কারণে — বরং বলা ভালো গাছের কোনো অস্বাভাবিকত্বের কারণে। পোকার অস্বাভাবিক উপস্থিতি কোনো কারণ নয়, বরং তা একটি ফল। যখন গাছেরা তাদের স্বাভাবিক বৃদ্ধিতে কোনো বাধা বা সমস্যায় পড়ে, তখন তারা কিছু পদার্থ নিঃসরণ করে, যেগুলি খেতে পোকামাকড়রা ভিড় করে।

“আপনারা দেখেছেন আমার বাড়ির বাইরে একটা ফ্রেগটন গাছে বিশাল এক পিপড়ের চাক। আপনার বাগানেও অনেক চাক থাকতে পারে। গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যেটা লক্ষ্য করার তা হল, এই চাকগুলি বাঁধা হয় সেইসব গাছে যেগুলি দুর্বল বা কম স্বাস্থ্যবান। প্রথমে আপনি দেখতে পাবেন ছাতার মতো কিছু একটা গজিয়েছে। তারপর লাল পিপড়েরা বিশাল সংখ্যায় ওই ছাতা ও তার চারপাশের অণুজীবদের খাবার জন্য ওখানে জড়ো হয়।

“রাসায়নিক ছিটিয়ে ও বিভিন্ন ভুল অনুশীলনে (Practices) যেমন নিবিড় সেচ (Intensive irrigation) বা গভীর খনন (deep tillage) এবং আগাছানাশকের ব্যবহার ইত্যাদির ফলে সম্ভবত আপনার গাছগুলির বিপুল ক্ষতি হয়েছে, এরকম পরিস্থিতিতে গাছের শরীরে ক্ষয় মেরামত ও নতুন সুস্থ কলা নির্মাণের আগে গাছের নিজেকে সাফ-সুতরো করে নেওয়ার

কাজটা আগ্রাধিকার পায়। তাই ঝাড়ুদার অণুজীবদের (Scavenger micro organisms) সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। তারা গাছকে রোগমুক্ত করে এবং মৃত বা রোগাক্রান্ত কলাগুলিকে ভেঙে ফেলে মাটিতে ফেরত দেয়।”



লাল পিপড়েগুলো ও তাদের বাসা, ছত্রাক ঢাকা তুলো পাতার ওপর

ঝাড়ুদার জীবগুলির আবির্ভাবকে সহজেই ভুল ব্যাখ্যা দিয়ে বলা হয় যে তারা রোগের কারণ বা নিজেরাই রোগ। বাস্তবে কিন্তু রোগের কারণটি গভীরতর, যেটাকে সমস্যা বলে মনে হয়, সেটা আসলে প্রকৃতির এক কৌশল যার ফলে গাছ নিজেকে পুনরুজ্জীবন করার আগে বিষমুক্ত করে শুদ্ধ করে তোলে। যে লাল পিপড়েরা ঝাড়ুদার জীবগুলিকে খেতে জড়ো হয়, খাদ্য শৃঙ্খলে তারা পরবর্তী সংযোজক (Link)।

এটা মনে রাখলে আমরা বুঝব যে লাল পিপড়ে বা উইয়ের মতো মানুষের তৈরি অনাকাঙ্ক্ষিত সমস্যাগুলিকে বিচ্ছিন্নভাবে মোকাবিলা করার জন্য খুব বেশি চেষ্টা করা শুধু অর্থহীনই নয়, নিষ্ফলও হতে বাধ্য। এই সমস্যাগুলির প্রকৃত সমাধান হল, একমাত্র প্রাকৃতিক উপায়ের ওপর বিশ্বাস রেখে সমগ্র কৃষি-বাস্তুতন্ত্রের ভারসাম্য এবং স্বাস্থ্য ফিরিয়ে আনা।

আধুনিক শিল্পীয় মানুষ তার ক্ষীণ দৃষ্টিসম্পন্ন জ্ঞানের দ্বারা বিভ্রান্ত হয়ে উদ্ধত পদচারণায় এগিয়ে চলেছে এর ঠিক বিপরীত দিকে। সে প্রকৃতির ওপর আধিপত্য বিস্তার করার চেষ্টা করেছে যাতে প্রকৃতিকে তার ব্যবসায়িক প্রয়োজন অনুসারে ছেঁটে নেওয়া যায়। কিন্তু এ ধরনের সমস্ত প্রচেষ্টা বিচিহ্ন

ও ব্যাপক প্রতিক্রিয়ার মুখে পড়েছে। রাসায়নিক মারীপোকানাশক ছিটিয়ে আমরা মানুষের জানা কিছু মারাত্মক বিষের অসংখ্য ভয়ংকর ফল ছাড়াও মারীপোকার সমস্যাটিকে আরও ভয়াবহ করে তুলেছি।

মারীপোকানাশকের প্রত্যাবর্ত (Pesticide Backlash[3mm])

ভারতে সবুজ বিপ্লবের ঘোষিত জনক এম এস স্বামীনাথন ১৯৮৩ সালে স্বীকার করেছিলেন, “বেশিরভাগ পরিস্থিতিতে যেখানে মারীপোকার (pests) বিস্তার ঘটে বিপুলভাবে, সেগুলির সাথে মারীপোকানাশকের নির্বিচার ব্যবহারের সম্বন্ধ রয়েছে। এটা জানা কথা যে ওই রাসায়নিকগুলি মারীপোকাদের প্রজনন প্রক্রিয়াকে উদ্দীপ্ত করে এবং তাদের স্বাভাবিক শত্রুদের ধ্বংস করে ...”।

দু-দশকের বেশি আগে রাচেল কারসন তাঁর ধ্রুপদি লেখা ‘নিস্তব্ধ বসন্ত’ (১৯৬২) (Silent Spring) বইটিতে প্রাক-সাবধানবাণী উচ্চারণ করেছিলেন, “(রাসায়নিক) ছোটানোর ফলে দুর্বল পোকারা নিকেশ হয়। যেসকল পোকাদের ভিতর কিছু অন্তর্নিহিত গুণ আছে যার সাহায্যে তারা রাসায়নিকের মারাত্মক ক্ষতিকারক প্রভাব এড়াতে পারে, তাড়াই টিকে যায়। এরাই নতুন প্রজন্মের পোকাদের পিতামাতা। নতুন প্রজন্মের পোকামাকড়রা উত্তরাধিকার সূত্রে তাদের পিতামাতাদের কাছ থেকে ‘শক্তপোক্ত’ ভাব অর্জন করে। শক্তিশালী রাসায়নিকগুলি নিবিড়ভাবে ছোটানোর অবশ্যম্ভাবী ফল হল, যে সমস্যা মেটাতে এই রাসায়নিকগুলির সৃষ্টি করা হয়েছিল, সেই সমস্যটি আরও খারাপ রূপ ধারণ করে।”

গণনা অনুযায়ী পৃথিবীতে অন্তত দশ লক্ষ প্রজাতির পোকামাকড় আছে। এদের ৯০%-এর বেশি খামারের ফসলের কোনো ক্ষতি করে না, অথবা প্রায়শই কোনো না কোনো উপায়ে ফসলের উপকার করে। এরকম অনেক জীব যেমন কেঁচো, পিপড়ে, মৌমাছির মারীপোকানাশক ব্যবহারের ফলে মারা যায়। তেমনি মাকড়সা, সোনা ব্যাঙ, পাখি ইত্যাদি স্বাভাবিক খাদক (predators) — যারা ফসলে হামলাকারী পতঙ্গ ও মারীপোকাদের খেয়ে বেঁচে থাকে — তারাও মারা যায়।

কীটনাশকদের লক্ষ্যবস্তু যে মারীপোকাগুলি, সাধারণত তাদের জীবৎকাল হয় অত্যন্ত সীমিত। কিন্তু তারা নিজেদের পুনরুৎপাদিত করতে পারে বিপুল সংখ্যায়। তাদের মৃত্যুর আগে তারা হাজার হাজার ডিম পেড়ে রাখে। অপেক্ষাকৃত দীর্ঘমেয়াদী জীবনচক্রের খাদক প্রজাতিরা (predators) ডিম পাড়ার আগেই মারা যায়।

এমনকী কয়েকটা মারীপোকা বেঁচে থাকলেও তারা দ্রুত বৃদ্ধি পেয়ে

একটি ফসলের মরসুমে অনেকগুলি প্রজন্ম অতিক্রম করে, ফলে তাদের আদি সংখ্যা প্রতিস্থাপিত হয় প্রতিরোধী পোকাদের দ্বারা, যাদের ওপর মারীপোকানাশকের আর কোনো প্রভাব থাকে না।

যখন কীটনাশকের আরও ঘনীভূত মাত্রা পোকাদের উৎপাতকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না, তখন কৃষকদের অন্য কোনো এবং আরও বেশি শক্তিশালী কীটনাশক ব্যবহারের পরামর্শ দেওয়া হয়, নতুন কোনো কীটনাশকের ব্যবহারে প্রথম প্রথম বেশি সংখ্যায় পোকা মারা যেতে পারে, কিন্তু টিকে থাকা পোকাদের মধ্য থেকে অচিরেই পরবর্তী প্রজন্মগুলিতে প্রতিরোধী পোকাদের ওপর এই নতুন কীটনাশকের ব্যর্থ হবার গল্পের পুনরাবৃত্তি হতে থাকে। এই পাগলামির ফলে আগে খামারে যত সংখ্যক পোকা ক্ষতিকারক ছিল, সেই সংখ্যাটা অনেক বেড়ে গেছে। যে পোকারা আগে কোনো ক্ষতি করত না, তারাও গত কয়েক দশকে ক্ষতিকারক পোকায় রূপান্তরিত হয়েছে।

১৯৪০-এর দশক থেকে ১৯৮০-র দশক পর্যন্ত কীটনাশকের ব্যবহার দশগুণ বৃদ্ধি পেলেও কীটের দ্বারা ফসলের ক্ষতি বৃদ্ধি পেয়েছে দ্বিগুণ। ১৯৩৫ সালে কীটনাশক ছেটালে মাত্র ৭টি প্রজাতির কীট পালাতে বা মরতে অস্বীকার করত। কিন্তু ১৯৮৭ সালের মধ্যে আরও বিষাক্ত সব নতুন কীটনাশকের ব্যবহার সত্ত্বেও ৫০০-র বেশি প্রজাতির কীট কীটনাশক-প্রতিরোধী হয়ে উঠেছে, তারও পরে গত দুই দশক খুব সম্ভবত এই প্রতিরোধী কীটের প্রজাতির সংখ্যা বিশাল ভাবে বেড়ে গেছে। শিল্পীয় কৃষিতে (Industrial agriculture) প্রযুক্তির প্রতিটি বড়ো পদক্ষেপের প্রভাবে সমস্যাবলী আরও বৃদ্ধি পেয়েছে, আর এখন যদি জিএম ফসলগুলির (genetically modified) প্রসারে ছাড় দেওয়া হয়, তাহলে আমরা সম্ভবত সুপার পেস্ট (অতিশয় প্রতিরোধী মারীপোকা) বা সুপার উইড ('super weeds'/ অতিশয় প্রতিরোধী আগাছার যুগে প্রবেশ করতে চলেছি। এগুলি ইতিমধ্যেই বিভিন্ন দেশে মাথা তুলতে শুরু করেছে।

বিষাক্ত খাবার, বিষাক্ত জল

ওয়্যাশিংটনের ন্যাশনাল অ্যাকাডেমি অফ সায়েন্সেস তাদের ১৯৮৭ সালের এক রিপোর্টে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিল যে খাদ্যে থেকে যাওয়া কীটনাশকের অবশেষ বর্তমান প্রজন্মকালের মধ্যে শুধুমাত্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে দশ লক্ষের বেশি মানুষের মৃত্যুর কারণ হতে পারে। এই গণনার ভিত্তি ছিল খাদ্যে পাওয়া গেছে এমন ৩০টির কম ক্যানসার সৃষ্টিকারী (carcinogenic) কীটনাশক। যদিও ইতিমধ্যে জানা ছিল যে ফসলে ব্যবহৃত ৫৫টি

কীটনাশক ক্যানসার সৃষ্টি করতে পারে। এই রিপোর্টে পানীয় জলের ওপর ক্যানসার সৃষ্টিকারী কীটনাশকের প্রভাবের বিষয়টি বিবেচিত হয়নি।

ওই বছরেই আমেরিকার এনভায়রনমেন্ট প্রোটেকশন এজেন্সির (EPA) আর এক রিপোর্টে আমেরিকার ২৪টি রাজ্যে ভৌম জলে ২০টির বেশি মারাত্মক কীটনাশকের উপস্থিতির কথা প্রকাশিত হয়েছিল। শুধুমাত্র ক্যালিফোর্নিয়ার ভৌমজলে ৫৭টি কীটনাশকের উপস্থিতি শনাক্ত করা হয়েছিল।

পাঁচ বছর আগে ১৯৮২ সালে মার্কিন কংগ্রেসের একটি রিপোর্টের হিসেব অনুযায়ী জানা গিয়েছিল যে খাদ্য ফসলে ব্যবহৃত, সরকারিভাবে লিপিবদ্ধ ৪০০ কীটনাশকের প্রায় ৮০-৮৫% — তারা ক্যানসার সৃষ্টি করে কিনা বা 'কারসিনোজেনিক' কিনা — যথাযতভাবে পরীক্ষিত হয়নি এবং ৯০-৯৩% কীটনাশক, কোষের কোনো মিউটেশন বা স্থায়ী বদল ঘটাতে পারে কিনা, পরীক্ষিত হয়নি। এছাড়া বিজ্ঞানীরা আরও নতুন ধরনের মারাত্মক সব স্বাস্থ্য-সমস্যা খুঁজে পাচ্ছিল, যেগুলি রাসায়নিকের কারণে ঘটছে ... তারা দেখল, অনেকগুলি কীটনাশক মানুষের শরীরে অন্তর্নিহিত প্রতিরোধী ব্যবস্থার ক্ষতি করে — যার ফলে ইনফেকশন, ক্যানসার, বিভিন্ন অ্যালার্জির আক্রমণ এবং স্ব-প্রতিরোধী রোগের বিরুদ্ধে শরীরে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ভেঙে পড়ে।

আমেরিকায় অবস্থাটা যদি হয় করুণ, ভারতের ক্ষেত্রে তা আরও খারাপ। আমরা যেসব কীটনাশক ব্যবহার করে আসছি তাদের ৮০% যে দেশগুলিতে সৃষ্ট হয়েছিল, সেখানে তাদের ব্যবহার আইনত নিষিদ্ধ করা হয়েছে। রাতেল কারসনের লেখা 'নিষ্পেক্ষ বসন্ত' (সাইলেন্ট স্প্রিং) প্রকাশিত হওয়ার পর আমেরিকায় কীটনাশকের বিরুদ্ধে যে প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছিল, তার ফলে সেদেশে ডিডিটি-র ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হয়। কিন্তু এই মারাত্মক বিষ বিদেশে চালান করার জন্য তারা কোনো বিবেকের দংশন উপলব্ধি করেনি। আর এদেশ তো তার নাগরিকদের স্বাস্থ্য সুরক্ষিত করার ক্ষেত্রে একেবারেই আলগা।

অর্গানো-ক্লোরিন কীটনাশকগুলি যেমন ডিডিটি, অলড্রিন, ডায়েলড্রিন, ক্লোরডেন এবং হেপ্টাক্লোরের অবশেষ মাটিতে থেকে যায় বহু বছর এমনকী বহু শতক ধরে। যেহেতু তারা সহজে ভাঙে (degrade) না, তারা ক্রমাগত শরীরে জমতে থাকে। তারা এক শরীর থেকে আরেক শরীরে ধারাবাহিকভাবে স্থানান্তরিত হয়। যেমন মাটি থেকে ফসলে, ঘাস থেকে গবাদি পশুর শরীরে ... সুস্থির ভাবে বাস্তুতন্ত্রের সর্বত্র এবং তার অসংখ্য জীবের শরীরে (bio-system) বৃদ্ধি পায়। এদের অবশেষে সর্বত্র পাওয়া যায় — শাকসবজি, দানাশস্য, ফল, মাংস এমনকী দুধেও।

যখন মানুষ ডিডিটি ও বিএইচসি-র মতো রাসায়নিকগুলিকে গ্রহণ করে, তারা ক্ষুদ্রান্ত দ্বারা শোষিত হয়। এরপর এই বিষগুলি শরীরের চর্বিতে লেগে থাকে, দিনের পর দিন থাইরয়েড, হৃদযন্ত্র, কিডনি, লিভার, স্তনগ্রন্থি, অণ্ডকোষ ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গগুলির স্নেহকলায় (fatty tissues) জমতে থাকে এবং সেখানে তারা বছরের পর বছর চুপচাপ বসে থাকতে পারে যতক্ষণ না তারা ঠিক করে যে তারা তাদের উপস্থিতি জানান দেবে।

জৈব-প্রযুক্তির হাতুড়েপনা বনাম প্রকৃতির ভারসাম্য

রাসায়নিকের কীটনাশক ব্যবহারের ফলে ক্রমবর্ধমান সমস্যাবলীর সম্মুখীন হয়ে কৃষিবিজ্ঞানীরা সেগুলির নতুন কারিগরি ‘সমাধানের’ জন্য জৈব-প্রযুক্তির দিকে তাকাতে শুরু করেছে। কৃত্রিম কেঁচো চাষ বা ভার্মিকালচারের মতো কিছু জৈব-প্রযুক্তি মোটামুটি সহজ। কিছু জৈব-প্রযুক্তি অনিবার্যভাবে প্রাকৃতিকভাবে সৃষ্টি হওয়া কিছু নির্ধারিত অণুজীবের বংশবিস্তার করে। প্রাকৃতিক ব্যবস্থা থেকে আরও সরে গিয়ে কৃষিজৈব-প্রযুক্তিবিদরা কোনো অঞ্চলে পোকা নিয়ন্ত্রণে কিছু প্রাকৃতিকভাবে সৃষ্ট খাদক (predators) প্রজাতি ও প্যারাসিটয়েড, ইত্যাদিদের কৃত্রিমভাবে সূচনা করার সুপারিশ করতে পারে। কিন্তু ভাস্কর সাভের মতে, “একটি মিশ্র প্রাকৃতিক খামারে এর কোনো দরকার নেই। এখানে প্রাকৃতিক পরম্পরায় বিভিন্ন ধরনের কীটপতঙ্গ ও তাদের খাদকরা আপনা-আপনিই জন্ম নেয় এবং তা ঘটে বিদ্যমান পরিস্থিতির চাহিদা অনুযায়ী।”

ভারতীয় খাবারে বিষ

বারংবার সমীক্ষায় দেখা গেছে যে ভারতীয়রা প্রতিদিন কীটনাশকের অবশেষ (residue) লেগে থাকা খাবার খায় এমন মাত্রায় যা পৃথিবীতে সর্বাধিক। একজন গড়পড়তা ভারতীয় এই বিষাক্ত খাবার খায়, একজন গড়পড়তা ইংরেজ বা আমেরিকানের ৪০ গুণ বেশি। এই প্রক্রিয়ার ফলে ভারতীয়রা হৃদরোগ, মস্তিষ্ক, কিডনি ও লিভারের ক্ষতি করে এবং ক্যানসারের সম্মুখীন হয়।

“আমরা যা দেখেছি তা হল শ্রেফ এক বিষাক্ত ডুবোপাহাড়ের বরফের চূড়া। কিন্তু তাতেই পরিস্থিতিটা এমন সঙ্গীন হয়ে উঠেছে যে আমাদের অবিলম্বে উঠে বসে দোষ শুধরে নেবার কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে” — একথা বলেছেন ভূপাল গ্যাস ট্রাজেডির অনুসন্ধানকারী কমিশনের চেয়ারম্যান ও বিশিষ্ট বিশেষজ্ঞ ডঃ সি আর কৃষ্ণমূর্তি।

১৯৮৪ সালে রাষ্ট্রসংঘের ফুড অ্যান্ড এগ্রিকালচারাল অর্গানাইজেশন ফাও (FAO) একটি সমীক্ষায় দানাশস্য, ডালের বীজ, দুধ, তেল ও দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মাংস ইত্যাদির ১৫০০টি নমুনা বিশ্লেষণ করে জানিয়েছে যে প্রায় সমস্ত নমুনাতে ডিডিটি ও বিএইচসি দূষণের স্বাক্ষর পাওয়া গেছে। এটা পরিস্কার যে আমরা নিরাপদ এলাকার সীমানা ছাড়িয়ে বিপজ্জনক এলাকার গভীরে অনেক মাইল অতিক্রম করে ঢুকে গেছি।” মন্তব্যটি করেছেন ফাও সমীক্ষাটির প্রজেক্ট কো-অর্ডিনেটর এবং লুথিয়ানায় পাঞ্জাব কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের বরিষ্ঠ বিষ-বিশেষজ্ঞ (toxicologist) ডঃ রাজেন্দ্র কালরা।

দিল্লির নাগরিকদের এক মারাত্মক বিশেষত্ব রয়েছে। সেটা হল তাদের শরীরের চর্বিতে ২০ পিপিএম (পার্টস পার মিলিয়ন) ডিডিটি পাওয়া গেছে — যা পৃথিবীর যে কোনো অঞ্চলের মানুষের শরীরে পাওয়া ডিডিটির মাত্রার চেয়ে বেশি। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে এই রাসায়নিক যদি ১.২৫ পিপিএমের বেশি আমাদের শরীরে ঘনীভূত হয় তাহলে তা বিপদজনক।

রাসায়নিক বিষযুক্ত নানা ধরনের খাদ্য ও গাছ-গাছালিপূর্ণ প্রাকৃতিক পরিবেশের জন্য আত্ম-নিয়ন্ত্রণ প্রয়োজন যাতে বিভিন্ন প্রজাতির সংখ্যার মধ্যে এক ভারসাম্য রক্ষা করা যায়। অন্যদিকে কোনো অঞ্চলে যদি কৃত্রিমভাবে বিশেষ রকমের বিদেশি বা বিজাতীয় খাদক-পোকাকার (predator) প্রজাতির সূচনা করা/ছাড়া হয়, তাহলে তা সফল নাও হতে পারে, যদি এই খাদক-পোকাকার

তাদের নতুন পরিবেশের সাথে খাপ পাওয়াতে সক্ষম না হতে পারে। তাছাড়া অপরিসীমভাবে আস্ত-সম্পর্কিত এক বৃহত্তর ব্যবস্থায় বিচ্ছিন্নভাবে গুটিকয়েক উপাদানের জোড়াতালি দেওয়ার ফল কতটা ব্যাপক ও সুদূরপ্রসারী হতে পারে, তা আমরা কেউ জানি না।

জৈব নিয়ন্ত্রণের এজেন্ট বা প্রতিনিধিরা সাধারণত নিজেদের ছড়িয়ে দেওয়া ও প্রসারের কাজে সক্ষম। এর ফলশ্রুতিতে সূচনা করা (introduced) খাদক-প্রজাতিটি নির্দিষ্ট কিছু পরিবেশ-পরিস্থিতিতে নিজেরাই সংখ্যায় ভীষণভাবে বেড়ে যেতে পারে অথবা অব্যাহত পার্শ্ব প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করতে পারে। আর তাই ইঙ্গিত প্রযুক্তিগত সমাধানের বদলে নতুন বাস্তবাত্মক সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে।

কৃত্রিমভাবে নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে সুপারিশ মতো খাদক ও প্যারাসিটয়েডদের প্রমিত (standardised) প্রজাতি সৃষ্টি করার জন্য বৃহদাকার ব্যবসায়িক পতঙ্গাবাস তৈরি করা হয়। বৃহদাকার ব্যবসায়িক পতঙ্গাবাস (insectory) মানেই বহিরাগত উৎসের ওপর নির্ভরশীলতা তৈরি হয়। যদিও এই পোকামাকড়গুলি জিন বদলের দ্বারা সৃষ্টি নয়, তবুও তারা নিশ্চিতভাবে সংকীর্ণ জিনগত ভিত্তির থেকে সংগৃহীত। দুর্ভাগ্যজনকভাবে আমরা ভুলে যাই যে প্রকৃতিতে জিনের বিপুল বৈচিত্র্যের সমাহারই নির্দিষ্ট পারিবেশিক সমস্যা সমাধানে তাৎক্ষণিকভাবে নির্ধারিত প্রযুক্তিগত দাওয়াইয়ের থেকে অনেক বেশি কার্যকর। সংকীর্ণ ও ক্ষীণদৃষ্টির জিন-কারিগরিবিদ্যার ব্যবহার সমস্যাগুলির বিপদ বহুগুণ বাড়িয়ে তোলে।

প্রযুক্তিবিদদের সুপারিশ মতো কীট নিয়ন্ত্রণে জৈব (biological) পদ্ধতিগুলি রাসায়নিক পদ্ধতিগুলির চেয়ে অনেক বেশি জটিল, যেগুলি বেশিরভাগ চাষি সঠিকভাবে অনুসরণ করতে পারে না। অবধারিতভাবে তারা বহিরাগত বিশেষীকৃত (specialized) ‘বেশি দামি’ জ্ঞানের ওপর নির্ভরশীল। এছাড়া জীব-কারিগরদের বিস্তারিত নির্দেশাবলী, যদি ধরে নেওয়া যায় যে সংশ্লিষ্ট কৃষক খরচ করতে পারে — তাহলেও তার কাছে তা অত্যন্ত জটিল মনে হতে পারে।

উদাহরণ স্বরূপ তুলো গাছে ফুটো করা পোকাদের (Cotton borers) নিয়ন্ত্রণ করতে ডিস্থানু অবস্থায় এদের ওপর সুপারিশ অনুযায়ী পরজীবী ছেড়ে (released) দেওয়া হয়। “আপনাকে জমিতে ফেরোমোন (এক প্রকার গন্ধ) ফাঁদ, আলোর ফাঁদ পেতে পূর্ণ বয়স্ক পোকাদের লক্ষ্য রাখতে হবে এবং জমিতে তাদের সংখ্যা অনুযায়ী প্রয়োজন অনুসারে পরজীবীদের ছেড়ে দিতে

হবে (released)। এখেত্রে শুধুমাত্র সময়ই গুরুত্বপূর্ণ নয়, সাথে সাথে কত মাত্রায় (dosage) এবং কী হারে (rate) এই প্রাকৃতিক খাদক-পোকা ছাড়তে (release) হবে তাও নির্ধারণ করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সৌভাগ্যবশত (!) তামিলনাড়ুতে কৃষি ও তৈলবীজ এই দুই দপ্তরে আমাদের ৪২টি পরজীবী প্রজনন কেন্দ্র আছে, যেখানে জৈব পদ্ধতিতে নারকেল গাছ, আখ ও অন্যান্য কয়েকটি ফসলের পোকামাকড় নিয়ন্ত্রণের কাজ করা হয়।” এই বক্তব্যগুলি জৈব পদ্ধতিতে পোকা নিয়ন্ত্রণের ওপর এক সেমিনারে একটি কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের বক্তৃতা থেকে উদ্ধৃত হয়েছে

বিশেষত আজকে অশুভ ব্যাপারটি হল জিন বদলের ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ। এগুলি অর্থহীন প্রবণতা কারণ প্রকৃতি ফসলের উৎপাদনশীলতা ও ফসলের সুরক্ষা — দুটি ক্ষেত্রেই যথেষ্ট ব্যবস্থা রেখেছেন। যেটা সত্যিকারের বোঝা দরকার সেটা হল অসংখ্য পুঙ্খানুপুঙ্খ ঘটনার ভিড়ে হারিয়ে না গিয়ে এবং বিশেষজ্ঞদের কাছে নিজেদের সমর্পণ না করে কিছু বুনিয়াদি দিকনির্দেশকে বোঝা এবং সেগুলি অনুসরণ করা।

সহযোগী গাছপালা রোপণের মাধ্যমে প্রজননের নিয়ন্ত্রণ

আমাদের ঐতিহ্যগত মিশ্র-কৃষির সমৃদ্ধ অভিজ্ঞতা থেকে গাছপালার জগতে অসংখ্য উদ্ভিদ প্রজাতিকে শনাক্ত করা গেছে যেগুলি সম্ভাব্য পোকামাকড়দের বৃদ্ধিকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং এই ধরনের উদ্ভিদ প্রজাতিদের সাধারণত মূল খাদ্য-ফসলগুলির সাথে সহযোগী উদ্ভিদ হিসাবে রোপণ করা হয় এবং তারা খামারে অন্যান্য উদ্ভিদের সাথে অচ্ছেদ্যভাবে বেড়ে ওঠে। উদাহরণ স্বরূপ কল্লুবৃক্ষে বেড়ে ওঠা কারিপাতা (মুরায়া কোয়েনিজি) বিভিন্ন ধরনের পোকামাকড়ের প্রজননে বাধা দেয়। পাশাপাশি তারা বিবিধ ভারতীয় রান্নায় স্বাদ বর্ধক হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

কৃষ্ণ তুলসি এবং রামতুলসি (শ্রীতুলসি) — পবিত্র তুলসির এইসব জাতগুলি ঐতিহ্যগতভাবে চাষের খেতে অন্যান্য ফসলের মাঝে রোপণ করা হয়। এগুলি এমনকী বাড়িঘরের আশেপাশে রোপণ করা হয়। এদের ওপর পোকামাকড়, এমনকী আধ মিনিট ও তার কম সময়ের জন্য এসে বসলেও এই গাছেরা তাদের প্রজননে বাধা দেয়। একারণেই ভাস্কর সাভে তাঁর নারকেল নার্সারিতে নারকেল চারাগুলির মাঝে এবং নতুন বাগিচা খেতে — যেগুলির বয়স এখন ১৫ বছরের বেশি — তুলসির চারা বসিয়েছেন। গাঁদা গাছও অনুরূপ কাজ করে থাকে এবং বহু আদিবাসী সমাজে ও ঐতিহ্যশালী চাষিদের কাছে অন্য ফসলের মাঝে রোপণ করার জন্য এটিও এক জনপ্রিয়

বিরুদ্ধ।

ছোটো পোকাদের অনেক প্রজাতির (ফলের পোকা, মশা ইত্যাদির) জীবনচক্র অত্যন্ত সীমিত — ৩ থেকে ১৫ দিন। কিন্তু তারা হাজার হাজার ডিম পাড়ে। তাই কারিপাতা, তুলসি বা গাঁদার মতো গাছে বসার ফলে তাদের প্রজনন ক্ষমতা যদি সাময়িকভাবেও ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তাহলে তাদের সংখ্যা কার্যকরভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়।

দানাশস্য গোলায় ভরে রাখা

চাষিরা ঐতিহ্যগতভাবে গোবর লেপা পায়ে (সাধারণত বাঁশের) নিমফলের গুঁড়ো পাতের ভিতরের দেওয়ালে ঘসে দিয়ে এবং দানাশস্যের মাঝে নিমপাতা ছড়িয়ে দিয়ে দানাশস্য গোলায় ভরে রাখে। যদি শস্য বস্তায় ভরে রাখা হয়, তাহলে বস্তাগুলি নিমপাতা বা নিমশাঁসের জলীয় দ্রবণে ভিজিয়ে ছায়ায় শুকিয়ে নিয়ে তারপর তাতে শস্য ভরে রাখা হয়।

পূর্বে অনেক দানাশস্য তেলে চোবানো হত অথবা তাতে তেল, ছাই অথবা বালি মেশানো হত। এইভাবে ৫ বছর পর্যন্ত চাল গোলায় ভরে রাখা যায় এবং তাতে কোনো ক্ষতি বা শস্যের গুণমানের কোনো অবনমন হয় না। পাঞ্জাবে বীজ হিসাবে ব্যবহার করার জন্য দানাশস্যে ঝুঁটের ছাই মেশানো হত। আবার মহীশূরের বীজ সংরক্ষণে কাঠের ছাই ব্যবহার করা হত।

গোলাজাত শস্যকে রক্ষা করতে ঐতিহ্যগতভাবে নিম ছাড়াও অন্যান্য অনেক উদ্ভিদও ব্যবহার করা হত। এগুলি বচ, আদুলসা, আলনীস, নেপালেনসীস, চীনাবাদাম, ব্লুমিয়া ম্যালকলমী, লেবুপাতা ও কুনকুডু (সোপনটি)।

অন্যান্য কিছু উদ্ভিদ যারা কীটপতঙ্গের প্রজননে বাধা দেয় তারা হল কাঁকড়া (রুই/ওকে, ক্যালোট্রিস জাইগ্যানটিয়া) আতা, নিম, রেড্ডি, করঞ্জ (Pongamia glabra/pinnata) (পোঙ্গামিয়া গ্লাবরা/পিননটা) ... এগুলির বেশিরভাগ গাছের পাতা হল তেতো, কষটা ও এগুলির মধ্যে সেপাটিক-নিরোধী পদার্থ বর্তমান। এই বৈশিষ্ট্যগুলির কয়েকটি আবার পতঙ্গ তাড়ানোয় (insect repellants) সাহায্য করে।

নিম (মার্গোসা গাছ, অ্যাজাডিরাইকট ইন্ডিকা) পতঙ্গ তাড়ানো ও পতঙ্গের প্রজননে বাধা দেওয়া — এই দুটি কাজই করে। তাই এটি খামার, গ্রাম ও জনপদের অঙ্গীভূত করে নেবার মতো গাছ। এটাও মনে করা হয় যে নিমপাতা বাতাসকে চমৎকার ভাবে বিশুদ্ধ করে এবং এর সংস্পর্শে

এলে বহুরকমের জীবাণু ('pathogenic') সাময়িকভাবে বন্ধা হয়ে যায়। নিমখোল অথবা বাটা নিমপাতার জলীয় দ্রবণ ছিটিয়ে ঐতিহ্যগতভাবে বহু পোকামাকড়ের বৃদ্ধিকে নিয়ন্ত্রণ করা হয়।

অহিংসক উদ্ভিজ্জ মারী পোকানাশক

উইপোকা নিয়ন্ত্রণে ভাস্কর সাভে পূর্বে উল্লেখিত চাষিকে এইরকম পরামর্শ দিয়েছিলেন : “আপনার উচিত নিম্নলিখিত উপায়ে তৈরি জৈব দ্রবণ ছোটানো : এক লিটার গোমূত্রে কিছু তেতো নিম বেটে মিশিয়ে তার সাথে আঁকড়া (অক/রুই, ক্যালোট্রিস জাইগ্যানটিয়া) এবং কিছু করঞ্জ পাতা (পোঙ্গামিয়া পিননটা) বেটে মিশিয়ে ভালো করে নাড়ুন এবং তা ২৪ ঘন্টা রেখে, হেঁকে নিয়ে ৮ লিটার জল মিশিয়ে লঘু করে তারপর ছোটান।”

“এতে উইপোকা এবং বেশিরভাগ ফসলভুক পোকামাকড়দের প্রজনন ক্ষতিগ্রস্ত হবে।” (১০ দিন পর আবার স্প্রে করুন) যেহেতু এইসব ক্ষুদ্র জীবগুলির জীবৎকাল অত্যন্ত সীমিত, তাদের প্রজনন সাময়িকভাবে বাধাপ্রাপ্ত হলেই ঈঙ্গিত ফল পাওয়া যাবে। তাদের বর্তমান প্রজন্ম ডিমপাড়ার আগেই স্বাভাবিকভাবে মারা গেলে নতুন প্রজনন না জন্মালেই তাদের বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রিত হবে। কিন্তু তাদের প্রাকৃতিক খাদক-প্রজাতিগুলি (natural predators) তাদের থেকে বেশি বছর বাঁচে বলে তাদের সংখ্যার হ্রাস ঘটে না। আরেকটি অহিংস দ্রবণ যা সাধারণভাবে অনেক মরসুমি খাদ্য-ফসলের ওপর ছোটানো যায় তা তৈরির প্রণালী দেওয়া হয়েছে ১৯৭ পৃষ্ঠায় : পঞ্চগব্য, ভাস্কর সাভের প্রণালী।

নিম, আঁকড়া, করঞ্জ ছাড়াও অসংখ্য উদ্ভিদের ভিতরে মারীপোকা নিয়ন্ত্রণের গুণাবলী রয়েছে। এগুলির মধ্যে আদুলসা (Adhatoda zeylanica/vasica /আধাটোডা জেইলানিকা/ভাসিকা), বিল্লা (Indigofera oblongifolia,) এবং সেহন্দ (Milk bush/ Euphorbia tirucalli) উল্লেখযোগ্য। সাধারণ উদ্ভিদ, যেমন লংকা, পেঁয়াজ, আদা, রসুন, অ্যাসাফিটিডা, গাঁদা, পেরিউক্কল (সাদা ফল), টমাটো, অ্যালো, তামাক, লানটানা ইত্যাদিদের মধ্যেও কীট-নিয়ন্ত্রণের গুণাবলী রয়েছে।

আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য স্বীকার করে নিলেও এইরকম উদ্ভিদের সংখ্যা — যেগুলি চাষিরা সাফল্যের সাথে ব্যবহার করেছে — বহুশত। (যদিও কিছু উদ্ভিদ যেমন তামাক ও লানটানা — এগুলির প্রভাব অত্যন্ত শক্তিশালী — এগুলি খুব একটা অহিংসক নয়, যদি এগুলি উচ্চ ঘনত্বে ব্যবহার করা হয়।)

ভাস্কর সাভে বিশেষভাবে গুরুত্ব দেন — “একটি পোকাকার প্রাদুর্ভাবের বাহ্যিক প্রকাশের দিকে না তাকিয়ে একজন চাষির উচিত তার মৌলিক কারণগুলির ওপর জোর দেওয়া। (দু)এক ধরনের প্রজাতির (monoculture) বিশালায়তন হাইব্রিড চাষে রাসায়নিক প্রয়োগ — এই অভ্যাসটি অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে বন্ধ করা প্রয়োজন। প্রাকৃতিক/জৈবচাষে এই পোকা বা ওই পোকাকে নিয়ন্ত্রণ করার বদলে বরং জোর দেওয়া হয় সামগ্রিকভাবে বাস্তুতন্ত্রের স্বাস্থ্যকর ভারসাম্যের ওপর। মিশ্রচাষ এইরকম স্বাস্থ্যকর ব্যবস্থার সাথে একীভূত হয়ে আছে।”

কিন্তু সচেতনভাবে নির্বাচিত সহযোগী গাছপালা রোপণের অনুশীলনের মধ্যেও সীমাবদ্ধতা আছে। বৈষম্যমূলক ভাবনায় আমরা যেসব গাছপালাকে নির্বাচন করা দরকার বলে মনে করি, তা উদ্ভিদজগৎ সম্পর্কে আমাদের সীমাবদ্ধ জ্ঞানের ওপর প্রতিষ্ঠিত। একজন প্রাজ্ঞ চাষি জানে যে আগাছাদের উপ্ত করে প্রকৃতি — মানুষ নয়, তাই সব সময়ই আগাছার আবির্ভাবের কিছু অজানা কারণ থেকেই যাবে। তাই বিষয়টি প্রকৃতিতে যতটা সম্ভব যেভাবে ঘটে তার ওপর ছেড়ে দেওয়াই ভালো। একারণেই ভাস্কর সাভে ১৯৫২ সালে সুরেন্দ্রনগরে যে ঐতিহ্যশালী চাষিকে সাক্ষাৎ করেছিলেন, তিনি তাঁর ছ-ধরনের ফসলের চারপাশে বুনো গাছ-পালার বেড়ার (wild hedge) সংস্থানও রেখেছিলেন। এই বুনো গাছপালা (wild hedge) গাছের গায়ে ক্ষুদ্র আবহাওয়ামণ্ডলী (micro-climate) নিয়ন্ত্রণ করার পাশাপাশি খাদ্য-ফসলভুক কীটপতঙ্গের প্রাকৃতিক খাদকের আবাস হিসাবে ফসলের দেখভাল করত।

ভাস্করভাইয়ের ছেলে নরেশ সাভের দ্বারা প্রতিপালিত সোনালি খামার থেকে প্রাপ্ত বীজগুলির থেকে বড়ো হওয়া গাছগুলির মধ্যে রয়েছে কয়েকটা আপতগাছ (বেউহিনিয়া রেসেমোসা)। বহু মারাঠি এই গাছটিকে পবিত্র মনে করে। এর পাতাগুলিকে বলা হয় ‘সোনা’ (gold)। বর্ষার পর দশেরা উৎসবে সামাজিক শুভেচ্ছা বিনিময়ের প্রথায় এগুলি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

নরেশভাই আমাদের একটা আপতা গাছ দেখালেন আর বললেন, “আপনারা লক্ষ্য করেছেন যে গাছটার প্রতিটা পাতা ফুটো হয়ে আছে। এগুলি পোকায় খাওয়ার ফল। এই গাছগুলি পোকাদের দৃষ্টি ফলগাছগুলির থেকে তাদের নিজের দিকে আকর্ষণ করে। ফলে আমরা এখানে তাদের



ভ্যান বাদিতে ‘গোলাপকপি গড়’, ছবি জাল থানাওয়াল

দেখে খুশি। তেমনি প্রকৃতির বীজে বড়ো হওয়া দেশজ গাছ আছে যারা ফসলভুক পোকাদের খায় এমন বহু পাখিদের আকৃষ্ট করে। একটি প্রাকৃতিক খামারে এদেরও প্রয়োজন আছে।

কিছু আদিবাসীদের মধ্যে একটি পুরোনো ঐতিহ্যগত প্রথা আছে। সেটি হল তারা ফসলের খেতে ঝোপের ধারে একটা অঞ্চলের ফসল ছেড়ে রাখে পাখিদের খাওয়ার জন্য। এই পাখিরা ফসলভুক পোকাদের সাবাড় করে। এইভাবে তারা যত শস্য নিজেরা খায় তার থেকে বেশি শস্য রক্ষা করে।”

কল্পবৃক্ষে একটি বোর্ডে এই সূত্রটি লেখা আছে, “দানে দানে পে লিখা হয় হ্যাঁ খানেওয়ালে কা নাম” — “প্রতিটা শস্য দানায় লেখা আছে কোন জীব তা খাবে।” এটাই হল প্রাকৃতিক চাষের নানাবিধ শর্তাবলীর নির্যাস (essence) যা কাউকে অস্বীকার করে না। এর অধিষ্ঠাত্রী দেবী হলেন অন্নপূর্ণা, সেই করুণাময়ী মা যিনি সকলের মুখে অন্ন তুলে দেন। এমনকী যম তাঁর রথচক্রকে সেবা করে — কিংবদন্তীসম ‘মরণ দেবতা’। কারণ মৃত্যু হল এক প্রাকৃতিক নিয়ম যা প্রাচীন ও অশক্তদের সক্ষম করে তোলে যাতে তারা তাদের শরীর দিয়ে নতুন ও স্বাস্থ্যবানদের মদত করতে পারে। চিরদিন সবকিছু আমারই থাকবে — মানুষের এই ভাবনা নির্বুদ্ধিতা ছাড়া আর কিছুই নয়।



দানে দানে পে লিখ্যা হয়, খানেওয়ালেকা নাম//
প্রতিটি দানায় লেখা হয়ে আছে, তা কে খাবে

পঞ্চগব্য : ভাস্কর সাভের প্রণালী (recipe)

পঞ্চগব্য শব্দটি এসেছে ‘পঞ্চ’ (পাঁচ) ও ‘গব্য’ (গোজাত দ্রব্য) থেকে। গোরু থেকে উৎপন্ন এই পাঁচটি দ্রব্য হল গোবর, গোমূত্র, দুধ, ছানা ও মাখন। তারা অণুজীবদের বৃদ্ধিকে প্রভাবিত করে। ফলে দেশজভাবে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে যেসব মিশ্রণ তৈরি করা হয় তাতে তাদের ব্যবহার করা যেতে পারে। এ প্রক্ষে চাষিরা বিভিন্ন প্রণালী ব্যবহার করে। সাধারণত বিভিন্ন গাছ-গাছড়া মেশানো হয় এবং এগুলিকে মারীপোকা নিয়ন্ত্রণে ব্যবহার করা হয়। ভাস্কর সাভে পঞ্চগব্য তৈরি করতে যে প্রণালীর কথা বলেন তা নিম্নে লেখা হল : ৫-৭ লিটার দেশি গোরুর মূত্র ও ৫-৬ কেজি তাজা গোবর সংগ্রহ করুন। একটি ৫০ লিটার ড্রামে এগুলি মেশান। তার সাথে মেশান : ২ কেজি তেতো নিমের পাতা, ২ কেজি করঞ্জ পাতা, ২ কেজি আদুলসা পাতা, ৩০০ গ্রাম ঝোলা গুড় (molasses/jaggery) (যা মদ গাঁজলাতে ব্যবহার করা হয়) ও এক কেজি বাজরার আটার, ২-৩ লিটার পুরোনো ‘টক’ ঘোল (২০ দিন ধরে গাঁজলিয়ে তৈরি), কোরফাদ-এর (Indian aloe) ৩টি পাতা, রুই (rui) -এর ৫টি পাতা, সীতাকলার (আতা) কয়েকটি পাতা, ডাভদো (dhavdo) ও রেড়ির পাতা — এগুলি যেমন যেমন পাওয়া যাবে — সেগুলি দিয়েই শুরু করুন, পরে পেলেও তা মেশান।

এই মিশ্রনটিকে আপনার বাড়ির থেকে বেশ কিছুটা দূরে একটি গাছের নিচে অথবা সুবিধাজনক বসবার জায়গায় ভালো করে গাঁজলান। (খুব শীঘ্রই এটি পচে যাবে!) ২১ দিন ধরে প্রতি একদিন অন্তর একটি লাঠি দিয়ে মিশ্রনটিকে ভালো ভাবে নাড়ুন। এর সাথে অতিরিক্ত চোনা, গোবর — যা পাবেন তা যোগ করুন।



গাছ পিপড়ে

টীকা ও উল্লেখিত গ্রন্থাদি

- ১। আদিবাসীরা এটা করেন এইভাবে : এক গামলা মাটিতে এক মুঠো ছাই ছড়িয়ে দেওয়া হয়। বিড়াল মাটি খেঁটে এসে গামলায় অথবা এইরকম চওড়া কোনো ফাঁপা পাত্রে মলত্যাগ করে। এরপর মাটি দিয়ে ঢাকা বিড়ালের মল ক্ষেতের চারপাশে ছড়িয়ে দেওয়া হয়। এটি ইঁদুরের কাছে গ্লবিপদের সতর্কতা' বলে মনে হয়। ইঁদুরের হাত থেকে ফসল বাঁচানোর আর এটি ঐতিহ্যগত উপায় হল ক্ষেতের চারপাশে সেতু গাছ (মিষ্ক বৃশ, ইউফোরিয়া টিরকালী)
- ২। সালিম আলী।
- ৩। Winin Pereira, 'Frogs : Jumping to Ecological Disaster, Anusandhan, April, 30, 1986.
- ৪। Rachel Carson, 'Silent Spring', 1962, Penguin.
- ৫। 'Pesticides, e Super Pest'; M.G. Srinath, in Ecological Vision, 1989, pg.57.
- ৬। 'Pesticide Alert', Lawrie Mott and Karen Synder op cit. published in 'Amicus Journal, Spring, 1988 reprinted in the dossier, 'Return to the Good Earth', Third World Network p9.209.
- ৭। 'World's Changing Food Scenario', T.S. Ananthu, published in Ecological Vision', pg.19, 1989.
- ৮। 'Resistant pests pose worldide danger', New Scientist, February 26, 1987 February 26, 1987, reprinted in Return to the Good Earth, op cit, pg.167
- ৯। 'Pesticide Alert', Lawrie Mott and Karen Synder op cit. pp.207-10.
- ১০। পূর্বে উল্লেখিত
- ১১। পূর্বে উল্লেখিত
- ১২। M.G. Srinath, op cit. ১৩। 'Poison in your Food', Raj Chengappa and Chidanand Rajghatta, published as the lead feature in 'India Today', 15-6-89
- ১৪। পূর্বে উল্লেখিত
- ১৫। পূর্বে উল্লেখিত
- ১৬। পূর্বে উল্লেখিত
- ১৭। 'Why Pesticides can Never be Safe', Amitya Baviskar and Chiranjeev Bedi, first published in the Illustrated Weekly of India; reprinted in 'Return to the Good Earth', op cit. pg.222.
- ১৮। S.Jayraj, Vice Chancellor, Tamil Nadu Agricultural

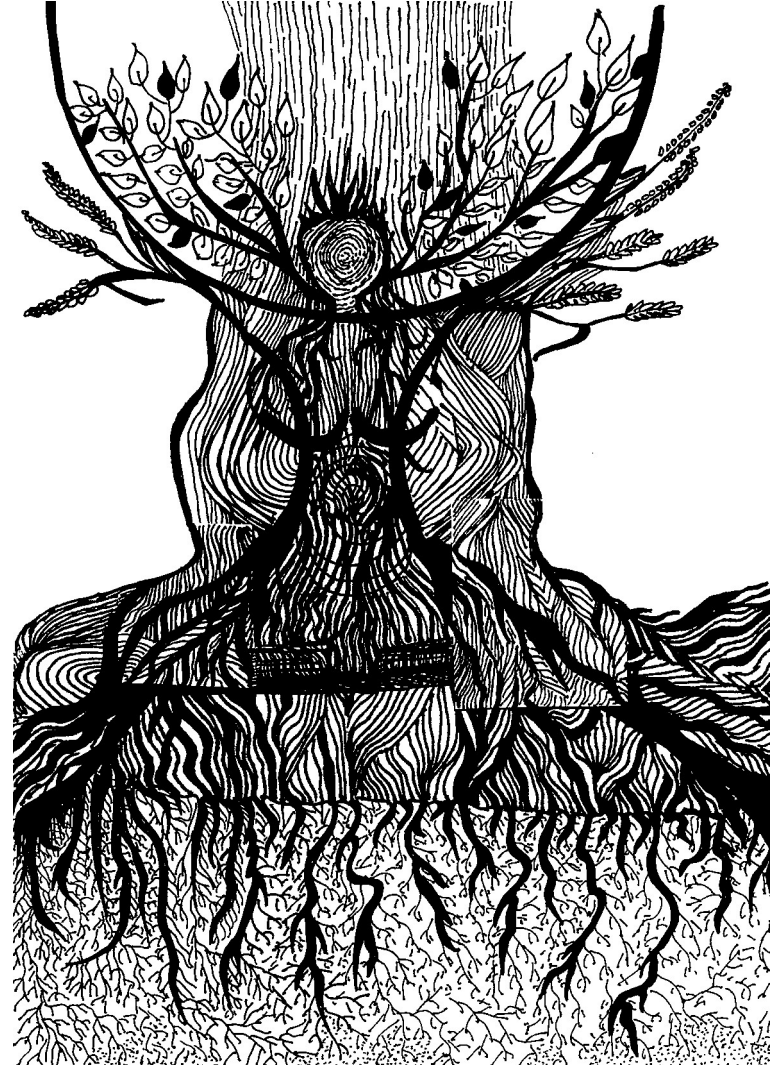
University, Coimbatore, on 21-11-88 at a Bio-control Seminar.

১৯। 'Tending the Earth', Winin Pereira, Earthcare Books, 1993, pp.228-29.

২০। উইয়ের বিরুদ্ধে আরেকটি সাধারণভাবে গৃহীত পদক্ষেপ ছিল গাছগুলির মূল কান্ডগুলি মূল কান্ডগুলিকে রং করে দেওয়া। বিশেষ করে যে গাছগুলি রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে থাকতো সেগুলিতে মোরিন্ডা সিট্রিফোলিয়া গাছের মূল বেটে তাতে অন্য কয়েকটি উপাদান যেমন রসুন বেটে মিশিয়ে যেমন রং পাওয়া যেত তা লেপে দেওয়া হতো। আবার এই রকম রঙের আর একটি কার্যকরী ফর্মুলা হল দিকামলীর (গার্ডেনিয়া গামিফেরা) আটা ১ ভাগ, অ্যাসাফিটিডা ভাগ এবং রেডির বীজের খোল ২ ভাগ মিশাতে হবে। (Ref. 'Al Dye - Various Forms of Morinda', The Agricultural Ledger, 1895, No.9 pg.1; also mentioned in 'Tending the Earth', op cit. pg.217)

২১। 'Chemical-Free Pest Control', Shylaja Rao, Research Foundation for Science, Technology and Ecology,

জল অমৃত



নবীনা ভেক্ট-এর আঁকা

জল অমৃত

শান্ত হৃদ, আঁকা-বাঁকা নদী
 ঢেউয়ে ভরা সাগর
 আর পান্না সবুজ বন থেকে
 ভেসে ওঠা কুয়াশা আর ফুলে ওঠা মেঘমালা
 চলেছে দলে দলে মাটির তীর্থে
 অমৃত ধারায় ধরণীকে সিক্ত করবে বলে।

বর্ষা নবীকরণের স্বাতুর আগমন ঘোষণা করে। এই তো মল্লারের সময়।
 মূল-হার মানে নোংরা বা ক্ষয়ে যাওয়া সব কিছুকে ধুয়ে ফেলে সজীব ও
 নতুন-কে আহ্বান করা।



বৃষ্টি আকাশ থেকে পড়ে না,
 তা ওঠে মাটি থেকে — ফুকুওকা

শক্তির (energy) মহাজাগতিক উৎস যা জলচক্র বা প্রকৃতির জল চাকাকে
 ত্র্যমগত সচল রাখে তা হল সূর্য। তারই উষ্ণতায় জল পরিশুদ্ধ বাষ্প রূপে

মাটি থেকে আকাশে ওঠে এবং কুয়াশা, শিশির, তুষার বা শিলাবৃষ্টি রূপে
 আবার মাটিতে ফিরে আসে।

সূর্য জলকে পরিশুদ্ধ ও পরিবাহিত করে। তারপর সেই সজীব জল
 মাটিকে নির্মল ও পুনরুজ্জীবিত করে। যে মাটি গাছের ছায়ায় ঢাকা থাকে
 না অথবা গাছের শিকড় যাকে আটকে রাখে না — সেখানে ভারী বর্ষণ
 বিপুল পরিমাণ মাটি বয়ে নিয়ে যায় ঝরনা ও নদী দিয়ে সাগরে।

যেখানে মাটি ঘন গাছ-পাতার চাদরে ঢাকা থাকে, সেখানে বাতাসের
 ছোঁয়ায় ভূতল অঞ্চল অনেক বেশি শীতল হয়। সবুজ বনের মাথায়,
 চাঁদোয়াও বাষ্পমোচন করে চারপাশের পরিবেশের আর্দ্রতা বৃদ্ধি করে এবং
 আশপাশের বাতাসের তাপমাত্রা কমায়। এরকম পরিবেশে জলকণারা বেশি
 মাত্রায় শিশির ও বৃষ্টিতে ঘনীভূত হয়।

গাছ-গাছালি বাতাসে জৈব নিউক্লিয়াই-এর জোগান দেয়, যার চারপাশে
 বৃষ্টির ফোঁটা ঘনীভূত হয়, ঘনত্বে বাড়ে এবং মাটিতে নেমে আসে। বনভূমি
 তাই মেঘের ‘বীজ’কে উত্তপ্ত করে যা বাড়তে থাকা ‘জগের’ সাথে ফুলে
 ওঠে এবং বৃষ্টির সাথে জন্ম দেয়।

আর যেখানে শীর্ষ-মাটিতে (top-soil) উদ্ভিজ্জসার (humus) থাকে
 — এই ঘন স্পঞ্জের মতো জিনিসটি জীবনের ছন্দে স্পন্দিত হতে হতে,
 বৃষ্টির অভাবে সরাসরি বাতাস থেকে আর্দ্রতা শুষে নিয়ে মাটিকে আর্দ্র রাখে।

মিষ্টি জল

যদি আমরা লবণাক্ত সাগর ও মহাসাগর এবং বরফ বা তুষার হিসাবে
 ঘনীভূত জলকে বাদ দিই, তাহলে পৃথিবীর ৯৮.৪% মিষ্টি জল রয়েছে
 মাটিতে বাষ্প ও ভৌমজল হিসাবে। শুধুমাত্র ১.৬% জল রয়েছে নদী, হ্রদ,
 জলা ও অন্যান্য ভূতল জলাধারে。(২)

শুধু দক্ষিণ আমেরিকার পরেই পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি বৃষ্টিপাত হয়
 ভারতে। আমাদের বাৎসরিক গড় বৃষ্টিপাত হল ১১৫০ মিমি বা প্রায় ৪
 ফুট, কথাটার মানে হল বৃষ্টির সমস্ত জল যেখানে পড়ে, যদি সেখানেই
 জমা হত (সমস্ত ভূমি সমতল ও সমান বৃষ্টি পায় ধরে নিলে), তাহলে
 আমরা সারা দেশের মানুষ কোমর জলে ডুবে থাকতাম। জলের সমস্ত রকম
 ভূপতন (precipitation) (যেমন বৃষ্টি ছাড়াও কুয়াশা, শিশির, তুষার ও
 শিলাবৃষ্টি) ধরলে এদেশে তার পরিমাণ বছরে ৩৫০ মিলিয়ন হেক্টর মিটার —
 যে পরিমাণ জল সমগ্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পতিত হয়। তবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে

ভূমির পরিমাণ ভারতে ভূমির পরিমাণের তিনগুণ।

ভারতে গড়ে বৃষ্টিপাতের প্রায় অর্ধেক অংশ মাটিকে ভিজিয়ে মাটি ও ভূগর্ভের বিভিন্ন স্তরে সঞ্চিত থাকে। বাকি জলের বেশিরভাগটাই হয় বাষ্পীভূত হয়, নয়তো ঝরনা, নদী দিয়ে বয়ে গিয়ে সাগরে মেশে। এই অর্ধেক জল যা মাটি শুষে নেয় তার ১/৩ অংশ চুইয়ে গভীরতর স্তরে প্রবেশ করে ভূগর্ভস্থ জলাধার বা জলস্তর ভরিয়ে তোলে। ভৌমজলের বাৎসরিক পুনর্ভরণ (replenishment) হয় প্রায় ৫৫-৬৫ মিলিয়ন হেক্টর মিটার। এই হিসাবটি সেচের জল ও নদী-হ্রদ থেকে চুইয়ে এসে যে পরিমাণ জল পুনরায় শোষিত হয় সেই হিসাবের অন্তর্ভুক্ত। সারা দেশে প্রাকৃতিক বা মানুষের তৈরি ভূতল জলাধারগুলি যতটা জল ধরে রাখে তা এর তুলনায় শুধু একটা ছোটো ভগ্নাংশ মাত্র।

তাই মাটি ও তার আভ্যন্তরীণ জলাধারগুলি আপনা-আপনি সৃষ্টি (ready-made) বিনা পয়সায় প্রকৃতির দান হিসাবে পাওয়া বিশাল সব জলাধারের ভূমিকা পালন করে। বনভূমি ও গাছপালায় ঢাকা জমি বৃষ্টি শোষণ করতে বিশেষভাবে কার্যকর এবং এই শোষণের প্রক্রিয়া চলতেই থাকে যতক্ষণ না তারা জলে সম্পৃক্ত হয়। তারপর আস্তে আস্তে অতিরিক্ত জল ভূগর্ভস্থ জলাধার বা ঝরনায় ছেড়ে দেয় — যারা আবার শুখা সময়ে নদীতে জল সরবরাহ করে। আর তাই বর্ষা চলে যাবার পরেও ভারতের বেশিরভাগ অঞ্চলে সারা বছর ধরে যথেষ্ট পরিমাণে মিষ্টি জল পাওয়া যেত, কিন্তু গাছ ও জঙ্গল কাটলে মাটির এই বৃষ্টি শুষে নেবার ক্ষমতা ভীষণভাবে কমে যায়, ফলে ঝরনা ও কুয়োগুলি শুকিয়ে যায়। এমনটাই ইতিমধ্যে ঘটেছে সারা দেশের বহু বহু জায়গায় এবং তা প্লেগের মতো দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে।



জঙ্গল নদীর মা

মোদা কথাটা হল, বাস্তুতাত্ত্বিক এবং কার্যকর ভাবে জলচাষ ও সংরক্ষণের মূল কাজটিই হল (ভালো নিকাশি জমিতে) বনভূমি ও গাছের আচ্ছাদনের

পুনরুজ্জীবন ঘটানো। মিষ্টি জলের প্রাকৃতিক প্রাচুর্য ফিরিয়ে আনার চাবিকাঠি হল এটাই।

বন্যা ও খরা আসে যুগল পরস্পরায়

বছরে ৪৫০ ইঞ্চি (প্রায় ৩৮ ফিট) বৃষ্টিপাত নিয়ে চেরাপুঞ্জি পরিচিত ছিল ভারতের সবচেয়ে বেশি এবং সম্ভবত পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি বৃষ্টিপাতের অঞ্চল হিসাবে। এখন এই অঞ্চল জলের অভাবে ভুগছে। কারণ উচ্চতর ঢালগুলিতে বনচ্ছেদের ফলে মাটির জল শোষণ ও ধারণ ক্ষমতা ভীষণভাবে হ্রাস পেয়েছে। এর ফলে প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টির জল দ্রুত বাংলাদেশের দিকে ধেয়ে যাওয়ায় সেখানে প্রতি বর্ষায় ভয়ংকর বন্যা হয়। গ্রীষ্মে চেরাপুঞ্জিতে দেখা যায়, উপত্যকা থেকে বহু মানুষ তাদের দৈনিক চাহিদা মেটাতে মাথায় করে জল বয়ে নিয়ে যায়।

১৯৭০ ও ১৯৮০-র দশক জুড়ে পৌনঃপুনিক বন্যা এলাকার বৃদ্ধি ঘটেছিল তিনগুণ। এটি ঘটেছিল অববাহিকা অঞ্চলগুলিতে মাটির জলধারণ ক্ষমতা ভয়ংকর ভাবে হ্রাসের ফলে, বয়ে-যাওয়া-জলের (run off) পরিমাণ ভীষণভাবে বৃদ্ধি পাওয়ায়। ১৯৮৩ থেকে ১৯৮৭ সালের মধ্যে ভারতের অর্ধেকের বেশি জেলা বন্যা ও খরা — এই উভয় সমস্যায় ভুগেছে।

১৯৯০ দশকে বিখ্যাত বাস্তুতাত্ত্বিক (ecologist) ডি এম মেহের হোমজী ২৯টি আবহাওয়া নিরীক্ষণ কেন্দ্রের দীর্ঘমেয়াদি বৃক্ষাদি (long term vegetation) ও বৃষ্টিপাতের সমীক্ষার ভিত্তিতে নির্দেশ করেছিলেন যে বনচ্ছেদের ফলে বছরে গড় বৃষ্টি দিবসের (rainy days) সংখ্যা বিশেষভাবে হ্রাস পায়। যার ফলে কম সময় জুড়ে অধিকতর প্রবল বৃষ্টির বৃদ্ধি ঘটে এবং সাথে সাথে মধ্যবর্তী সময়ে দীর্ঘতর শুখা মরসুম দেখা যায়। অধিকতর বয়ে-যাওয়া-জল (run off) ও ভূমিক্ষয় মৌসুমি বন্যার প্রাবল্যকে বাড়িয়ে দেয় এবং সাথে সাথে গ্রীষ্মকালীন দাবদাহ বা খরা বাড়িয়ে তোলে।

২০১০-এর দশকে আমরা গভীরতর সমস্যার জালে জড়িয়ে পড়ছি। আবহাওয়ার বদল ও নিরবিচ্ছিন্ন বনচ্ছেদের সম্মিলিত ফলে আবহাওয়ার সাধারণ পূর্বাভাস হল অধিকতর খামখেয়ালি বর্ষার প্রাদুর্ভাব ঘটবে এবং সুস্পষ্টভাবে বছরে বৃষ্টির দিনের সংখ্যা হ্রাস পাবে। এইরকম খুব বেশি শুকনো ও খুব বেশি ভিজে সময়ে বৃক্ষশূন্য, মৃত ও শক্ত হয়ে জমাট বাঁধা মাটিতে জলধারণ ক্ষমতা বিশেষভাবে কমে যায়। অবশ্যম্ভাবীভাবে এই বেশি পরিমাণ অ-শোষিত জল বয়ে গিয়ে নদীর নিম্নস্রোতে বেশি প্রবাহিত হওয়ার

ফলে ঘাতক বন্যার সৃষ্টি করে, তেমনি উচ্চতর অববাহিকা অঞ্চলগুলিতে গ্রীষ্ম নিয়ে আসে অধিকতর খরা, মৌসুমি ফসল — যেগুলি ভারতে কৃষি-উৎপাদনের গরিষ্ঠ অংশ — সেগুলি অসম ও খামখেয়ালি বৃষ্টিপাতের জন্য ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

জীবাশ্ম জল

গত কয়েক দশক ধরে ভূগর্ভস্থ জলতলের পতন ঘটেছে নাটকীয় ভাবে। উত্তর গুজরাতে বহু জায়গায় ভৌমজল (ground water) নেমে গেছে ১২০০ ফুটের নিচে। বৃষ্টির জল ভূগর্ভে জীবাশ্ম জল হিসাবে সঞ্চিত হয় হাজার হাজার বছর ধরে। মাটির গভীরে সুদীর্ঘ সংযোগের ফলে এইসব লবণ দ্রবীভূত হয়ে জলে মেশে। আমরা পঞ্চাশ বছরে ইতিহাসের এক হাজার বছরের জল তুলে নিয়েছি।

ভাস্কর সাভে উদাহরণ দিচ্ছিলেন — “উত্তর গুজরাতে মেহসীনা জেলার কিছু খামার-মালিকের আমন্ত্রণে আমি সেখানে গিয়েছিলাম। গাছে জল দেবার জন্য পাম্প করে জল তোলা হচ্ছিল। আমি সেই জল ছুঁয়ে অবাক হয়ে দেখলাম যে তা অত্যন্ত উষ্ণ। স্বাদ নিয়ে দেখলাম তা খুব নোনা। আমি কৃষকদের কাছে জানলাম যে সেই জল তোলা হচ্ছে ১৪০০ ফুট গভীর থেকে।”

আমরা এত নিচে নামলাম কীভাবে?

যদিও বৃষ্টির বদান্যতায় মাটিতে জলের নবীকরণ হয় প্রতি বছরেই, আগ্রাসি বাজারের দাস মানুষের কারিগরিতেই এই জলসংকট ছড়িয়ে পড়েছে দূর থেকে দূরে। মাটির তলায় জলস্তরে জলের জোগান গেছে কমে, ফলে জলস্তর নেমে গেছে। কিন্তু সামগ্রিকভাবে জলের ব্যবহার ক্রমাগত বাড়ছে।

সর্বত্র ঋণ, ভরতুকি এমনকী বেশ কিছু রাজ্যে বিনা পয়সায় বিদ্যুৎ ইত্যাদির সাহায্যে গভীর খনন-কুয়া (deep bore-well) ও উচ্চক্ষমতার পাম্পের ক্রমাগত প্রসার করা হচ্ছে। এটি ভৌমজলের উত্তোলনকে বহুগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে। ভারতে ১৯৫০ সালে এই খনন করা জল প্রতিদিন যে মাত্রায় তোলা হত, আজ তার পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে ২০ গুণ। উপকূল অঞ্চলগুলিতে এই অতিরিক্ত ভৌমজল উত্তোলন সাম্প্রতিক দশকগুলিতে আরেক ধরনের সর্বনাশ ডেকে এনেছে। যেহেতু ভূগর্ভস্থ মিষ্টি জলের প্রস্রবণগুলিতে (aquifers) মিষ্টি জলের মাত্রা কমে আসছে, ভৌমজলস্তরে

সমুদ্রের জল ঢুকে পড়ে দখল নিচ্ছে, ফলে জল লবণাক্ত হয়ে পড়ছে।



ভাস্কর সাভে কথা বলছেন লেখকের সাথে, ভরত মনসাতা

উপকূলের যে অঞ্চলগুলিতে শিল্পাঞ্চল ও নগর গড়ে উঠেছে সে অঞ্চলগুলি সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

জনসংখ্যা বৃদ্ধির বিষয়টি মেনে নিলেও, কয়েক দশক আগের তুলনায় আজ মাথাপিছু ভৌমজল উত্তোলনের পরিমাণ বহুগুণ বেড়ে গেছে। এই নির্বোধের মতো অপচয়ের বেশিরভাগটাই করছে কতিপয় মানুষ। ভারতের বেশিরভাগ মানুষ যারা গ্রামে গ্রামে হাতে তোলা জল ও বৃষ্টির জলের ওপর নির্ভর করে, তারা বহু প্রজন্ম আগে মাথাপিছু যে পরিমাণ জল ব্যবহার করত, আজও তাই করছে।

বহু গ্রামাঞ্চলে (এবং কিছু শহরের কেন্দ্রেও) সাধারণ মানুষের দ্বারা ব্যবহৃত মাথাপিছু এই স্বল্প পরিমাণ জলের মাত্রাও কার্যত কমে গেছে। কারণ বর্ষা ফিরে আসার অনেক আগেই গ্রামসমাজের খোলা কুয়ো ও হাত-পাম্পগুলি শুকিয়ে যায়। কিন্তু একটি ক্ষুদ্র সংখ্যক সম্পন্ন মানুষ — সমগ্র জনসংখ্যার ১০% থেকে কম — ১৯৫০ সালে তারা যে পরিমাণ জল ব্যবহার করত, এখন তার চেয়ে ৪০ গুণ বেশি জল ব্যবহার (এবং অপচয়) করছে।

অর্থনৈতিক ভাবে ‘এলিট’ সম্প্রদায়ের প্রতিনিয়ত ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটাতে ভারত কংক্রিটের বিশাল সব বাঁধ-দেওয়াল (dam walls) নির্মাণ

করেছে যা দিয়ে নদীর প্রবহমান জলকে বিশাল সব জলাধারে ধরে রাখা যায়। এখন আবার আমাদের সরকার ‘সব প্রকল্পের মা’ — ৫,৬০,০০০ কোটি টাকার এক বিশাল প্রকল্পের প্রস্তাব করেছে যা দিয়ে নদীগুলির জলের গতি পরিবর্তন করা হবে। ভাস্করভাইয়ের মতে এতে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কথা একেবারেই ভাবা হয়নি। এটি একটি তুঘলকি পাগলামি ছাড়া কিছুই নয়।

সর্দার সরোবর বাঁধের ওপর সাভের মন্তব্য

১৯৯৩ সালে ভাস্করভাই ভারতের যোজনা কমিশনের ডঃ জয়ন্ত পাটিলের একটি চিঠি পান। ডঃ পাটিল তখন গুজরাতে নর্মদা নদীকে বাঁধার অঙ্গ হিসাবে বিশাল সর্দার সরোবর প্রকল্পের ওপর সমীক্ষা করার জন্য সৃষ্ট কেন্দ্রীয় সরকার নিযুক্ত একটি কমিটিকে নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন। যেহেতু সর্দার সরোবরের এক বিরাট পরিমাণ জল খামার ও গ্রামগুলির উন্নতির জন্য সেচে ব্যবহারের পরিকল্পনা করা হয়েছিল, সমীক্ষা কমিটি একজন অভিজ্ঞ চাষি হিসাবে ভাস্কর সাভের মতামত জানতে চেয়েছিল।

উত্তরে ভাস্কর সাভে একটি বিশাল বিস্তৃত চিঠি পাঠান (১৬ বছরেরও আগে), তার থেকে কিছু উদ্ধৃতি নিচে দেওয়া হল : আমি একজন ৭২ বছরের কৃষক। আমি এমন এক পরিবারে জন্মেছি, বহু প্রজন্ম ধরে চাষই যাদের পেশা। শৈশব থেকে নানাবিধ কৃষির বিস্তৃত অভ্যাসকে (practices) খুব কাছ থেকে আমি লক্ষ্য করেছি। আমার সুদীর্ঘ ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে আমি প্রত্যয়ের সাথে বলতে পারি যে কার্যকর ও সুস্থায়ী কৃষিতে সেচের প্রয়োজন হয় অত্যন্ত অল্প — আধুনিক কৃষিতে সাধারণত যে পরিমাণ সেচ দেওয়া হয়, তার এক সামান্য ভগ্নাংশ মাত্র।

যখন মাটিতে একটু আর্দ্র বা ভিজ (damp) ভাব থাকে, তখনই সবচেয়ে সেরা ফসল পাওয়া যায়। ধানই একমাত্র ব্যতিক্রমী ফসল বা জমা জলেও বেড়ে ওঠে এবং তাই ঢালু জমিতে (প্লাবন-প্রবণ) রোয়ার জন্য অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। অন্য সমস্ত ফসলের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত সেচ ভীষণ ক্ষতি করে ...।

এছাড়া ঘন গাছ-পাতার আশ্রয়ের নিচের মাটি হল জলের এক বিরাট প্রাকৃতিক আধার, যা সারা বছর ধরে জল ধরে রাখে। হ্রদযুক্ত মাটি স্পঞ্জের মতো জল শোষণ করে যা টুইয়ে ভূগর্ভস্থ জলাধার বা জলস্তরকে প্রতি বর্ষায় বিপুল পরিমাণে ভরিয়ে তোলে।

“কল্পবৃক্ষ খামারে এইভাবে বর্ষার মরসুমে যে পরিমাণ জল ভূগর্ভে সঞ্চিত হয় — সারা বছর ধরে বৃষ্টিহীন সময়ে সেচের জন্য কুয়ো থেকে যে

জল তোলা হয় — তার থেকে অনেক বেশি। তাই এই অঞ্চলের বাস্তুতন্ত্র থেকে জল গ্রহণ (ভোগ) করার বদলে সমস্ত খরচা বাদ দিয়ে আমার খামার জলের মোদা সরবরাহকারীর ভূমিকা পালন করে।”

“কৃষিতে যদি আমাদের লক্ষ্য হয় আত্মনির্ভরশীলতা, আমাদের সন্তান-সন্ততিদের সুরক্ষিত করা, তাহলে সেচ ব্যবস্থার কোনো প্রয়োজন থাকে না। জাতির জন্য জল সুরক্ষা ও খাদ্য সুরক্ষা সুনিশ্চিত করার সর্বাপেক্ষা কার্যকর উপায় (বস্তুত একমাত্র উপায়) হল প্রকৃতির নিয়মগুলি অনুসরণ করে অঞ্চল-উপযোগী ফসল, উদ্ভিদ ও বৃক্ষের মিশ্রচাষ। এতে বৃষ্টিপাতের বৃদ্ধি ঘটে এবং মাটি বিপুল পরিমাণ জল শোষণ করে ভূগর্ভে সঞ্চিত করে এবং জলকে বাষ্পীভবনের হাত থেকে রক্ষা করে।”

বৃহৎ সেচ প্রকল্পগুলির ফলে যে অপরিবর্তিত ভয়ংকর প্রভাব পড়ে, ভাস্করভাই তাঁর মন্তব্যে সে কথা বলেছিলেন : “অতিরিক্ত সেচের ফলে মাটিতে এক বিরাট সমস্যা দেখা যায়, সেটি হল, মাটি নুনে ভরে যায়। দিনে দিনে লবণের এক অভেদ্য পুরু স্তরে মাটি ঢেকে যায়। (ভিজ লবণাক্ত মরুভূমি, অধ্যায় ৩, পৃষ্ঠা ৬৮)

গুজরাতে বৈশিষ্ট্যবিশিষ্ট অঞ্চলের আবহাওয়া হল শুষ্ক এবং বাষ্পীভবনও হয় উচ্চ হারে। গুজরাতে উত্তরে সৌরাষ্ট্র ও কচ্ছর দিকে যত যাওয়া যায়, বাতাস আরও গরম ও শুকনো হতে থাকে। ফলে বাষ্পীভবনের কারণে মাটির লবণাক্তকরণের হারও আরও বেশি।

“অবশ্য সবচেয়ে বেশি সমস্যার সৃষ্টি হয় অতীতের ঐতিহ্যগত মিশ্র-চাষ এবং আবর্তন ব্যবস্থা (mixed farming and rotation system) পরিত্যাগ করে আখ ও বাসমতী চালের মতো জল-পেটুক, অর্থকরী ফসলের (দু)এক রকমের চাষের ফলে।”

(সর্দার সরোবর খালের শুরুর দিকে মাহি নদী কমান্ড অঞ্চল পর্যন্ত এগারটি বড়ো ও মাঝারি চিনি কারখানা তৈরি হচ্ছে। আরও অনেক চিনি কারখানাকে লাইসেন্স দেওয়া হয়েছে বলে জানা গেছে)

ভাস্কর সাভে বলেন, “এক একর আখের খেতে যে পরিমাণ সেচ লাগে, সেই পরিমাণ জলে ২৫ একর জমিতে জোয়ার, বাজরা বা ভুট্টা চাষ করা যায়। এক কেজি বাসমতী চালের জন্য প্রয়োজন ৩০০ থেকে ৪০০ লিটার জল। আর এই চাল বৃহৎ পরিমাণে রপ্তানি করা হয়। এক কেজি ভুট্টা বা ধান-গম ইত্যাদি শস্য উৎপাদনে ১৫-১৭ লিটার জল লাগে। আর এই ফসল আমাদানী করা হয়। (এর বৈশিষ্ট্যগটাই বিষাক্ত বিটি শস্য বা ভুট্টা।) আসলে বাস্তবে আমরা আমাদের জল সম্পদ রপ্তানি করছি।”

(আরেকটি হিসাব অনুযায়ী (১ কেজি) জোয়ার, রাগি ও ভুট্টা উৎপাদনে জল লাগে ২৫ সেমি, গমের লাগে ৪৫০ সেমি, ধানের লাগে ৯৫০ সেমি এবং আখ লাগে ১২৫০ সেমি। অর্থাৎ আখ চাষে জোয়ার, রাগি ও ভুট্টা চাষের তুলনায় জল লাগে ৫০ গুণ বেশি।)

সরকার চিনি রপ্তানিরও প্রসার ঘটিয়ে চলেছে। এক কেজি শোধিত চিনির (refined sugar) জন্য দরকার অন্তত ২-৩ টন জল (চাষ থেকে প্রক্রিয়াকরণ পর্যন্ত)। এই পরিমাণ জলের ব্যবহার করা ঐতিহ্যগত জৈব পদ্ধতিতে ১৫০-২০০ কেজি জোয়ার (সরগম) বা বাজরা উৎপাদন করে আমাদের নিজেদের জনসাধারণকে খাওয়ানো যেত। অবশ্য আমাদের দেশের ভিতরেও আমরা ভারতীয়রা অতিরিক্ত মাত্রায় এই সাদা বিষ (white poison) গ্রহণ করে থাকি এবং এর ফলে আমাদের অজান্তে বিপুল মাত্রায় জলের অপচয় হয় এবং অত্যন্ত প্রয়োজনীয় আরও পুষ্টিকর খাদ্যসামগ্রীর অভাব ঘটে।



মহারাষ্ট্রের সাংলী ও বারমতী জেলায় আখ চাষের বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রগুলি লবণাক্ত হয়ে পড়েছে, এই করুণ অবস্থার জন্য ভাস্কর সাভে আক্ষেপ করে বলছিলেন, “আমরা হয়তো খাবার, জ্বালানি, সার ইত্যাদি আমদানি করতে পারব। কিন্তু জমি তো কখনও আমদানি করা যাবে না, ঈশ্বরও হয়তো আমাদের ক্ষীণ-দৃষ্টিজাত লোভের গর্ভ থেকে সৃষ্ট এই ভয়ংকর ভুলকে ক্ষমা করতে পারেন,

কিন্তু আমাদের পরবর্তী প্রজন্মরা আমাদের কখনও ক্ষমা করবে না।”

“কয়েক দশক আগে”, বর্ষীয়ান কৃষকটি বলে চললেন, “এমনকী সৌরাষ্ট্র ও কচ্ছের কিছু অঞ্চলে গাছ-গাছালি ও বনভূমি সৃষ্টি হত এবং এখন যা বৃষ্টিপাত হয় তার থেকে বেশি হত। এখন বর্ষার মরশুমে এই অঞ্চলের আকাশের ওপর দিয়ে ঘন কালো মেঘ উড়ে যায়। কিন্তু সে মেঘ বৃষ্টি আকারে মাটিতে নেমে আসে না। কারণ এখানকার গরম শুকনো বাতাসে বৃষ্টি কণারা ঘনীভূত হতে পারে না। (এখানে বৃষ্টির ‘বীজ’ বা নিউক্লিয়াই যাকে জড়িয়ে জলকণারা আয়তনে বাড়ে তারও অভাব।) আমরা দুর্ভাগ্যবশত ভুলে যাই যে বৃষ্টির অভাবে মরুভূমির সৃষ্টি হয় না। বরং সত্যটা হল এটাই যে বৃষ্টি পড়া বন্ধ হয়েছে এই কারণে যে আমরা ইতিমধ্যেই গাছ-গাছালি ধ্বংস করে মরুভূমির সৃষ্টি করেছি, তাই।”

ভাস্কর সাভে বলছিলেন, “অতীতে কচ্ছ ও সৌরাষ্ট্র তাদের সবুজ আবরণ হারিয়েছিল আসবাবের জন্য গাছপালা ও জঙ্গল নিশ্চিহ্ন করার ফলে। আজ ভারত তার গাছপালার বেশিরভাগটাই হারাচ্ছে সেচনিবিড়, রাসায়নিক নিবিড়, কৃষিকাজে, বেরোয়া উন্নয়নের প্রকল্পে ক্যানসারের মতো বৃদ্ধি পাওয়া নগরায়নের জন্য। এটাই হল মরুভূমিকরণ ও মনুষ্যসৃষ্ট দুর্ভিক্ষের পথ। একমাত্র স্বাস্থ্যকর পথ হল জলের অপচয় রোধ করা ও পুনরুজ্জীবনের প্রাকৃতিক পথ অনুসরণ করা।

যেহেতু এখন সেচে ব্যবহৃত জলের ৬০% হল অতিরিক্ত ও বস্তুত ক্ষতিকারক, তাই যে পদক্ষেপটি প্রথমে নেওয়া প্রয়োজন তা হল জল সেচের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করা। এভাবে বেশি সেচের ফলে যে ক্ষতি হয় তা যে শুধুমাত্র বন্ধ করা যাবে তা নয়, তাছাড়াও এর ফলে যে বেশ অনেকটা জল বাঁচানো সম্ভব হবে তা অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে অত্যন্ত অতীবী অঞ্চলগুলিতে সরবরাহ করা যেতে পারে।

ভাস্কর সাভের পরামর্শ হল “এর সাথে আমাদের উচিত হল দেশের ৩০% অঞ্চলে মিশ্র ও দেশজ গাছ-গাছালি যুক্ত বনভূমির পুনরুদ্ধার। এর ফলে মাত্র এক দশকের মধ্যে তুলনামূলকভাবে খুব কম খরচে অবস্থার প্রভূত উন্নতি হতে পারে। এতে বৃষ্টিপাতের বৃদ্ধি ঘটবে ও ভূজল-স্তরও উন্নীত হবে। তিনি আরও বলেন, “দুঃখজনকভাবে আমরা এটা বুঝতে ব্যর্থ যে এদেশের সমগ্র মাটির জলধারণ করার ক্ষমতা, এদেশে সম্পন্ন হওয়া এবং এখনও কাগজেই সীমাবদ্ধ রয়ে যাওয়া অসম্পূর্ণ বৃহৎ ও মাঝারি সেচ প্রকল্পগুলির সম্মিলিত জলধারণ ক্ষমতার চেয়েও বেশি। ভূগর্ভস্থ এই

সবুজ সৌরাষ্ট্র

কল্পনা করুন এমন এক সৌরাষ্ট্র যা সর্বত্র সবুজ, যেখানে বয়ে চলেছে নদী আর যেখানে রয়েছে মিষ্টি জলের বৃহৎ সব জলাধার। সেখানে গড় বৃষ্টিপাত আজকের চেয়ে অনেক বেশি।

সৌরাষ্ট্র এরকমই ছিল। সুবারাও, এস আর রাও, পি পি পান্ডায়া এবং ওয়াই এম চিতালওয়ালার মতো প্রত্নতাত্ত্বিক, যাঁরা এই অঞ্চলে দীর্ঘদিন ধরে প্রগাঢ় অধ্যবসায়ের সাথে কাজ করেছেন, তাঁদের বক্তব্য এরকমই। গত ৫০ বছর ধরে তারা এই অঞ্চলে সিন্ধু সভ্যতার অন্বেষণ সহ অন্যান্য কারণে প্রায় ৫০ জায়গায় খনকার্য চালিয়েছেন।

হরপ্পার প্রায় কুড়িটি অঞ্চল, যেমন লোথাল, খানপুর (মোরবির কাছে), কুনতাসি ইত্যাদি স্থানে খননকার্যের ফলে জানা গেছে যে অতীতে এই অঞ্চলগুলিতে ছিল জলের প্রাচুর্য এবং এসব অঞ্চলে কৃষির সমৃদ্ধি ঘটেছিল। ... প্রধান দানাশস্য ছিল বাজরা। প্রায় সমস্ত প্রাচীন স্থানই (sites) মিষ্টি জলের বৃহৎ জলাধার, যেমন প্রাকৃতিক হ্রদ বা হরপ্পাবাসীদের দ্বারা নির্মিত জলাধারের ধারে অবস্থিত ছিল।

মৌর্য শাসনকালে খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দী থেকে দ্বিতীয় শতাব্দী জুড়ে দ্রষ্টব্য স্থানগুলি থেকে জানা যায় যে জলচাষ (water harvesting) ও সেচ জালিকা (Irrigation network) সৃষ্টি ছিল সে যুগে বহুল প্রচলিত। এটা হল সেই সময় যখন আজ যাকে গুজরাত বলা হয়, সেখানে সুদর্শন এবং অন্যান্য বহু হ্রদ নির্মাণ করা হয়েছিল।

কিন্তু বনভূমির ধ্বংস, অতিরিক্ত চারণ (over grazing), জলচাষ ও বিদ্যমান জলাধারগুলির রক্ষণাবেক্ষণ, পলি তোলা ইত্যাদি কাজে অবহেলার ফলে পরিস্থিতিটা একেবারেই বদলে গেছে। গড় বৃষ্টিপাত ভীষণভাবে কমে গেছে। এই অঞ্চলের নদীগুলি বহুলাংশে শুকিয়ে গেছে। মিষ্টি জলের উৎসগুলি একেবারেই হারিয়ে গেছে।

ঔপনিবেশিক যুগেও বহু কৃষক অর্থকরী চাষ (cash crop) শুরু করেছিল। স্বাধীনতা লাভের পর রাসায়নিক ব্যবহার বেড়েছে, বেড়েছে সেচের প্রয়োজনীয়তাও। বেশি মাত্রায় ভূজল উত্তোলনের ফলে জলস্তর নেমে গেছে অনেক নিচে। এখন সৌরাষ্ট্র হল সারা দেশে সবচেয়ে বেশি খরায় আক্রান্ত অঞ্চলগুলির অন্যতম।

জলাধারগুলি আরও বেশি কার্যকর (efficient), কারণ ভূতল জলাধারগুলি থেকে যে বিপুল পরিমাণ জল বাষ্পীভূত হয়, ভূগর্ভস্থ জলাধারগুলি থেকে

তা হয় একেবারেই কম। এছাড়া বৃক্ষ রোপণের ফলে বিবিধ প্রয়োজনীয় উৎপাদন পাওয়া যাবে, যা থেকে বৃহত্তর সংখ্যক জনগোষ্ঠীর উপকার হবে ...।



বৃষ্টি না পড়ার জন্য মরুভূমির সৃষ্টি হয় না, কিন্তু আমরা গাছগাছালি ধ্বংস করে মরুভূমি সৃষ্টি করি, তাই বৃষ্টি পড়ে না

“এমনকী এক দশকের মধ্যে অনুর্বর পতিত জমির স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার করা যাবে। সুপরিকল্পিতভাবে একই সাথে স্বল্পমেয়াদী, মধ্যমেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদী ফসল ও বৃক্ষের চাষের মাধ্যমে ফসলের ধারাকে অব্যাহত রেখে চাষির ভরণ-পোষণ করা যাবে রূপান্তরকালীন সময় জুড়ে। যতক্ষণ না দীর্ঘমেয়াদী ফলের বৃক্ষগুলি পরিণত হয়ে প্রচুর ফল দেয়, তার আগে রূপান্তরকালীন পর্যায়ে (transitional phase) চাষি যাতে টিকে থাকতে পারে।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস, সুস্থায়ী ও স্ব-নির্ভর কৃষির জন্য বৃহৎ সেচ প্রকল্পগুলির কোনো প্রয়োজন নেই। এই প্রকল্পগুলির ফলে সাধারণত বিপুল মাত্রায় জলের অপব্যবহার হয়েছে এবং নানা সমস্যার শৃঙ্খল (chain of problems) সৃষ্টি হয়েছে। জলের চাহিদার বর্তমান প্রবণতা হল এক সীমাহীন অতল খাদের মতো। যদি জলের অপচয় এইভাবে চলতে থাকে তাহলে এমনকী এক ডজন সর্দার সরোবর প্রকল্পও যথেষ্ট হবে না!

অমৃতময় জলের নদীর বাঁধ(ন) ও ধ্বংস

ভারতে জলচাষ ও জল সংগ্রহ ব্যবস্থার এক সৃজনশীল ও সমৃদ্ধশালী ঐতিহ্য রয়েছে, যার বৈচিত্র্য অন্য যে কোনো দেশের থেকে বেশি। ঊনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত আমাদের সেচ ব্যবস্থা ছিল পৃথিবীতে সর্বাপেক্ষা বৃহৎ। ব্রিটিশরা এদেশ থেকে জলচাষ (water harvesting) শিখেছিল। বহু শতাব্দী আগে চোল রাজাদের দ্বারা খনন করা কাবেরী নদীর সাথে যুক্ত এনিকাটস্ বা খালগুলি ছিল তাদের কাছে বৃহৎ সেচের প্রথম মডেল।

সনাতন নন্দন-বন

সবচেয়ে বেশি আশাবাদী হিসেব মতো, দৈত্যসম সর্দার সরোবর বাঁধ প্রকল্প যতটা জল সরবরাহ করতে পারে, গুজরাতে বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত তার ১২ গুণ। তাই মাটিকে গাছ-গাছালি বিশেষত বৃক্ষে ঢেকে ফেলে মাটির জলধারণ ক্ষমতা বাড়ানো যায় এবং এই প্রক্রিয়াকে সাহায্য করতে পাশাপাশি যদি উপযোগী ক্ষুদ্র মাটির বাঁধ দেওয়া যায় এবং প্রাচীন জলাধারগুলিকে পলিমুক্ত করা হয়, তাহলে মঙ্গলময় ও বিকেন্দ্রীভূত রূপে বিপুল মাত্রায় জল পাওয়া যাবে অন্তত ১/১০ ভাগ কম খরচে। এই জলের পরিমাণ হবে ওই বিশাল বাঁধ (সর্দার সরোবর) এবং বিশ্বের সবচেয়ে বড়ো খাল জালিকা (canal network) (৭৫,০০০ কিমি) বিশাল পারিবেশিক, অর্থনৈতিক ও মানবমূল্যের বিনিময়ে যা দিতে চায় — তার চেয়েও বেশি।

লোভের কর্ম থেকে সৃষ্টি বুক চাপড়ানো দুঃখের সরোবরের বদলে এই সম্ভ্রমের (নবসিংহ মেহতা, মহাত্মা গান্ধীর মতো সম্ভরা) জনগণ আরও স্বাস্থ্যবান ও সুখী হত, যদি তারা অনেক নন্দন-বন (অনেক দয়ালু গাছের বন) সৃষ্টি করত। এগুলি বৃষ্টির জলধারা শুষে নিয়ে শীতল পরিষ্কার জলে পরিপূর্ণ, ছড়ানো বহু ভূগর্ভস্থ জলাধারগুলিকে ছায়ায় ঢেকে রেখে গরম সূর্য এবং শুকনো, বায়ুত্যাগিত ধূলোময় বাতাস থেকে রক্ষা করত। অবশ্য উল্লেখযোগ্যভাবে কোনো সরকার এই ধরনের কুঞ্জবন সৃষ্টি করতে পারে না, একাজ পারে শুধুমাত্র জনগণ। কিন্তু সরকার তো অন্তত আত্মহত্যার নীতিকে শুধরে স্থানীয় সামাজিক উদ্যোগগুলিকে (local community venture) সহযোগিতা করতে পারে।

১৮৯০ সালে আমেরিকার আভ্যন্তরীণ সেচ বিভাগ হারবার্ট উইলসনকে ভারতে পাঠিয়েছিল জলচাষে ভারতীয় অভিজ্ঞতা কীভাবে আমেরিকায় অনুসরণ করা যায় তা দেখতে। কিন্তু আমাদের বিস্তৃত ও ঐতিহাসালী ক্ষুদ্র সেচ ব্যবস্থা থেকে শেখার বদলে ওই দেশ আমাদের বৃহৎ সেচ ব্যবস্থায় মুগ্ধ হয়েছিল। শীঘ্রই ওই দেশটি নদীর ওপরে সবচেয়ে বড়ো বাঁধ নির্মাণকারী দেশে পরিণত হল।

অতি সম্প্রতি ১৮/৫/৯৪ তারিখে কমিশনার ইউ এস ব্যুরো অফ রিক্রেশন (USBR), যারা আমেরিকায় শত শত বাঁধ নির্মাণ করেছে, সেই সংস্থা ইন্টারন্যাশনাল কমিশন অন ইরিগেশন অ্যান্ড ড্রেনেজ-এর (ICID) সামনে ঘোষণা করেছে “ইউনাইটেড স্টেটসে বাঁধ তৈরির যুগের শেষ হয়েছে।”

ওই কমিশনার আইসিআইডি-কে আর্জি জানিয়েছে যে তারা যেন “জলের চাহিদা পূরণে অ-নির্মাণ (non-structure) বিকল্পের সন্ধান করতে উৎসাহ দেয় যাতে অতীতের অতি ব্যয়বহুল ভুলগুলির আর পুনরাবৃত্তি না ঘটে।”

১৯৫০ দশক থেকে আমাদের ক্ষীণদৃষ্টির ফলে আমরা বাঁধের পর বাঁধ নির্মাণ করে বিরাট ক্ষতিসাধন করেছি। সেজন্য আমেরিকার থেকেও ভারতে বড়ো বাঁধ নির্মাণের বিরুদ্ধে সমালোচনার অনেক জোরালো কারণ আছে। আমাদের দেশে প্রতি একর জমিতে গড় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ আমেরিকার মতো মধ্য দ্রাঘিমার দেশগুলির থেকে ৩ গুণ বেশি। আবার এদেশে এই বৃষ্টিপাতের বিশাল অংশটিই বর্ষার ৩-৪ মাস জুড়েই কেন্দ্রীভূত হয়। পক্ষান্তরে আমেরিকায় বৃষ্টিপাত হয় সারা বছর জুড়ে প্রায় সম পরিমাণে ভাগ হয়ে (evenly distributed)।

তাই এটা বুঝতে কোন অসুবিধা হয় না যে আমেরিকার তুলনায় ভারতে বৃষ্টিপাতের গড় তীব্রতা আমেরিকার ৯ গুণ বেশি। ফলে বয়ে-যাওয়া-বৃষ্টি (rain run-off) ও ভূমিক্ষয় (soil erosion), এই দুটিই আমাদের আবহাওয়ায় হয় অনেক বেশি। আমাদের সুস্পষ্টভাবে স্বতন্ত্র পরিবেশ জল (এবং মাটি) সংরক্ষণের কৃৎকৌশল (strategy) নির্ধারণে এটি নিশ্চিতভাবে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। এই বিষয়টি মাথায় না রেখে ওই সূদূর-পাশ্চাত্য জাতি — যেটি ঐতিহাসিক সময়কালের নিরিখে নেহাত শিশু — নির্মিত দৈত্যকায় প্রকল্পগুলিকে আমাদের অনুকরণ করা উচিত নয়।

আমেরিকার গ্রান্ড কোলি বাঁধ তার অববাহিকা অঞ্চলের তিন বছরের বর্ষণ ধরে রাখতে পারে। আমাদের বড়ো বাঁধগুলি এমনকী এক মাসের ভারী বর্ষণ ধরে রাখতে সক্ষম নয়। ভারী বর্ষণের সময় জলাধারে যে বিপুল মাত্রায় জল জমে তাতে বাঁধগুলি জলের চাপে বিস্ফোরিত হওয়ার হাত থেকে বাঁচাতে জল ছেড়ে দিতে হয়। এতে নদীর নিম্নস্রোতে বহুজায়গা প্লাবিত হয়।

ভারতে বাঁধ নির্মাণকারী ভারতীয় ইঞ্জিনিয়াররা মধ্য দ্রাঘিমার দেশগুলিতে (middle latitude countries) ভূমিক্ষয়ের তথ্যাবলীর ওপর ভীষণভাবে নির্ভর করে এসেছে। নির্মাণের পরবর্তীকালে দেখা গেছে বাঁধ দেওয়া নদী উপত্যকার জলাধারগুলিতে পলি জমার (siltation) অণুপাত নির্মাণের সময় যা ভাবা হয়েছিল (envisioned) কার্যক্ষেত্রে তার চেয়ে ৪-৫ গুণ বেশি। এর ফলে বিরাট অর্থনৈতিক, পারিবেশিক ও মানব মূল্য (human cost) দিয়ে তৈরি করা বাঁধগুলির কার্যকরভাবে টিকে থাকার সময়কাল (operational life period) প্রকল্পের শুরুতে যা দেখানো হয়েছিল (originally

projected) তার ১/৪ অথবা ১/৫ ভাগ কমে গেছে। শেষে এই বাঁধগুলি সম্পূর্ণভাবে পলিতে ঢেকে গিয়ে স্থায়ীভাবে অকেজো হয়ে পড়বে।

এই ক্ষণস্থায়ী লাভের জন্য বাঁধ নির্মাণের কাজে (১৯৯০ দশকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত) ১ কোটি ২০ লক্ষ ভারতবাসীকে উদ্বাস্তু হতে হয়েছে। অন্তত ১ কোটি বা ৮০%-এর ওপর এই রকম মানুষ কোথাও কোনো পুনর্বাসন পাননি।

দুঃখজনকভাবে আমাদের যোজনাকারীরা আরও বেশি বাঁধ নির্মাণের জন্য সুপারিশ করছে এবং আরও বেশি নদী ইজারা দেওয়া হচ্ছে। যদিও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পরেই পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি বড়ো ও মাঝারি বাঁধ রয়েছে ভারতেই — ১৬০০-র বেশি। এদের অর্ধেকের বেশি বাঁধ আছে শুধুমাত্র মহারাষ্ট্র ও গুজরাতে। তা সত্ত্বেও মহারাষ্ট্র ও গুজরাতে অর্ধেকেরও বেশি গ্রাম পৌনঃপুনিকভাবে এবং প্রতি গ্রীষ্মে ভয়ংকর জলাভাবে ভোগে। বাঁধের জলের এক বিরাট অংশ আখ চাষের জন্য কুক্ষিগত করে একটা ক্ষুদ্র সংখ্যক বৃহৎ জমির মালিকেরা, যেখানে পরবর্তী বড়ো অংশটা হাতিয়ে নেয় বড়ো শিল্প।

অনুমান করা হয় যে বাঁধের জলাধার থেকে খাল-জালিকা (canal network) পথে জল সরবরাহে টুইয়ে পড়া (seepage), ছাঁকা (percolation) ও বাষ্পীভবনের (evaporation) ফলে চাষিদের খেতে পৌঁছানোর আগে পর্যন্ত জলের যে ক্ষতি/অপচয় হয় তা প্রায় ৪০%-৬০%। আর একটি উৎস অনুযায়ী দেশে বাঁধগুলিতে জল ধরে রাখার মোট ক্ষমতা হল ১৮ মিলিয়ন হেক্টর মিটার (১ মিলিয়ন = ১০ লক্ষ)। এর মধ্যে যতটা সত্যিকারের কাজে লাগানো যায় এমন জলের মাপ হল প্রায় ৯ মিলিয়ন হেক্টর মিটার এবং যতটা জল খেতে-খামারে পৌঁছাচ্ছে তার উৎপাদনশীলতা হল — যা প্রত্যাশা ছিল তার অর্ধেকেরও কম — মাত্র ১.৭ টন/হেক্টর। প্রত্যাশিত জলের পরিমাণ ছিল ৪ টন/হেক্টর। এই জল পাওয়া যেত ক্ষুদ্র সেচে। উদাহরণ স্বরূপ পুকুর দীঘি থেকে। সেগুলি নির্মাণ করতে অনেক কম অর্থ লাগে।।

বড়ো ও মাঝারি সেচ প্রকল্পে ১ কোটি টাকা খরচে যতটা জমিতে জলসবরাহ করা হয়, ক্ষুদ্র সেচে সম পরিমাণ টাকা দিয়ে তার পাঁচ গুণ পরিমাণ জমিতে জল সরবরাহ করা যায়। তবুও সরকার বড়ো ও মাঝারি সেচ প্রকল্পগুলিতে ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্পগুলির তুলনায় ৫ গুণ খরচ করে আসছে।

১৫৬টি বড়ো সেচ প্রকল্পের পর্যালোচনায় দেখা গেছে যে প্রকল্পগুলিতে বহু বছর ধরে খরচ বেড়েছে ৫৬২%। প্রথম যোজনাকালে বড়ো ও মাঝারি সেচ প্রকল্পগুলি থেকে প্রতি হেক্টর জমিতে সেচ দিতে খরচ হত ১২০০

টাকা। কিন্তু চার দশক যেতে না যেতেই সম পরিমাণ এলাকায় সেচ দিতে খরচের গড় বেড়ে গিয়ে দাঁড়াল ৪০০ টাকা/হেক্টর। এই হিসাবের মধ্যে জল নিকাশের খরচ ধরা হয়নি।

এর তীব্র বিপরীত ছবিটি মেলে ক্ষুদ্র সেচে। এক শতাব্দী আগে দেশের ৫০%-এর বেশি কৃষিজমিতে পুকুর/দীঘি থেকে সেচ দেওয়া হত। সেই সেচ সেবিত জমির পরিমাণ এখন কমে দাঁড়িয়েছে ১০%-এর থেকে কম। প্রায় ৫,০০,০০০ পুরোনো পুকুর দীঘি আজও টিকে আছে। কিন্তু তাদের বড়ো একটা অংশ ভীষণভাবে অবহেলিত হয়, রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে পলি জমে প্রায় মজে গিয়েছে। বিশেষজ্ঞদের মত অনুযায়ী উপযুক্ত স্থানে সুনির্মিত সুরক্ষিত পুকুর-দীঘি — দেশের জমির ৩% এলাকা জুড়ে — দেশের সমগ্র বৃষ্টিপাতের সিকিভাগ জল ধারণ করতে সক্ষম। তা করতে গিয়ে খরচ হবে শুধুমাত্র মানব শ্রমের এবং তাতে ক্ষুদ্র সেচ অঞ্চলের বহু মানুষ রোজগার পাবে। হিসাব কষে দেখা গেছে যে দেশে ৩০৪ মিলিয়ন হেক্টর জমির মধ্যে প্রায় ১৮০ মিলিয়ন হেক্টর জমিতে বিকেন্দ্রীভূত, ক্ষুদ্র জলচাষ প্রকল্প গ্রহণ করা সম্ভব।

নষ্ট হওয়া জল

দি গাইয়া এটলাস অব প্লানেট ম্যানেজমেন্টের এক হিসাব অনুযায়ী সারা পৃথিবী জুড়ে সেচের জন্য জল ব্যবহৃত হয় প্রায় ৭৩%, শিল্পের জন্য ২২% ও গৃহকাজের জন্য ৫%। জলের চাহিদা সবচেয়ে দ্রুত বাড়ছে শিল্প ক্ষেত্রে ও তারপর নগরায়নের জন্য।

ভারতে ৮০%-এর বেশি মিষ্টিজল ব্যবহৃত হয় সেচে। এর বেশিরভাগটাই ব্যবহৃত হয় রাসায়নিক চাষ হওয়া অর্থকরী ফসলের (cash crops) ক্ষেত্রে। মহারাষ্ট্রে সমগ্র জমির ৩-৪% জমিতে শুধুমাত্র আখের চাষ হয়। এই সামান্য জমিতেই মহারাষ্ট্রের সেচের ৭০% ওপর ব্যয় করা হয়। হিসাবে দেখা গেছে যে প্রতি একর আখের জমিতে যতটা জল লাগে তা দিয়ে বেশ কয়েকটা মাঝারি আকারের গ্রামের চাহিদা মেটানো যায়। রাজ্যে ১২৬টি চিনি কারখানাও বিপুল পরিমাণ জল খায়।

একসময়কার বিবেকবান আখ চাষিরা আজ জমিদারদের মতো তাদের আরামদায়ক গৃহ থেকে মোটর পাম্পগুলির শব্দ শোনার মধ্যে দিয়েই তাদের খেতে জলের মাত্রা নির্ধারণ করে। কখনও বা মাঠের পাশে রাস্তায় পায়চারি করতে করতে তারা আখের খেতে ঢিল ছুঁড়ে জলের ছলাৎ শব্দ শুনে জলের মাত্রা নির্ধারণে সন্তোষ বোধ করে। গ্রামের সামাজিক কুয়োগুলি

(community wells) শুকিয়ে গেছে বলে তাদের মনে কোনো দাগ কাটে বলে মনে হয় না।

সারা দেশ জুড়ে ধানের অ-মরসুমি (unseasonal) চাষে সমগ্র সেচের জলের প্রায় অর্ধেকটাই ব্যবহৃত হয়। বৃষ্টি-সেবিত (rain-fed) নাবাল অঞ্চলই এই চাষের (ধান) জন্য সবচেয়ে উপযোগী। কিন্তু বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে শীত ও গ্রীষ্মে বারংবার সেচ-সেবিত ধানচাষই যে শুধুমাত্র আমাদের সেচের জলের বড়ো অংশটাই খেয়ে নিচ্ছে এবং ভূগর্ভস্থ বারনাগুলির ক্ষয়সাধন করছে তাই নয়, তাতে বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে জমি লবণাক্ত হয়ে পড়েছে এবং ধ্বংস হচ্ছে। সেচ প্রথা চালু হয়েছিল ৬০০০ বছর আগে ইরাকের মেসোপটেমিয়ার সমভূমিতে। আজ সেই অঞ্চলের বিস্তৃত অংশ লবণাক্তকরণের সমস্যায় ভুগছে।

আধুনিক শহুরে জীবনের দ্বারা সৃষ্ট জলের চাহিদা বিপুল ও দ্রুতবর্ধমান। ফ্লাস ল্যাট্রিন ও বেশ কয়েকটা কল সহ শহরের একটা বাড়িতে যত জল ব্যবহার হয় তা সমান আকারের একটি গ্রামীণ পরিবারে ব্যবহৃত জলের চেয়ে বহুগুণ বেশি। পাইপ ও কল থেকে লিক হয়েও অনেকটা জল অপচয় হয়। এর সাথে একটা লন (lawn) যোগ করুন, জল খরচের মাত্রা হবে আরও কয়েক গুণ। সুতির পোষাকের বদলে সংশ্লেষিত তন্তুর (synthetic fibre) পোশাক পরুন এবং তার উৎপাদন খরচ গুনুন, দেখবেন তা বেড়ে হয়েছে বহু শত গুণ।

অনুরূপভাবে সিমেন্ট, প্লাস্টিক, রাসায়নিক পেট্রোকেমিক্যাল, ঔষধ, সংশ্লেষিত সার, চিনি, কাগজ ইত্যাদি উৎপাদনকারী কারখানাগুলিতে বিপুল পরিমাণ জল লাগে। তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র ও পরমাণু চুল্লিতেও তথৈবচ এবং এই কারখানাগুলির ক্ষেত্রে তারা জলকে ভীষণভাবে দূষিত করে এবং তা নির্বিচারে চারিদিকে ছড়িয়ে দেয়।

বোম্বের পানীয় জলের এক বিরাট উৎস রয়েছে ভাতসায়। এখানে জল প্রায়শই আশপাশের কারখানা থেকে নির্গত ক্যানসার সৃষ্টিকারী বেঞ্জিন ও কার্বন টেট্রাক্লোরাইডের ফলে ভয়ংকরভাবে দূষিত হয়ে পড়ে। সাধারণত যে পদ্ধতিতে জল বিশুদ্ধ করা হয়, সেই পদ্ধতিতে এই রাসায়নিকগুলি জল থেকে সরানো সম্ভব হয় না। তাই বলাই যায় বোম্বের নাগরিকগণের শরীরে ধীরে ধীরে বিষ প্রবেশ করেই চলেছে।

ডাম্পাইয়ার্ডগুলি (অকেজো ভাঙা-চোরা গাড়ি ও জিনিসপত্র ফেলার জায়গা) থেকে ভয়ংকর বিষাক্ত লিচেট 'leachate' চুইয়ে ভূজলাধারে প্রবেশ করে।

বিশুদ্ধকারী বিশুদ্ধিকরণ

ডায়েরিয়ার সবচেয়ে ভালো চিকিৎসা হল বারবার প্রচুর পরিমাণে নির্মল জল পান করা। প্রচুর জলে ভর্তি ফল বা কচি ডাবের জলও খুব উপকারি। এটি শরীরকে বিষ বের করে দেওয়ার কাজে সাহায্য করে এবং পাশাপাশি শরীরকে জলশূন্য (dehydrated) হওয়ার হাত থেকে বাঁচায়। কিন্তু যা শোষণ করে সেই শোষণকারীই যদি দূষিত হয় তাহলে কী করণীয়? শুশ্রূত সংহিতায় (একটি প্রাচীন পুঁথি) একগুচ্ছ করণীয় কার্য লিপিবদ্ধ আছে। এগুলির মধ্যে রয়েছে জল বিশুদ্ধ করার জন্য অনেকগুলি উদ্ভিদের ব্যবহার। উদাহরণ স্বরূপ 'নির্মলী'র (এক ধরনের বাদাম গাছ) বৈজ্ঞানিক নাম স্ট্রিকনোজ পটাতোরাম (Strychnos potatorum) যা ভারতের বহু জায়গায় পাওয়া যায়। এই বীজগুলি কেটে মাটির হাঁড়ির ভিতরের কর্কশ জল ঘসে সেই হাঁড়িতে জল রাখলে জল বিশুদ্ধ হয়।

'সেভগা' (drumstick) /সজনে বা মরিংগা ওলীফেরা আর একটি পদার্থ ঘনকারী বস্তু (coagulant) যা জলকে নির্মল করে। এর বীজগুলোকে শুকিয়ে, গুঁড়ো করে — সেই তাজা গুঁড়ো জলে দিয়ে নাড়লে জল বিশুদ্ধ হয়। এই প্রক্রিয়ায় প্রতি লিটারে একটি বীজের গুঁড়ো আনুমানিক দশ মিনিট ধরে নাড়িয়ে জলে গুলতে হবে। এর ঘন্টাকানেকের মধ্যে বেশিরভাগ ভাসমান কণা ও অণুজীব পাত্রের তলদেশে জমা হবে। এরপর পাত্রের জলের উপরিভাগের ৩/৪ অংশ মসলিন বা পাতলা কাপড়ে ছেঁকে নিতে হবে।

নিম ও আয়ালার বীজ, তুলসি, তুলসি/আদলসা/নিমের খেঁতো করা পাতা, কলার খোসার ছাই, পোড়া চুনাপাথর, ফিটকিরি ইত্যাদিরা ভাসমান কণা ও ব্যাক্টেরিয়াকে অধঃক্ষেপের মাধ্যমে পাত্রের তলদেশে জমা করার ক্ষেত্রে কার্যকর। অনুরূপভাবে নুড়ি পাথর (gravel), নদীর বালি, কাঠকয়লা, কাশ, ঘাসের শিকড় ইত্যাদির স্তরের ভিতর দিয়ে টুইয়ে প্রবাহিত হওয়ার পর যে জল পাওয়া যায় তাকে বেশ কয়েক ঘন্টা সূর্যালোকে রাখলে তা ক্ষতিকারক অণুজীবদের হাত থেকে জলকে মুক্ত রাখার ক্ষেত্রে বিশেষভাবে কার্যকর।

আবার অন্যদিকে যদি শুধুমাত্র সমুদ্রের জলই পাওয়া যায় বা জলে রাসায়নিক দূষণকারী পদার্থ থাকে তাহলে শ্রেষ্ঠ পদ্ধতি হল ডিসটিলেশন বা পাতন (distillation)। কয়েক পাত্র জল ফুটিয়ে/বাষ্পীভূত করে সেই বাষ্প ছোটো ছোটো প্লাস্টিকের চাদরে ফোঁটায় ফোঁটায় ঘনীভূত করে সংগ্রহ করে জলকে বিশুদ্ধ করা যায়। (অবশ্য এই জলে যদি উদ্বায়ী (volatile) রাসায়নিক পদার্থ থাকে, তাহলে তা পাতন থেকে প্রাপ্ত জলে থেকে যাবে।)

নর্দমার ময়লা ও শিল্লের বর্জ্য সরাসরি অথবা গোপনে হ্রদ, নদী ও সমুদ্রে ফেলা হয়। দক্ষিণ গুজরাতের একটি শিল্পাঞ্চল পাপী-ভাপিতে বিবেকহীন কারখানা মালিকরা তাদের বিষাক্ত বর্জ্য ভূজলের কুয়োগুলিতে সরাসরি ছেড়েছে বলে খবর পাওয়া গেছে। গ্রামাঞ্চলে ব্যবহৃত কৃষি-রাসায়নিকগুলি থেকে জল ও ভূমি দূষণ দূরান্তরে ছড়িয়ে গেছে।

গণনা অনুযায়ী ভারতের জনসাধারণ যে সব রোগে ভোগে, তাদের ৮০% হল জলবাহিত যোগ। ডায়েরিয়াকে (জলদূষণের কারণে ঘটে থাকে) মনে করা হয় একটি প্রধান ঘাতক রোগ, তাই অত্যন্ত প্রয়োজনীয় অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে জলের উৎসমুখে দূষণ রোধ করা দরকার। এর সাথে সাথে — নিজেই কী করে জল পরিশুদ্ধ করে নিতে পারি — এই বিষয়ের ওপরে যদি বিপুল গুরুত্ব সহকারে সচেতনতা বৃদ্ধির প্রয়াস নেওয়া হয়, তাহলে তা থেকে সারা দেশের জনগণ স্বাস্থ্য সংক্রান্ত জাতীয় বাজেট থেকে প্রাপ্ত সুবিধাগুলির থেকেও অনেক বেশি উপকৃত হবে।

সংঘাতের নদীগুলি

১৯৮০-র দশককে রাষ্ট্রসংঘ জলের দশক হিসাবে ঘোষণা করেছিল। কিন্তু জলের ওপর সারা দশক জুড়ে সমস্ত কর্মসূচিগুলি পালন করা হল, দেখা গেল জলের সমস্যা আরও খারাপ আকার ধারণ করেছে। রাষ্ট্রসংঘে জল ও পরিবেশ নিয়ে ১৯৭২ সালে সংগঠিত একটি সম্মেলনে (UNEP-) এর এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর ইঁশিয়ারি দিয়ে বলেছিলেন, “মিষ্টি জল নিয়ে প্রতিযোগিতা আরও ভয়ংকর হয়ে উঠবে ... এবং সেই দ্বন্দ্ব হিংসাত্মক রূপে ফেটে পড়বে।”

ইতিমধ্যেই নদীজলের অধিকার নিয়ে এক ডজনের বেশি গুরুতর আন্তর্জাতিক বিবাদ সোঁপোঁ করে ফুটছে। এর কারণ হল নদীর উচ্চতীরবর্তী বাঁধগুলি (Upper riparian dams) এবং তাদের থেকে বিভিন্ন খালের মাধ্যমে জল প্রবাহিত করার ফলে নিম্নস্রোতে নদীগুলির প্রবাহ উল্লেখযোগ্যভাবে কমে যাওয়ায় সেগুলির অবস্থা বিশেষত গ্রীষ্মের শুখা সময়ে সংকটজনক হয়ে পড়ে। একই দেশ বা জাতির ভিতরেও বিভিন্ন রাজ্য, অঞ্চল, জনগোষ্ঠী ও জল ব্যবহারকারী বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে জলের দাবি নিয়ে দ্বন্দ্ব ও সংঘর্ষ ছড়িয়ে পড়ছে।

কেউ কেউ মনে করে কাশ্মীর সমস্যার গভীরে রয়েছে জল নিয়ে বিবাদ, কারণ ভারত ও পাকিস্তান উভয় দেশই কাশ্মীরের পর্বতগুলি অথবা সংলগ্ন হিমালয় পর্বতমালা থেকে উৎসারিত নদীগুলির জলের ওপর নির্ভরশীল।

(ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে ১৯৬০ সালে স্বাক্ষরিত সিন্ধু জল চুক্তি অনুযায়ী, রবি, শতদ্রু ও বিপাশা — এই তিনটি পূর্বের নদীর জলের ভোগের অধিকার ছিল ভারতের এবং সিন্ধু, ঝিলম ও চেনাব — পশ্চিমের তিনটি নদীর জলের ভোগের অধিকার ছিল পাকিস্তানের।) ভারত ও চিনের মধ্যেও বিবাদের একটি কারণ হল হিমালয় অঞ্চল। আমাদের দৈত্য প্রতিবেশী নিশ্চিত গতিতে (অথবা হয়তো দ্রুত গতিতে) এক ভয়ংকর পারিবেশিক ও জল সংকটের দিকে এগিয়ে যাওয়ার জন্য এই সংকেত পরিষ্কার হচ্ছে যে বিশাল হিমালয় পর্বতমালা থেকে উৎপন্ন ব্রহ্মপুত্র, সিন্ধু ও শতদ্রু ইত্যাদি দক্ষিণ বাহিনী নদীর দিকে চীনের চোখ পড়ছে। এই নদীগুলি ভারত, মায়ানমার ও পাকিস্তানের ক্ষেত্রে বিশাল গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু তাদের উৎপত্তিস্থল হল চীন-নিয়ন্ত্রিত তিব্বত।

বেজিংয়ের চাইনিজ অ্যাকাডেমি অফ ইঞ্জিনিয়ারিং ফিজিক্সের একদল ইঞ্জিনিয়ার প্রস্তাব দিয়েছিল যে আণবিক বোমা নিক্ষেপ করে বিশাল এক খাল খুঁড়ে ব্রহ্মপুত্রের জল উত্তর চীনে পাঠানো হোক। যদিও চীন সরকার তড়িঘড়ি করে এই ভাবনার থেকে নিজেদের দূরত্ব ঘোষণা করেছে, তবুও অনেকেই মনে করে যে এই প্রস্তাবের মধ্য দিয়ে সেখানকার কোনো কোনো মহলের বিদ্যমান ভাবনাচিন্তার প্রকাশ ঘটেছে।“

১৫০ মিলিয়ন পারিবেশিক উদ্ভাস্ত

ভারতে এবং অন্যত্র অনেক মানুষ আছে যারা চীনের অবিশ্বাস্য অর্থনৈতিক উন্নতির দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত এবং তারা তাদের সমকক্ষ হওয়ার ইচ্ছা পোষণ করে। কিন্তু জার্মান সাময়িকী ‘দার স্পিজেল’-এর (Der Spiegel) (৭ মার্চ ২০০৫) সাথে একটি সাক্ষাৎকারে চীনের পরিবেশ দপ্তরের ডেপুটি মিনিস্টার স্বীকার করেছেন যে সে দেশে পরিবেশ অবনমনের ফলাফল “ভয়ংকর”।

মন্ত্রী জানান, “এই অবিশ্বাস্য উন্নয়ন দ্রুত শেষ হয়ে যাবে, কারণ পরিবেশ এর গতির সাথে পাল্লা দিতে পারবে না। ... শহরগুলো বাড়ছে, কিন্তু সাথে সাথে মরু অঞ্চল বেড়েই চলেছে। বাসযোগ্য ও ব্যবহারযোগ্য জমি গত ৫০ বছরে অর্ধেক হয়ে গেছে।”

“আমাদের সবচেয়ে বড়ো সাতটি নদীর অর্ধেক জল ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে পড়েছে। আমাদের নাগরিকদের চারভাগের একভাগ মানুষ নির্মল পানীয় জল পায় না। শহরাঞ্চলের তিনভাগের একভাগ মানুষ দূষিত বাতাসে শ্বাস নিচ্ছে। পৃথিবীতে দশটি সর্বোচ্চ দূষিত শহরের পাঁচটিই হল চীনের ...।

ভবিষ্যতে আমাদের ২২টি রাজ্য ও শহর থেকে ১৮৬ মিলিয়ন (অর্থাৎ ১৮ কোটি ৬০ লক্ষ) অধিবাসীকে পুনর্বাসন দিতে হবে। কিন্তু অন্যান্য রাজ্য

বা শহরগুলি শুধুমাত্র ৩৩ মিলিয়ন (৩ কোটি ৩০ লক্ষ) মানুষের জন্য স্থান সংকুলান করতে সক্ষম। কথাটির অর্থ হল চীনে বাস্তুতান্ত্রিক — আপনি যদি বলেন পারিবেশিক উদ্বাস্তু — তার সংখ্যা হবে ১৫০ মিলিয়ন (১৫ কোটি)।”

জল সুরক্ষার সুস্থ পথ

সারা দেশে জুড়ে বিকেন্দ্রীকৃত বৃষ্টির জলচাষ ও ভূজল পুনর্ভরণ পরিষ্কার ভাবে তুলে ধরেছে যে এগুলিই জলাভাব অতিক্রম করার শ্রেষ্ঠ পথ। অর্ধশতাব্দী আগে ১৯৫২ সালে ভারতের বননীতি অনুযায়ী সারা দেশের ৩৩% জমিতে বনভূমি পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছিল। জাতীয় উন্নয়ন পরিষদও এটিকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়েছিল। কিন্তু এগুলি শুধু মুখের কথাই রয়ে গেছে। কার্যত ভারত প্রতি বছরে ২৫% হেক্টর বনভূমি হারিয়ে আসছে।

অকৃষিযোগ্য জমিতে বৈচিত্র্যপূর্ণ দেশীয় ও অঞ্চলের উপযোগী প্রজাতির গাছপালা এবং তাতে অন্তত ২৫% ফলের গাছ সহ চাষ-আবাদের অঞ্চলে বহুবর্ষজীবী বৃক্ষদের অঙ্গীভূত করে পুনর্বনায়নই (reforestation) হল আজকের সবচেয়ে জরুরি প্রয়োজন। বের, আমলকী, ডুমুর, আম ... ইত্যাদিরা হল এমন কিছু খাদ্য-বৃক্ষের প্রজাতি যেগুলি নামমাত্র বা বিনা সেচেই বেড়ে উঠতে পারে।

ঘন গাছের ছায়ায় মাটি সবটা না হলেও অর্ধেকটা জল শোষণ করে সঞ্চিত রাখতে পারে। গাছ-পাতার ঘনত্ব বৃদ্ধি হলে মাটিতে জৈব পদার্থেরও বৃদ্ধি ঘটে এবং নাটকীয়ভাবে মাটির জলধারণ ক্ষমতা বেড়ে যায়। মাটির তলায় সঞ্চিত জলের উচ্চতা বাড়ে, মরসুমি ঝরনাগুলি সারা বছর ধরে বইতে থাকে। বাস্তুতন্ত্রের এই উন্নতি ছড়িয়ে পড়ে প্রতিবেশীর খেত-খামার ও গ্রামগুলিতে।

যদি সীমারেখা জুড়ে (contours) এবং ক্ষয়প্রাপ্ত খাদগুলো বোজানো (gully plugging), চেক ড্যাম, চৌয়ানো জলের পুকুর ও জলাধার ইত্যাদি নির্মাণের কাজ হাতে নেওয়া হয়, তাহলে মাটির আর্দ্রতা বহুলাংশে বৃদ্ধি পাবে, প্রয়োজনে সুরক্ষামূলক সেচের যথেষ্ট বন্দোবস্ত মজুত থাকবে। এতে উপযোগী প্রজাতিগুলির সংখ্যা বাড়বে এবং তাদের বিপুল সমৃদ্ধি ঘটবে। এভাবে দশ বছরের মধ্যে এক নাটকীয় পরিবর্তন ঘটে যাওয়া সম্ভব। শহরাঞ্চলে বাড়ির ছাদগুলিতে বৃষ্টির জল চাষ এবং উৎস থেকে

চীনের পারিবেশিক ও জল সংকট

চীনে ৬৮৮টি শহরের ৪০০টি শহর জলাভাবে ভুগছে। এখবর জানা গেছে চীনের সরকারি সংস্থাগুলির তরফে। বিশ্বব্যাপক বলছে চীনের ৩/৪ ভাগ নদী দূষিত এবং ৭০ কোটির বেশি চীনা অধিবাসী দূষিত জল পান করে। সচরাচর যেসব কঠোর কথা ব্যাঙ্ক ব্যবহার করে না, সেরকমই কঠোর কথা প্রয়োগ করে বিশ্বব্যাপক ঈশিয়ারি দিয়ে বলেছে যে অবস্থাটা “পরবর্তী প্রজন্মগুলির জন্য ভয়াবহ ফলশ্রুতি নিয়ে শীঘ্রই চলে যাবে নিয়ন্ত্রণের বাইরে।”

মধ্যচীনের হুবেই প্রদেশকে বলা হত ‘হাজার হুদের রাজ্য।’ কিন্তু লাক্ষিয়ে বেড়ে চলা শিল্পের জন্য জলের চাহিদা বৃদ্ধিতে এই প্রাচীন পবিত্র হুদগুলির ৮১৫টি স্রোত বালি খাদে পরিণত হয়েছে। আকাশ থেকে দেখলে অতীতের এই উর্বরাভূমিকে শুষ্ক ও ত্রুদ্ব বলে মনে হয়। আর এই রকম পরিবর্তন চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ছে।

চীনের আমলারা এমনই বেপরোয়া হয়ে উঠেছে যে তারা বিমান, রকেট শেল ও অ্যান্টি এয়ারক্রাফট গান ব্যবহার করে মেঘ-বীজ (Cloud Seed) সৃষ্টিকারী রাসায়নিক ছুঁড়ে এই আশা নিয়ে যে অন্তত কিছুটা বৃষ্টি হলে আপাতত পরিব্রাণ পাওয়া যাবে। সাধারণত মেঘে নিউক্লিয়ার অভাব পূরণ করতে বাতাসে সিলভার আয়োডাইড ছুঁড়ে মেঘের বীজ সৃষ্টির চেষ্টা করা হয়। বনভূমির দ্বারা প্রাকৃতিক উপায়ে মেঘের বীজ সৃষ্টির সাথে তুলনায় এই প্রক্রিয়াকে বলা যেতে পারে ‘কৃত্রিম শুক্রভরণ’ (artificial insemination)।

২০০২ সালে পীত নদীর জল শহর ও শিল্পগুলিতে ঘুরিয়ে দেওয়ার পরিকল্পনার বিরুদ্ধে হাজার হাজার চাষি পুলিশের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছিল। এই ধরনের খবর পাওয়া গিয়েছিল সারা দেশ জুড়ে।

দক্ষিণের ইয়াংসি নদী থেকে উত্তরের হোয়াং হো, হুয়াই এবং হাই নদীর শুখা খাতে বাৎসরিক ৫০ মিলিয়ন (৫০ শত কোটি) কিউবিক মিটার জল প্রবাহিত করার জন্য বেজিং আর একটি বৃহৎ প্রকল্প রচনা করেছিল। ২৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার খরচে দক্ষিণ থেকে উত্তরে ভিন্ন খাতে তিনটি ৮০০ কিলোমিটার লম্বা খাল খননের পরিকল্পনা করা হয়েছিল। দ্য চাইনিজ এনভায়রনমেন্টাল প্রটেকশন এজেন্সি সরকারকে ঈশিয়ারি দিয়েছিল এই বলে যে এই প্রকল্প কার্যে রূপায়িত হলে ভয়ংকর পারিবেশিক সমস্যার মুখোমুখি হতে হবে।

অবশ্য সরকারের তরফে একটি আলোকপ্রাপ্ত পদক্ষেপ চায়না উইমেনস্ ডেভেলপমেন্ট ফান্ডের (CWDF) মতো সংগঠনগুলিকে জল নির্বাহের (water management) প্রকল্পগুলিকে তৃণমূল স্তরে বিস্তৃত করার জন্য উৎসাহিত করা হচ্ছে। সিডবলুডিএফ ১১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার খরচে পশ্চিম চীনে প্রায় ২০ লক্ষ পরিবারকে জল সঞ্চয়ের কুয়ো (water collection wells) নির্মাণে সাহায্য করেছে।

বর্জ্যপাত্রে জলের নানাবিধ ব্যবহারের জন্য জলচক্রকে প্রবাহিত রাখা বিরাট গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। কারণ জলের জোগান হয়েছে অপ্রতুল এবং জনও ভীষণ দূষিত হয়ে পড়েছে। শহরাঞ্চলে মাটি ঢেকে দেওয়া ইট ও সিমেন্টের কাজ এখন এমন ব্যাপক বিস্তৃত হয়েছে যে বৃষ্টির জল মাটিতে প্রবেশ করার সুযোগ পায় খুবই কম। এই অবস্থা শুধরে ফেলতে হবে।

অবশ্যই জলের অপ্রয়োজনীয়, বাজে খরচ কমাতে হবে এবং কোন কোন কাজে জলের ব্যবহার জরুরি বা অগ্রাধিকার পাওয়ার যোগ্য তা নির্ধারণ করে সেগুলির ভিত্তিতেই জলের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করা দরকার। ইতিমধ্যেই কার কতটা জমি আছে তা ব্যতিরেকেই প্রত্যেক ব্যক্তির জলের ওপর সমান অধিকারের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা সফল সামাজিক জল-প্রকল্পের বেশ কিছু উদাহরণ সৃষ্টি হয়েছে। যতদিন জলের অভাব থাকবে, ততদিন প্রাকৃতিক ন্যায়বিচার এটাই দাবি করে। কারণ জল বাতাসের মতো এক সাধারণের সম্পদ (common resource) এবং প্রত্যেকের জন্মগত অধিকার।



ভ্যান বাদি-তে জল সেচ

টীকা এবং উল্লেখিত গ্রন্থাদি

- ১। ডঃ ই.এ.ভি. প্রসাদ লিখছেন, 'একটি মেঘের প্রতিটি জল বিন্দু বায়ুমন্ডলে অবস্থিত এক একটি নিউক্লিয়াসকে কেন্দ্র করে জড়ো হয়ে তাদের আদি আকার থেকে লক্ষ গুণ বেড়ে ওঠে বৃষ্টির ফোঁটায় পরিণত হয়।' এই উদ্ধৃতিটি গৃহীত হয়েছে নিম্নলিখিত লেখাটি থেকে Ground Water in Varahamihira's Brihat samhita' Masslit Series, Sri Venkateswara University.
- ২। B.B. Vohra, former Chairperson, Central Ground Water Board of India, in his articles 'On Ground Water', Times Of India', 26-02-94.
- ৩। 'The Wrath of Nature' ment Science and Environment Cente for, 1985, pg.29.
- ৪। একটি সরল বাস্তবের মত গভীরতা মাপার ব্যবস্থায়ুক্ত পাত্র খোলা আকাশের নীচে ফেলে রাখলে তা থেকে নির্দিষ্ট সময় জুড়ে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলে কতটা বৃষ্টিপাত হয়েছে তা সহজেই মাপা যায়।
- ৫। Centre for Science and Enviroment. The State of India's Enviroment. 1984-85 pg.29.
- ৬। 'The Wrath of Nature', C.S.E.
- ৭। Deforestation, Droughts and Desertification. INTACH, K. Roop Kumar, Head of the Department, Climatology, Indian Institute of Tropical Meterlogy quoted in the Times of India 28-10-05. the context of Global Warming.
- ৮। 'Water for Gujrat', Aswin Shah, pg.64.
- ৯। 'The River and Life', Sanjay Sangvai, Earthcare Books, 2002, pg. 114.
- ১০। 'On Drought', Winin Pereira, Maharashtra Prabordhan Seva Mondal, Jan-Feb 1988, pg.12.
- ১১। Parag Dave, Indian Express, Saurashtra New Pline, November 15, 2000.
- ১২। পূর্বে উল্লেখিত
- ১৩। 'Water for Gujrat', Aswin Shah, pg.64.
- ১৪। 'The Rivers and Life', op cit, pp. 22, 26.
- ১৫। 'On Drought', Winin Pereira, Maharashtra Prabord-

han Seva Mondal, Jan-Feb 1988, pg.8, see also TE pg.172.

১৬। B.B. Vohra, Article in the Times of India, 11-05-93

১৭। Maharashtra has 40% of all the dams in India, Gujrat has 18% of them according to Register of Large Dams in India, 1979.

১৮। Handbook of Agriculture`, ICAR, pg.166. ১৯। B.B. Vohra, Land and Water, pg.8

২০। পূর্বে উল্লেখিত

২১। পূর্বে উল্লেখিত

২২। পূর্বে উল্লেখিত

২৩। Centre for Science and Environment, op. cit. pg.37

২৪। Winin Pereira, `Tending the Earth`, Earthcare Books, pg.174

২৫। Centre for Science and Environment, op. cit. pg.27

২৬। `Gaia Atlas of Planet Management` ed. Norman Myers, Pan Books, 1985, pg.109.

২৭। `The Second Citizens`, Report on the State of India's Environment, জানিয়েছিল (পৃষ্ঠা ২৯) যে ভারতের জলসম্পদের ৯০% ব্যবহৃত হয় সেচে। অবশ্য গত দুই দশকে শিল্পের ও শহরের চাহিদা তীব্রভাবে বেড়ে গেছে।

২৮। Prof. Desarda, former Secretary, Ministry of Water Resources, Govt. Of Maharashtra, Personal Communication.

২৯। পূর্বে উল্লেখিত

৩০। `Handbook of Agriculture`, Indian Council of Agricultural Research, 1987, pg.170.

৩১। Korah Mathen, `Water Scarcity and Green Revolution`, Sambardhan, pg.2

৩২। Winin Pereira, `On Drought`, Anusandhan, Jan-Feb, 1988.

৩৩। Winin Pereira, from an article Published in `Indranet` special issue on Water.

৩৪। পূর্বে উল্লেখিত

৩৫। ইস্তিয়াক আমেদ, `The Hydro-politics of Conflict`, The Daily Times, 05-01-03.

৩৬। Jehangir S Pocha, Business World, 28-02-05

৩৭। পূর্বে উল্লেখিত

৩৮। পূর্বে উল্লেখিত

৩৯। পূর্বে উল্লেখিত

৪০। পূর্বে উল্লেখিত

৪১। পূর্বে উল্লেখিত

৪২। পূর্বে উল্লেখিত

৪৩। পূর্বে উল্লেখিত

সর্বমঙ্গলম



বিশাল ঘূর্ণায়মান
মহাশূন্য থেকে
উদ্ভূত হয়েছিল পৃথিবী —
অন্য যে কোনো কিছুর চেয়ে
একেবারেই নিজের মতন,
এখানেই জন্মেছিল
প্রাণ ও চেতনা
বিস্ময় ও প্রাচুর্যের উচ্ছ্বাস
শত-সহস্র বিশ্বের ভিতরে বিশ্ব।

এই মহাজাগতিক সমুদ্রের মাঝে আমাদের পৃথিবী নিছক এক কণা, আর এর জীবমণ্ডল (biosphere)--যে অংশটি সৃষ্টি করেছে প্রাণের জগৎ —তা হল পদ্মপাতায় এক ফোঁটা শিশিরের মত এক পাতলা আবরণ।

আমাদের পায়ের একশ কিলোমিটার নীচে ৩০০০ ডিগ্রী তাপমাত্রায় পৃথিবী তপ্ত সাদা। আমাদের মাথার তিরিশ কিলোমিটার উপরে বাতাস এতই পাতলা ও ঠান্ডা যে সেখানে বেঁচে থাকা যায় না।

এই দু'য়ের মধ্যখানে সবুজ পৃথিবীতে ফুল ফোটে, ত্রাস্তীয় অঞ্চলে তা সর্বাপেক্ষা সমৃদ্ধ...যা হল বাকি সমস্ত রকম জীবনের এক পূর্বশর্ত... সমস্ত খাদ্য শৃঙ্খলের ভিত্তি। এটি অণু-আবহাওয়াকে (micro-climate) স্থায়িত্ব দেয় এবং জীবন্ত মাটিকে রক্ষা (এবং পুনরুজ্জীবিত) করে গড়ে তোলে জীবমণ্ডলের ভিত্তি।

প্রতিটি জীবই একে অপরের সাথে যুক্ত। অণুজীব, উদ্ভিদ, স্তন্যপায়ী, মাটিতে বসবাসকারী ও সমুদ্রে সাঁতার দেওয়া জীব—সবই সূর্য, জল, বাতাস ও মাটি থেকে শক্তি (energy) ও পুষ্টির (nutrients) দেওয়া নেওয়ার চক্রে আবদ্ধ...জীবিত বস্তুর সবচেয়ে বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল তা নিজেকে সংগঠিত করে

(self-organising). গাইয়া অ্যাটলাস।



প্রকৃতি যন্ত্রকে কি জয় করছে?

যেখানে প্রকৃতি নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করার যুক্তি দ্বারা পরিচালিত আধুনিক অর্থনীতি এরকম কোনো যুক্তির ধার ধারেনা। মানুষের সমাজ প্রকৃতি ও এই ফ্রাংকেনস্টাইনের মাঝে বিরাজ করছে। এখন আমাদের শুভবোধে জেগে উঠতে হবে। আর এখন আমাদের এই একমাত্র অমূল্য পৃথিবীর জীবমণ্ডলকে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচানোর সময় এসেছে।

ভারত ছিল এক অরণ্য সভ্যতা। এর সমৃদ্ধ বনভূমিগুলি ছিল এদেশের সমৃদ্ধি ও সংস্কৃতির উৎস। এই উপমহাদেশে বিপুল বৈচিত্র্যপূর্ণ প্রজাতির সমস্ত ধরনের অনুমেয় চাহিদা পূরণ করত। কৃষি বনভূমি থেকে অনেক কিছুই পেত যার দ্বারা যে উদ্ভূত উৎপাদন হত তা দিয়ে নাগরিক সমাজের চাহিদা মেটাতে। বিশ্বের সুমহান, সহনশীল ধর্মগুলিরও (religious) জন্ম হয়েছিল এখানে। এদেশের সংগীত সাহিত্য, দর্শন, কলা ও হস্তশিল্প সারা পৃথিবী জুড়ে পর্যটকদের মুগ্ধ করে বিরল উচ্চতায় পৌঁছেছিল। যদিও বহিরাগত আক্রমণের ডেউ এদেশে বারবার আছড়ে পড়েছে, ভারত নিজেকে রক্ষা করতে, পুনরুদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছে, কারণ তার বনভূমি ও মাটি তার প্রাকৃতিক সম্পদকে পুনরুজ্জীবিত করেছে।

“লক্ষী বা সত্যিকারের সম্পদ শুধুমাত্র প্রকৃতি থেকেই সৃষ্ট হতে পারে।” —একথা স্মরণ করে ভাস্কর সাভে বলছিলেন, “কারণ শুধু প্রকৃতি সম্পূর্ণ নতুন কিছু তৈরি করতে পারে তার ছয়টি পরিবলের (Paribals) মধ্যে পারস্পরিক দেওয়া-নেওয়ার ও প্রতিদিন নবীকৃত সর্বালোকে সরবরাহের মাধ্যমে। আমাদের বনভূমিও খামারগুলিতে যেখানে সালোকসংশ্লেষ (Photosynthesis) ঘটতে পারে সেগুলি হল সম্পদের প্রাথমিক উৎপাদক নিছক কাঁচামালগুলির (raw materials) প্রক্রিয়াকরণ করে রূপান্তর ঘটায়। বিনোবা ভাবের ভাষায়, “তারা একটা থলে ফাঁকা করে আর একটা থলে ভরায়। কিন্তু যেহেতু আমাদের সম্পদ ক্ষয়ে যাচ্ছে, এটি (শিল্প) প্রথম বন্ধনীর মধ্যে শব্দ অনুবাদকের। ‘খাদ্য সুরক্ষা’ও সম্ভব নয় যদি জমি —যা উৎপাদনের মূল উপকরণ তা ক্রমাগত অধঃপতিত হতে থাকে বা অন্য কাজে যেমন শিল্প ও নগরায়ণের কারণে ব্যবহৃত হতে থাকে।

“একটি জাতির টেকসই সমৃদ্ধির সত্যিকারের পরিমাপ হল তার কত শতাংশ মানুষ আত্মনির্ভরশীল কৃষক, যারা প্রাথমিক সম্পদ পুনরুজ্জীবনের কাজে রত থাকে। দূর্ভাগ্যবশত তাদের সংখ্যা দ্রুত কমছে।” গত কয়েক দশকের রাসায়নিক কৃষিকাজের ফলে লক্ষ-কোটি চাষি ঋণ ও হতাশার গভীর গহ্বরে ডুবে গেছেন।

ভারতের জাতীয় কৃষি কমিশন জানিয়েছেন যে ৪০% চাষি কৃষিকাজ ছেড়ে দিতে চায়। তাদের হতাশা ও ক্লান্তি এতটাই বেশি যে তাদের সমস্যাবলী যদি জরুরী ভিত্তিতে গভীর দৃষ্টিভঙ্গী ও দৃঢ়তার সাথে মোকাবিলা করা না হয় তাহলে প্রায় ২৫ কোটি মানুষ বাস্তবাত্মক ও অর্থনৈতিক উদ্ভাস্তুতে পরিণত হবে এবং তারা পেটের দায়ে কাজের সন্ধানে শহরের বস্তিগুলোতে শ্রোতের মত ধৈর্যে আসবে।

এই বিপজ্জনকভাবে শহুরে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সম্ভাবনার প্রেক্ষিতে ২৫ কোটি মানুষের সুস্থায়ী জীবিকা দিতে হলে কি করতে হবে তা নিয়ে সরকার কি বিন্দুবিসর্গ ভেবেছে? যদিও এখনও কেউ কেউ মনে করেন কষ্টকর হলেও আরো নগরায়ণ অর্থনৈতিক বৃদ্ধির পক্ষে ভাল, কিন্তু কঠোর বাস্তবতা হল এই যে একজন গড়পড়তা নগরবাসী একজন গড়পড়তা গ্রামবাসীর চেয়ে অন্তত ৩ গুণ বেশি সম্পদ ভোগ করে। আমাদের মাথা পিছু জমি, জল, শক্তি (energy) ও খাদ্যের এই অপ্রতুলতা নিয়ে যদি নগরায়ণ চলতে থাকে তাহলে তা নিশ্চিতভাবেই বাস্তবাত্মক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে মোটেই ফলপ্রসূ (viable). আমাদের এই কৃষিপ্রধান দেশে এই যে করুণ অবস্থা তা সম্পূর্ণভাবে মানুষের তৈরি (man-made)।”, ভাস্করভাই বলেন “যেখানে প্রকৃতি তার বদান্যতায় উদার, সেখানে আমরা সেই দানকে ধরে নিয়েছি আপনিই পাব আর আমরা সেগুলিকে অপব্যবহার করেছি। এদেশে মাটি ও তার কৃষক সমাজের প্রাকৃতিক স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার করাই হল দারিদ্র, বেকারী ও জনসংখ্যা বৃদ্ধির মত আন্ত-সম্পর্কিত সমস্যাগুলির একমাত্র সমাধান।

“শুধুমাত্র কৃষির মাধ্যমেই সর্বাধিক সংখ্যক মানুষ আত্মনির্ভরশীল হয়ে উঠতে পারে যদি কৃষিতে প্রদেয়গুলি (inputs) ন্যূনতম মাত্রায় কমিয়ে আনা যায়। তাই যা কৃষির জন্য প্রয়োজন তা হল ন্যূনতম পুঁজি, ন্যূনতম কেনা প্রদেয় (minimum purchased inputs), ন্যূনতম কৃষিযন্ত্রপাতি (যেমন — লাঙল ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি), ন্যূনতম শ্রম ও ন্যূনতম প্রযুক্তি, এরকম হলে খরচ বৃদ্ধি ছাড়াই কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে। দারিদ্রও হ্রাস পাবে এবং সাথে সাথে জনসংখ্যা বৃদ্ধিও আপনিই কমবে।

প্রায় ছয় দশক আগে ভারতের প্রথম কৃষিমন্ত্রী ডঃ কে.এম.মুন্সি ভারতের সমস্ত গ্রামে ও জীব-অঞ্চলে (bio-region) প্রকৃতির পুষ্টি ও জলচক্রের পুনরুদ্ধার ও আরোগ্যের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। এটা আমাদের সময়ে এক বাধ্যতামূলকভাবে গ্রহণীয় কার্যক্রম বলে উঠে এসেছে। আমাদের

মধ্যে যে প্রাকৃতিক সম্পদের নিরক্ষতা রয়েছে’ তা চলতে দেওয়া যায় না। প্রকৃতির নিয়মানুসারে, নিজেই নিজের স্বাস্থ্যকর খাবার কীভাবে তৈরি করা যায়, শৈশব থেকে শুরু করে সকল স্তরে তার ফলিত শিক্ষা — শিক্ষার অচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসাবে, এমনকি শিক্ষার সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হিসাবে গড়ে তোলা অত্যন্ত প্রয়োজন। এছাড়া অন্য সব শিক্ষাই অর্থহীন।

সাভে বলেন, “এই জমি শুধুমাত্র আরো বেশি টাকা বানানোর পুঁজি নয়, এটি আমাদের ও আমাদের ভবিষ্যত প্রজন্মগুলির অস্তিত্বের ভিত্তি। পৃথিবীও তার জীবগণের স্বাস্থ্যের ওপর আমরা কোনো মূল্য ধার্য করি কীভাবে?”

সমস্ত রকম জীবের প্রতি ভালবাসার দৃষ্টিভঙ্গিই হল প্রাকৃতিক চাষের মূল সত্তা ও হৃদয়। পৃথিবীর অন্য যে কোনো জীবের মতন আমাদেরও খাদ্যের প্রয়োজন মেটানোর অধিকার রয়েছে। কিন্তু আমাদের অন্ততঃ অপ্ৰয়োজনীয় হিংসা পরিহার করা উচিত। প্রকৃতিতে একমাত্র মানুষই খেলার ছলে হত্যা করে অথবা প্রয়োজনের জন্য নয় বরং লোভের কারণে জমিয়ে রাখার জন্য হত্যা করে। অহিংসা — যা সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক অতিব্যক্তির অত্যাৱশ্যক চিহ্ন তা শুধুমাত্র প্রাকৃতিক চাষের দ্বারাই সম্ভব। বিপরীতে, আধুনিক কৃষির মূল লক্ষ্য হল টাকা এবং তার শিকড় হিংসার গভীরে প্রোথিত, আধুনিক চাষ বাজার ও মুনাফার জন্য বিষাক্ত (দু)একধরনের চাষে (toxic mono-culture) আগ্রহী। এছাড়া, এই চাষ সমস্ত রকম জীব ও উদ্ভিদের প্রতি অসহিষ্ণু ও আক্রমণাত্মক।



অহিংসা হলো সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক বিবর্তনের প্রধান চিহ্ন
এর অনুশীলন সম্ভব শুধুমাত্র প্রাকৃতিক চাষের মাধ্যমে

শক্তির অকার্যক্ষমতা (Energy inefficiency) ও জীবাশ্ম জ্বালানীর ক্ষয়

প্রতিদিন যে নবীকরণযোগ্য সৌরশক্তি ভূপৃষ্ঠে এসে পড়ছে তা সবচেয়ে

কার্যকরীভাবে ব্যবহার করতে পারে বিভিন্ন সমতলে অবস্থিত সমান্তরাল সারির গাছপালার (‘multi-tier’) প্রাকৃতিক বনভূমি, তারা সৌরশক্তিকে সবচেয়ে বেশি মাত্রায় জীব-ভরে (bio-mass) রূপান্তরিত করতে পারে। ভাস্কর সাভে যে জীব-বৈচিত্র্যে পূর্ণ খাদ্যবন (food forest) ও ফল-শাকসব্জীর খাদ্য বাগান (horticulture food garden) সৃষ্টি করেছেন তার স্থান প্রাকৃতিক বনভূমির ঠিক পরে — দ্বিতীয়, শক্তি কর্মক্ষমতায় (অর্থাৎ কত ক্যালরি ক্ষয় করে কত ক্যালরি উৎপাদন হয়, তার অনুপাত) এর পরেই হল জৈব উপায়ে উৎপাদিত বহুবিধ (poly-culture) মাঠ-ফসল যেগুলির উৎপাদনে প্রয়োজন ন্যূনতম অথবা শূন্য সংযুক্তি (input) এবং যেসব ক্ষেত্রে ফসলের অবশেষের (crop residues) প্রায় সবটাই মাঠে ফিরিয়ে দেওয়া হয় যার ফলে মাটির উর্বরাশক্তি কমতে পারে না। দামী জীবাশ্ম জ্বালানীর ভয়ংকর ক্রমবর্ধমান ক্ষয়ের ফলে এই তিনটি মাত্র পথই আমরা অনুসরণ করতে পারি।



অর্কিড বন

আধুনিক রাসায়নিক নিবিড় ও যন্ত্রীকৃত কৃষিতে (mechanised agriculture) শক্তির (energy) এমন অপচয় হয় যে এতে প্রতি ক্যালরি খাদ্য সরবরাহের জন্য দশগুণ বেশি ক্যালরি সংযুক্তির (input) প্রয়োজন হয়। রাসায়নিক সার উৎপাদনে বিপুল পরিমাণ জীবাশ্ম জ্বালানী ব্যবহৃত হয়। যদি আমরা শত-সহস্র মাইল দূরে সার ও খাদ্য পরিবহনে যে শক্তি ব্যয়িত

হত তা যোগ করি তাহলে আধুনিক শিল্পীয় কৃষি ব্যবস্থায় শক্তির কর্মক্ষমতায় যে ভীষণ অভাব তা আরো প্রকট হয়ে পড়ে।

এখন সময় হয়েছে আমাদের উপলব্ধি করা দরকার যে আমরা আদিত্যে সূর্য থেকে পাওয়া এবং মাটির তলে বিপুল চাপে সৃষ্ট বহু বহু হাজার বছর ধরে জমে থাকা শক্তিকে এক শতাব্দীতেই খনন করে ফেলেছি। ভারতে আমদানী করা জীবাশ্ম জ্বালানীর অর্ধেকেরও বেশী আসে পারস্য উপসাগর থেকে। যদি যুদ্ধ শুরু হয় এবং সংকীর্ণ হরমুজ প্রণালী দিয়ে তেলবাহী জাহাজ চলাচল বন্ধ হয়ে যায়, তাহলে সারা পৃথিবী আচমকা ঘুম ভেঙে জেগে উঠে দেখবে যে আমরা মূর্খের স্বর্গে বাস করছি।

দুর্লভ জৈব-বৈচিত্র্যের ক্ষয় ও খাদ্য নিরাপত্তাহীনতা

অনুমান করা হয় যে সমগ্র পৃথিবীতে খাদ্য প্রজাতির উদ্ভিদের সংখ্যা প্রায় ৮০,০০০; এদের বেশির ভাগই প্রাকৃতিক ভাবে বন্য পরিবেশে বেড়ে ওঠে। কিন্তু আধুনিক শিল্পীয় চাষ ব্যবস্থা প্রসারের ফলে সারা পৃথিবী জুড়ে মানুষের খাদ্যের ৯৫%-এর বেশি পাওয়া যায় মাত্র ৩০টি উদ্ভিদ প্রজাতি থেকে। (এই প্রজাতিগুলির মাত্র কয়েকটি করে ভিন্ন ধরনের উদ্ভিদ রয়েছে) আর শুধুমাত্র ৮-টা ফসল মানব খাদ্যের ৭৫% যোগান দেয়।

অতি সংকীর্ণ জিনগত ভিত্তির ওপর এই সংকীর্ণ দৃষ্টিজাত নির্ভরশীলতা ও পাশাপাশি রাসায়নিক নিবিড়, শক্তি-অকর্মণ্য জল-পেটুক ও (দু)এক ধরনের (mono-cropping) চাষের ফলে ক্ষতিসমূহ আমাদের খাদ্য নিরাপত্তার দুর্বলতা ও দুর্ভিক্ষের আশংকাকে অনেকাংশে বাড়িয়ে দিয়েছে। খাদ্যে অতিরিক্ত মাত্রায় বিষ সহ অপুষ্টিও ইতিমধ্যে বহুলমাত্রায় বেড়ে গেছে, যেমন বেড়েছে ক্ষুধা যা সৃষ্টি হয়েছে সরবরাহকৃত খাদ্যের ব্যয়বহুলতা থেকে, যা লক্ষ লক্ষ মানুষ কিনতে পারে না এবং তা তাদের কাছে অলভ্য।

ভারতের বিপুল প্রাকৃতিক সম্পদের এক ঝলক ধারণা পেতে যে কেউ দেখতে পারেন ‘ভারতের সম্পদ’, (The Wealth of India) শীর্ষক ১২ খন্ডের বিশ্বকোষ। উল্লেখ করার মত এই বিশাল উৎসটি প্রকাশ করেছেন I.C.A.R. (Indian Council of Agricultural Research)। উল্লেখযোগ্য আরেকটি সংক্ষিপ্ত উৎস হল, ‘ভারতের প্রয়োজনীয় উদ্ভিদগুলি’ Useful Plants of India (এটিও ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ অগ্রিকালচারাল রিসার্চ দ্বারা প্রকাশিত)। এই বইয়ে ভারতে পাওয়া যায় এমন ঐতিহ্যগতভাবে প্রয়োজনীয় প্রায় ৫০০০ উদ্ভিদ সংক্রান্ত সংক্ষিপ্ত তথ্যাবলী রয়েছে।

ভূমি সংরক্ষণ ও পুনরুৎপাদনের চ্যালেঞ্জ

এদেশে বিশাল অঞ্চল জুড়ে মাটি খনির স্বার্থরক্ষাকারী জলবিদ্যুৎ প্রকল্প, স্পেশাল ইকোনমিক জোন (এস.ই.জেড.) ইত্যাদিদের দ্বারা বিপন্ন হয়ে পড়েছে। কিন্তু এখন সময় হয়েছে সরকার তার বিস্তৃত ক্ষমতা দিয়ে বরং সৃষ্টি করুক সোসিয়ো-ইকোলজিকাল জোন।

আমরা সম্মিলিতভাবে বিশাল সব চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি। ভারতীয় সমাজ ও রাজনীতির সমস্ত ক্ষেত্রে সচেতনতা ও প্রণোদনা (motivation) বৃদ্ধির দাবী উঠছে যাতে এক সুসংহত কার্যক্রমের দ্বারা আমরা আমাদের ইঙ্গিত পরিবর্তন আনতে সক্ষম হই।



এমনকি এক দশকেরও কম সময়ে নিষ্ফলা পোড়ো জমির স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার করা যেতে পারে। একই সাথে স্বল্পমেয়াদী, মধ্যমেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদী বৃক্ষরোপণ ও ফসল চাষ করে সুপরিকল্পিতভাবে খাদ্য উৎপাদন অব্যাহত রাখা যেতে পারে যা দিয়ে একজন চাষি দীর্ঘমেয়াদী ফলের গাছগুলি পরিপুষ্ট হয়ে ফল দেওয়ার আগের রূপান্তরকালীন সময়ে (transition period) টিকে থাকতে পারে। যতবেশি জীব-ভর (bio-mass) সৃষ্টি হবে এবং জমিকে সম্পূর্ণ ঢেকে রাখা যাবে ততই ভূমিক্ষয় রোধ করে মাটির উর্বরশক্তিও পুনরুৎপাদিত হবে।

কৃষি কাজ হল এক ধর্ম

টাকা হল ব্যবসার পুঁজি, যেখানে প্রাকৃতিক সম্পদ হল স্বাস্থ্যকর (Wholesome) জীবনের ‘পুঁজি’, তাই প্রকৃতির সুরে সুর মিলিয়ে কৃষিকাজ হল এক ধর্ম, এক পবিত্র কর্তব্য—টাকা বৃদ্ধির ব্যবসা নয়। এর লক্ষ্য হল প্রকৃতির পুনরুৎপাদন এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মগুলির প্রতি দায়িত্বশীল হয়ে বৃহত্তর, পূর্ণাঙ্গ জীবনের লক্ষ্যে আরো গুরুত্বপূর্ণ কর্মকান্ড পরিচালনা করা।

“এখন আমাদের নিশ্চিতভাবে পুনরায় জাগিয়ে তুলতে হবে করণার সংস্কৃতি ও সমস্ত জীবের মঙ্গলের জন্য এক শ্রদ্ধার বোধ। সর্বমঙ্গলম! শান্তি ও সাযুজ্যে বসবাস করুক সমস্ত জীব।”



খিদে পেলে খাওয়াই স্বাভাবিক
খিদে না পেলে খাওয়া অস্বাভাবিক
খিদে পেলে অন্যদের খাইয়ে খাওয়া হল সংস্কৃতি

পরিশিষ্ট

খোলা চিঠি — ১

প্রেরক : ভাস্কর সাভে, ‘কল্লবৃক্ষ খামার’

গ্রাম : দেহরি, ভায়া উমেরগ্রাম

জিলা : ভালসাদ, গুজরাত ৩৯৬১৭০

ফোন : ০২৬০-২৫৬৩৮৬৬ ও ২৫৬২১২৬

প্রতি : শ্রী এম.এস.স্বামীনাথন

চেয়ারপার্সন, জাতীয় কৃষি কমিশন

কৃষি মন্ত্রক, ভারত সরকার

জুলাই ২৯, ২০০৬

বিষয় : ক্রমবর্ধমান আত্মহত্যা ও কৃষকদের জন্য জাতীয় নীতি

প্রিয় শ্রী স্বামীনাথন,

আমি এক ৮৪ বছর বয়স্ক প্রাকৃতিক জৈব চাষি। ছয় দশকের বেশি সময় জুড়ে বিরাট বৈচিত্র্যপূর্ণ খাদ্য-ফসল ফলানোর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা রয়েছে আমার। আমি বহু বছর ধরে বহু রকম চাষ পদ্ধতির অনুশীলন করেছি। এগুলির মধ্যে রয়েছে ১৯৫০ দশকে রাসায়নিক পদ্ধতির অনুশীলন। কিন্তু আমি শীঘ্রই এই পদ্ধতির খামতিগুলি লক্ষ্য করি।

আমি প্রত্যয়ের সঙ্গে বলছি যে শুধুমাত্র প্রকৃতির সাযুজ্যে, জৈবচাষের মাধ্যমে ভারত তার জনসাধারণকে প্রচুর স্বাস্থ্যকর খাদ্যের জোগান দিতে পারে এবং সকলের সুস্বাস্থ্য, মর্যাদা ও শান্তির সাথে বসবাসের জন্য প্রতিটি বুনিয়াদি চাহিদা মেটাতে পারে।

(এখানে সংযোজিত হল : (১) রাসায়নিক চাষ ও জৈব চাষের মধ্যে একটি সংক্ষিপ্ত তুলনা; (২) আমার খামার কল্লবৃক্ষ সম্বন্ধে একটি সূচনা; (৩) দর্শনাঙ্গীদের কিছু লিপিবদ্ধ মতামত এবং (৪) আমার নিজের জীবনের ওপর একটি ছোটো নোট।)

এম এস স্বামীনাথন, আপনাকে ভারতের তথাকথিত সবুজ বিপ্লবের জনক বলে মনে করা হয় — যে সবুজ বিপ্লব এক ঝটকায় এদেশে বিঘাত কৃষি-রাসায়নিকদের প্লাবন-ফটকগুলি (flood gates) খুলে দিয়েছে — গত ৪০ বছর ধরে যা ভারতীয় চাষিদের জমি ও জীবনের ওপর এক ভয়াবহ ধ্বংসলীলা চালিয়ে যাচ্ছে। আমাদের মাটির করুণ অবস্থা ও প্রতি বছর আমাদের ঋণ-জর্জরিত চাষিদের আরও বেশি সংখ্যায় আত্মহত্যার ঘটনার পিছনে আমাদের সুদীর্ঘ ইতিহাসে অন্য যে কোনো ব্যক্তির চেয়ে আমি আপনাকে বেশি দায়ী বলে মনে করি।

অদৃষ্ট/নিয়তি হয়তো এটাই চেয়েছিল যার ফলে আপনি আজ জাতীয় কৃষি কমিশনের চেয়ারপার্সন আর আপনাকেই এক নতুন কৃষিনিতির খসড়া প্রস্তুত করার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। আমি আপনাকে সর্নিবন্ধ অনুরোধ করছি যে এই সুযোগ গ্রহণ করে ত্রুটিগুলি শুধরে নিন — আমাদের সন্তান-সন্ততিদের জন্য এবং যারা এখনও জন্মায়নি তাদের জন্য।

আমি জানি যে আপনার কমিশন নতুন নীতির খসড়া তৈরি করার জন্য কৃষকদের মতামত জানাতে আমন্ত্রণ জানিয়েছে। যেহেতু এটি একটি খোলা আলোচনা, আমি আমার এই চিঠির একটি করে নমুনা পাঠাচ্ছি (১) প্রধানমন্ত্রীকে, (২) কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রীকে, (৩) জাতীয় পরামর্শদাতা কাউন্সিলকে এবং (৪) সংবাদমাধ্যমগুলিকে, যাতে করে বৃহত্তর সংখ্যক মানুষের কাছে আলোচনাটি পৌঁছাতে পারে। আমার আশা এর ফলে এই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টিকে ঘিরে আমাদের মধ্যে জন্ম নেবে আত্মানুসন্ধান এবং সর্বস্তরে খোলা বিতর্ক — যাতে করে আমরা একই ধরনের ভুলের পুনরাবৃত্তি না করি। এই ভুলগুলির ফলে আমরা বর্তমানে এক গভীর পচাগলা বিশৃঙ্খল অবস্থায় পড়েছি।

খুব বেশিদিন আগে নয়, মহান সাহিত্যিক বঙ্কিমচন্দ্র আমাদের মাটিকে বলেছিলেন সুজলম সুফলম্। বস্তুত আমাদের দেশ তার সমৃদ্ধ মাটি, প্রচুর জল ও সূর্যালোক, ঘন বনভূমি, জৈব বৈচিত্র্যের সম্পদ এবং সংস্কৃতি সম্পন্ন ও শান্তিপ্রিয় জনগণের কৃষিজ্ঞান ও প্রাজ্ঞতার বিপুল ভাণ্ডার নিয়ে সতিই ছিল অত্যন্ত উর্বর ও সমৃদ্ধ। আমাদের রক্তে বইছে কৃষি। কিন্তু আমার দুঃখ এটাই যে আমাদের প্রজন্মের (যারা বর্ষীয়ান) কৃষকরা আপনাদের মতো মানুষ — যাদের কৃষির অভিজ্ঞতা কার্যত শূন্য — তাদের দ্বারা নিজেদের প্রতারিত হওয়ার সুযোগ দিয়ে আমরা বিদেশ থেকে আমদানি করা ক্ষীণদৃষ্টিসম্পন্ন এবং বাস্তবতায় ধ্বংসলীলা চালানো কৃষি-ব্যবস্থা গ্রহণ

করেছি।

উপনিষদ বলছে —

ওম পূর্ণমদাহ
পূর্ণমিদাম পূর্ণত পূর্ণমদচ্ছায়তে
পূর্ণস্য, পূর্ণমদয়া পূর্ণমেয়া বশিষ্ঠতে
এই সৃষ্টি পূর্ণাঙ্গ ও সম্পূর্ণ
পূর্ণ থেকেই সৃষ্টির আবির্ভাব
প্রতিটি সৃষ্টিই পূর্ণাঙ্গ ও সম্পূর্ণ
পূর্ণ থেকে পূর্ণকে নাও তুলে
তবু তার নেই কোনো ক্ষয়
পূর্ণ পূর্ণই থেকে যায়।

আমাদের জঙ্গলে বের (জুজুবের), জামরুল (জামবোলাম), আম, আমবার (বুনো ডুমুর), মথুয়া (মধুকা ইন্ডিকা), তেঁতুল (ট্যামারিন্ড) ইত্যাদি গাছ ফলের মরসুমে এমন ফলন দেয় যে ফলভারে তাদের ডালপালা অবনত হয়। এগুলির গাছ পিছু বাৎসরিক ফলন হয় এক টনের ওপর — বছরের পর বছর। কিন্তু গাছগুলির চারপাশের মাটি থাকে ক্ষয়হীন ও পূর্ণ। মাটির পূর্ণতায় কোনো ছিদ্র বা ছেদ নেই।

পাথুরে পাহাড়ের গাছপালা সহ অন্যান্য অঞ্চলের গাছপালারা কোথা থেকে জল ও এন পি কে (নাইট্রোজেন, ফসফেট ও পটাশিয়াম) ইত্যাদি সংগ্রহ করে? যদিও তারা নিশ্চল, যেখানেই তারা দাঁড়িয়ে থাকে, প্রকৃতি ঠিক সেখানেই তাদের প্রয়োজন মেটায়। কিন্তু আপনাদের মতো বিজ্ঞানী বা টেকনোক্র্যাটরা এ বিষয়ে অন্ধ। একটা গাছ বা উদ্ভিদের কী প্রয়োজন, কতটা প্রয়োজন এবং কখন প্রয়োজন ইত্যাদি আপনারা কীসের ভিত্তিতে নিদান দেন?

বলা হয়, যেখানে জ্ঞানের অভাব সেখানে অজ্ঞতা ‘বিজ্ঞানের’ মুখোশ পরে হাজির হয়। এইরকম এক ‘বিজ্ঞানের’ পক্ষে দাঁড়িয়ে আপনি আমাদের কৃষক সাধারণকে ভুল পথে পরিচালিত করে তাদের দুঃখ-কষ্টের গভীর খাদে নিয়ে ফেলেছেন। যদিও অজ্ঞ হওয়া কোনো লজ্জার নয়, কিন্তু এইরকম অজ্ঞতা চিনতে পারাই হল জ্ঞানের প্রথম প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ। আবার অজ্ঞতা চিনতে অস্বীকার করা হল আত্মপ্রবঞ্চনায় ভরা ঔদ্ধত্য।

কৃষি বিষয়ক অশিক্ষা (Agricultural misinformation)

এদেশে ১৫০টির বেশি কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় আছে। এদের অনেকগুলিরই রয়েছে হাজার হাজার একর জমি। এদের পরিকাঠামো, যন্ত্রপাতি, কর্মী ও টাকার কোনো অভাব নেই ... এবং তবুও বিপুল পরিমাণে ভরতুকি পাওয়া এইসব বিশ্ববিদ্যালয়গুলির একটিও এতটুকু লাভ (Profit) করে না। কিন্তু প্রতি বছর প্রতিটি প্রতিষ্ঠান থেকেই কয়েকশো ‘শিক্ষিত’ কাজ পাওয়ার অযোগ্য (unemployable), শুধুমাত্র কৃষকদের বিপথে পরিচালিত করায় পারদর্শী এবং বাস্তুতান্ত্রিক ক্ষয়ের (degradation) প্রসারে প্রশিক্ষিত ব্যক্তি তৈরি করে।

একজন ছাত্র কৃষিতে এমএসসি পড়তে যে ছয় বৎসর ব্যয় করে, সেখানে তার একমাত্র লক্ষ্য হল স্বল্পমেয়াদী এবং ক্ষীণদৃষ্টি সজ্জাত ‘উৎপাদনশীলতা’। এর জন্য কৃষককে শ-খানেক জিনিস তৈরি করতে ও কিনতে হয়। কিন্তু যাতে করে পরবর্তী প্রজন্মের জন্য ও অন্যান্য জীবের জন্য কী কী কখন করা উচিত নয়, তা নিয়ে এতটুকু ভাবা হয় না। এখন জনগণ ও সরকারের এই উপলব্ধিতে জেগে ওঠার সময় এসেছে যে আমাদের প্রতিষ্ঠানগুলি দ্বারা উন্নীত (promoted) শিল্প-তাড়িত কৃষি-পথ অন্তর্নিহিতভাবেই অপরাধমূলক (criminal) ও আত্মহত্যার অনুসারী।

গান্ধী ঘোষণা করেছিলেন : যেখানে শোষণ থাকে সেখানে পোষণ থাকতে পারে না। বিনোবা ভাবে আরও বলেছিলেন, “করণার সাথে বিজ্ঞানের মিলন ঘটলে তা পৃথিবীতে স্বর্গ নিয়ে আসতে পারে, কিন্তু অহিংসা থেকে বিজ্ঞানের বিচ্ছেদ ঘটলে তা ঘটাতে পারে প্রলয়ংকরী অগ্নিকাণ্ড যার শিখা গ্রাস করতে পারে আমাদের সবাইকে।”

প্রকৃতির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির চেষ্টা হল এক মৌলিক মহা-ভুল যা আমাদের মতো কৃষিবিজ্ঞানীদের অজ্ঞতাকেই তুলে ধরে। মানুষের কলুষতামুগ্ধ প্রকৃতি তার উৎপাদনে ইতিমধ্যেই উদারতম। যেখানে একদানা চাল কয়েক মাসেই হাজার গুণ বৃদ্ধি পেতে পারে সেখানে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির প্রয়োজন আসে কোথা থেকে?

অসংখ্য ধরনের ফলের গাছ তাদের সমগ্র জীবনকালে বহু হাজার কেজির পুষ্তিকর ফল দেয়। যখন চাষি গাছে বিষ ঢালে না এবং দ্রুত মুনাফার জন্য সব কিছু তালগোল পাকিয়ে ফেলে না, তখনই এটা সম্ভব হয়। একটি শিশুর তার মায়ের দুধের অধিকার আছে, কিন্তু যদি আমরা মা বসুন্ধরার রক্ত ও মাংস নিংড়ে নিই আহলে আমরা তার কাছে চলমান পোষণের আশা করি

কীভাবে?

এই সমস্যার শিকড় রয়েছে অন্য সব কিছু অস্বীকার করে বাণিজ্য ও শিল্পের দাসত্ব করার মানসিকতায়। কিন্তু শিল্প শুধুমাত্র প্রকৃতিতে পাওয়া কাঁচামালগুলিকে পণ্যে রূপান্তরিত করে। শিল্প নতুন কিছু সৃষ্টি করতে পারে না। শুধুমাত্র প্রকৃতিই প্রতিদিনের সজীব সৌরশক্তির প্রবাহের সাথে সহযোগিতার মাধ্যমে সত্যিকারের সৃষ্টিশীল হয়ে নিজেকে পুনরুৎপাদিত করে তুলতে পারে।

প্রকৃতির ছয় স্ব-নবীকরণযোগ্য পরিবল (paribals) এই পৃথিবীতে প্রকৃতির ছয়টি প্রধান পরিবল বা উৎপাদক ও সৌরশক্তির দেওয়া-নেওয়ার মধ্য দিয়ে এক বিরামহীন খেলা চলেছে। এই পরিবলগুলির তিনটি হল বায়ু, জল ও মাটি। এগুলির সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত হয়ে কাজ করেছে প্রাণের তিনটি পরিবল — বনস্পতি সৃষ্টি (উদ্ভিদজগৎ) জীব সৃষ্টি (কীট ও কীটানুজগৎ) ও প্রাণী সৃষ্টি (পশু-পাখির জগৎ)। এই ছয় পরিবল পারস্পরিক আন্তঃসম্পর্কের মাধ্যমে এক গতিশীল ভারসাম্য বজায় রাখে, তাদের সাযুজ্যে তারা ফুটিয়ে তোলে প্রকৃতির বিশাল ঐক্যতান, বুনে চলে নতুনের জাল।

প্রকৃতির এই পরিবল বা উৎপাদকদের কোনোটাকেই বিপর্যস্ত করার অধিকার মানুষের নেই। কিন্তু আধুনিক প্রযুক্তি প্রাজ্ঞতা ও করুণা নাকচ করে বাণিজ্যের সাথে মিলিত হয়ে সর্বস্তরেই এই বিপর্যয় ডেকে এনেছে। আমরা মাটি, হাওয়া ও জলকে কলুষিত ও দূষিত করেছি। আমরা বেশিরভাগ বনভূমিকে নিশ্চিহ্ন করে তাদের জীবদের হত্যা করেছি ... এবং আধুনিক চাষিরা তাদের জমিতে নির্দয়ভাবে মারাত্মক সব বিষ-ছিটিয়েই চলেছে যেগুলি কীট ও কীটানু জগৎকে ধ্বংস করেছে। এই নীরব, ক্ষুদ্র, অক্লান্ত কর্মীরা মাটিকে বায়ুযুক্ত (ventilated) করে রাখে এবং মৃত উদ্ভিদ ও জীবজাত জীব-ভর (bio-mass) পুনরায় মাটিতে ফিরিয়ে এনে গাছপালার পুষ্টিসাধন করে। বিষাক্ত রাসায়নিকরা অবধারিতভাবে মাটি, জল ও মানুষ সহ প্রকৃতির প্রাণীসৃষ্টিকে বা পশু-পাখিদের বিষে ভরিয়ে তোলে।

অস্থায়িত্বের শিকড় (the root of unsustainability)

স্থায়িত্ব হল এক আধুনিক উদ্বেগ। যখন আপনি সবুজ বিপ্লবকে পথ দেখাচ্ছিলেন, তখন এই বিষয়টি মোটেই উচ্চারিত হত না। আপনি কি অস্বীকার করতে পারেন যে আমাদের পূর্বপুরুষরা প্রায় ৪০০০ হাজার বছর ধরে (কেউ বা বলেন ১০০০ বছর ধরে) প্রাকৃতিক ও জৈব পদ্ধতিতে চাষ করে আসছে।

গত ৪০-৫০ বছর ধরে ভূমির উর্বরতার যে উল্লেখযোগ্য ক্ষতিসাধন ঘটছে তা ব্যতিরেকেই তারা তা করে আসছিল। এটা কি একটা চোখে আঙুল দেবার মতো উৎকট ঘটনা নয় যে রাসায়নিক-নিবিড় ও সেচ-নিবিড় (দু)এক ধরনের (mono-culture) বাণিজ্যিক ফসলের (cash crop) চাষ দেশ জুড়ে বাস্তুতান্ত্রিক ধ্বংসের প্রসারের পিছনে প্রধানত দায়ী? এবং তা শুধুমাত্র একটি প্রজন্মের জীবৎকালেই!

ফসলের বৈচিত্র্য নাশের কারিগরি, জৈববস্তুর অভাব ও মাটির অবনমন (degradation)

হাজার হাজার বছর ধরে স্থানিক পরিবেশ পরিস্থিতির চাহিদার সঙ্গে খাপখাওয়ানো ফসলের বিপুল বৈচিত্র্য ছিল এদেশের গর্বের বিষয়। আমাদের লম্বা ও দেশজ অসংখ্য প্রজাতির দানাশস্য অনেক বেশি জীবভরের জোগান দিত, মাটিকে ছায়া দিয়ে সূর্যের তাপ থেকে রক্ষা করত। কিন্তু ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধির নামে বিদেশি বামন প্রজাতির শস্য বীজের সূচনা করা হল আর আপনার নানাবিধ প্রচেষ্টায় সেগুলির প্রসার ঘটানো হল। এর ফলে বহু রকমের আগাছার বৃদ্ধি ঘটল ভয়ংকর ভাবে। আগাছাগুলি এবার সূর্যালোকের জন্য নতুন বামন প্রজাতির শস্য গাছগুলির সাথে সফলভাবে প্রতিযোগিতা করতে সক্ষম হল। ফলে আগাছা নিয়ন্ত্রণে চাষিকে আরও বেশি শ্রম ও অর্থ নিয়োগ করতে হল।

বামন প্রজাতির দানাশস্যের খড়ের বৃদ্ধি ভয়ংকরভাবে কমে গেল — বেশিরভাগ দেশজ প্রজাতির খড়ের বৃদ্ধির তুলনায় প্রায় ১/৩ ভাগ। পাঞ্জাব ও হরিয়ানায় এই খড় পুড়িয়ে দেওয়া হত, কারণ মনে করা হত যে এই খড় বিভিন্ন ধরনের ক্ষতিকারক জীবাণুর ('pathogens') বৃদ্ধি ঘটাত। এই খড় খামারের বলদ বা গবাদি পশুদের খাওয়ানোর জন্য ছিল বিপদজনকভাবে বিষাক্ত। আর এই পশুগুলি দিনে দিনে ট্রাস্টরের দ্বারা প্রতিস্থাপিত হচ্ছিল। এর ফলে মাটির উর্বরতা বজায় রাখার জন্য জৈববস্তু পাওয়া যাচ্ছিল অনেক কম মাত্রায়। তা বাইরে থেকে কৃত্রিমভাবে প্রদেয় দ্রব্যাদির চাহিদা বাড়চ্ছিল। অবশ্যান্তবীভাবে চাষিরা আরও বেশি করে রাসায়নিকের ব্যবহার করছিল এবং ছেদহীন ধারাবাহিকতার সাথে ঘটে চলেছিল মাটির অবনমন ও ক্ষয়। (মানব) কারিগরি জাত মারীপোকাকার বৃদ্ধি

রাসায়নিক সার প্রয়োগে বুদ্ধিপ্রাপ্ত বিদেশি প্রজাতিগুলি ছিল 'মারীপোকা' ও বিভিন্ন রোগে স্পর্শকাতর যা আরও বেশি বিষ প্রয়োগের পথ করে দেয়। কিন্তু আক্রান্ত কীট-প্রজাতিগুলি দ্রুত এই বিষগুলির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ তৈরি

করতে সক্ষম হয়ে উঠল এবং দ্রুত সংখ্যায় বৃদ্ধি পেল। তাদের শিকারিরা — মাকড়সা, ব্যাঙ ইত্যাদি জীবরা — যারা এই কীটগুলি খেত এবং তাদের সংখ্যা জৈবিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করত (biologically Control) — তারা নিশ্চিহ্ন হল। আরও অনেক উপকারি প্রজাতি, যেমন কেঁচো, মৌমাছি ইত্যাদি জীবেরাও ভীষণভাবে কমে গেল।

কৃষি-ব্যবসা ও টেকনোলজিটদের পক্ষ থেকে আরও বেশি মাত্রায় বিষ প্রয়োগ এবং নতুনতর, বেশি বিষাক্ত (বেশি দামি) রাসায়নিক ব্যবহারের সুপারিশ করা হল। কিন্তু ‘মারী পোকা’ ও বিভিন্ন রোগের সমস্যার হাল হল আরও খারাপ। বাস্তুতান্ত্রিক, আর্থিক ও মানব মূল্য (human cost) ক্রমাগত চক্রাকারে বাড়তেই লাগল।

জলাভাব ও মৃত নোনামাটির ‘উন্নয়ন’

সংশ্লিষিত সারের ব্যবহার ও বর্ধিত হারে অর্থকরী ফসলের চাষ (cash cropping) জলসেচের প্রয়োজনীয়তা ভীষণভাবে বাড়িয়ে দিয়েছে। হিমালয় থেকে উৎপন্ন হওয়া পঞ্চনদীর দ্বারা জলসমৃদ্ধ রাজ্য পাঞ্জাবের ভাকরা বাঁধ নির্মাণ করা হয় ১৯৫২ সালে। এর পর সারা দেশ জুড়ে আরও কয়েক হাজার বড়ো ও মাঝারি বাঁধ নির্মিত হয়েছে, যার সাম্প্রতিক সংযোজন হল সর্দার সরোবর বাঁধ। আবার এখন আমাদের সরকার বিভিন্ন নদী-প্রবাহকে ঘুরিয়ে আন্ত-সম্পর্কিত (inter-linked) করে জুড়ে দেওয়া ৫,৬০,০০০ কোটি টাকার এক চমকদার কর্মসূচির প্রস্তাব নিয়ে নাড়া-চাড়া করছে। পরবর্তী প্রজন্মগুলির কথা না ভেবে এই ধরনের পরিকল্পনা হল নিছক তুঘলঘীয় পাগলামি।

দক্ষিণ আমেরিকার পরে ভারতেই পৃথিবীতে সর্বাধিক বৃষ্টিপাত হয়। এর বাৎসরিক গড় হল প্রায় ৪ ফুট। যেখানে ঘন গাছ-গাছালি মাটিকে ঢেকে রাখে এবং মাটি যেখানে জীবন্ত ও ছিদ্রযুক্ত (porous), সেখানে এই বিপুল বৃষ্টিপাতের অনেকটাই শোষিত হয়ে মাটি ও মাটির ভিতরের স্তরগুলিতে সঞ্চিত হয়। এই সঞ্চিত জলের একটা বড়ো অংশ চুইয়ে গভীরে প্রবেশ করে ভূগর্ভস্থ বরনা (underground aquifers or ‘groundwater tables’) বা ভূতল জলাধারগুলিকে ভরিয়ে তোলে।

তাই জীবন্ত মাটি ও ভূগর্ভস্থ জলাধারগুলি প্রকৃতি প্রদত্ত বিনা পয়সার চটজলদি (readymade) জলাধারের মতো কাজ করে। বৃষ্টিকে শোষণ করার জন্য সবচেয়ে কর্মক্ষম হল বনভূমি ও গাছ-পালায় ঢাকা মাটি। তাই

অর্ধ-শতাব্দী আগে বর্ষা স্থিমিত হওয়ার বা চলে যাবার বহু পরেও ভারতের বেশিরভাগ অঞ্চলে সারা বছর ধরে যথেষ্ট পরিমাণ জল সঞ্চিত থাকত, কিন্তু ব্যাপক বনচ্ছেদের ফলে মাটির পক্ষে বৃষ্টির জল শুষে নেওয়ার ক্ষমতা ভীষণভাবে কমে যায়। ফলে বরনা ও কুয়োরা শুকিয়ে যায়। এ ঘটনা বহু বহু জায়গায় ইতিমধ্যেই ঘটেছে।

এখন ভূজল পুনরায় ভরিয়ে তোলার ক্ষমতা ভীষণভাবে কমে গেছে। কিন্তু ভূজল তুলে নেওয়ার মাত্রা বেড়ে চলেছে ভীষণভাবে। ১৯৫০ সালে ভারতে প্রতিদিন যতটা ভূজল খনন করা হত, আজ খনন করা সেই জলের পরিমাণ হল ২০ গুণ বেশি। এই অববেচকের মতো জলের অপচয় ঘটে এক অতি সংখ্যালঘিষ্ঠ মানুষের দ্বারা। কিন্তু ভারতের বেশিরভাগ গ্রামের মানুষ যারা হাতে তোলা জল বা হস্তচালিত পাম্পে জল তোলে এবং বৃষ্টি-সেবিত জলে চাষ-বাস করে, তারা বহু প্রজন্ম ধরে মাথাপিছু প্রায় একই মাত্রায় জল উত্তোলন করছে।

ভারতে সমস্ত মানুষ যে জল ব্যবহার করে তার ৮০% জল ব্যবহৃত হয় সেচের কাজে, যার বেশিরভাগটাই ব্যবহৃত হয় রাসায়নিকভাবে চাষ করা অর্থকরী ফসলের চাষে। উদাহরণস্বরূপ সারা দেশে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক বড়ো ও মাঝারি বাঁধ আছে মহারাষ্ট্রে। কিন্তু শুধুমাত্র আখ চাষে — যা সারা দেশের চাষযোগ্য জমির ৩-৪% অংশে হয়ে থাকে — সেচের জলের প্রায় ৭০% জল ব্যয় করা হয়!

রাসায়নিকভাবে চাষ করা এক একর আখ চাষের জমিতে যত জল লাগে, সেই পরিমাণ জল ব্যবহার করে ২৫ একর জমিতে জোয়ার, বাজরা বা ভুট্টা চাষ করা যায়। চিনি কলগুলিতে জলের ব্যবহার হয় বিপুল মাত্রায়। আখ চাষ থেকে শুরু করে চিনি প্রক্রিয়াকরণের (processing) কাজে প্রতি কেজি শোধিত চিনি তৈরি করতে খরচ হয় ২-৩ টন জল। সমপরিমাণ জল ব্যবহার করে ঐতিহ্যগত জৈব পদ্ধতিতে ১৫০-২০০ কেজি পুষ্টিকর জোয়ার বা বাজরা (দেশজ জোয়ার বা জনার) উৎপাদন করা যেত।

যদিও বৃষ্টির জলের চাষ হিসাবে ধান এক উপযোগী ফসল, কিন্তু বহু ফসলের জন্য শীতে বা গ্রীষ্মে সেচ সহ চাষ ভূগর্ভস্থ জলাধারগুলিকে ক্ষয়িয়ে ফেলে এবং জলসম্পদের ওপর চাপ সৃষ্টি করে। আখের ক্ষেত্রেও অতিরিক্ত সেচ সহ চাষ মাটিকে লবণাক্ত করে মাটির ক্ষতিসাধন করে। সেই ক্ষতির পূরণ করা সম্ভব হয় না।

সেচ-নিবিড় কৃষির সবচেয়ে বড়ো উৎপাত হল মাটির লবণাক্তকরণ। কারণ এতে দিনে দিনে মাটির ওপরে উত্তরোত্তর পুরু এক লবণের স্তর

তৈরি হয়। এর ফলে বহু লক্ষ হেক্টর উর্বর জমি ধ্বংস হয়ে গেছে। সবচেয়ে বেশি সমস্যার সৃষ্টি হয় সেখানে, যেখানে সারা বছর ধরে আখ বা বাঁশমতী চালের মতো ভয়াবহ জলপেটুক ফসলের চাষ করা হয়। এগুলি করা হয় ঐতিহ্যগত নানাবিধ মিশ্রচাষ (mixed cropping), আবর্তন চাষের (crop rotation) অর্থাৎ বিভিন্ন ফসল ঘুরিয়ে ফিরিয়ে চাষের ব্যবস্থাকে পাশে সরিয়ে রেখে — যেগুলির জন্য জলসেচের কোনো প্রয়োজন হয় না অথবা হলেও তা হয় যৎসামান্য।

যেহেতু আজকের ভারতে সেচের জন্য ব্যবহৃত জলের প্রায় ৬০% জলই প্রয়োজনের অতিরিক্ত এবং বাস্তবিকই তা ক্ষতিকারক, তাই এ প্রশ্নে প্রথম পদক্ষেপ যা নেওয়া উচিত তা হল জলের ব্যবহারে নিয়ন্ত্রণ। তাই এই নিয়ন্ত্রণের ফলে অতিরিক্ত সেচের কারণে যে বিরাট ক্ষতি হয়েছে তাই-ই শুধুমাত্র বন্ধ হবে না, তাছাড়াও এর ফলে যে বিপুল পরিমাণ জল বাঁচবে, অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে যেখানে জলাভাব তীব্রভাবে অনুভূত হচ্ছে সেখানে সেই জলের জোগান দেওয়া যাবে।

কল্পবৃক্ষে সংরক্ষণশীল সেচ ও ভৌমজলের পুনর্ভরণ

কার্যকর (efficient) জৈব-কৃষিতে সেচের প্রয়োজন হয় সামান্য — অন্তত আধুনিক কৃষিতে যে মাত্রায় সেচ দেওয়া হয় তার চেয়ে অনেক কম। যখন মাটিতে একটা স্যাঁতসেঁতে বা ভেজা ভেজা ভাব বজায় থাকে — সেরকম মাটিতেই ফলন হয় সবচেয়ে বেশি। ধানই হল একমাত্র ব্যতিক্রমী ফসল যা জমে থাকা জলেও বৃদ্ধি পেতে পারে। আর তাই নাবাল জমিতে —
— যা সহজেই প্লাবিত হয় — সেরকম জমিতেই মৌসুমি ফসল হিসাবে ধানকে বেশি পছন্দ করা হয়। অন্য ফসলগুলির ক্ষেত্রে মাটির ভিতরে বিভিন্ন কণাগুলির (particles) মধ্যবর্তী স্থানগুলি যে বাতাসে ভরে থাকে — যা উদ্ভিদের মূলের শ্বসনের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয়, অতিরিক্ত সেচ সেই বায়ুকে ঠেলে সরিয়ে দেয়। এছাড়া দীর্ঘমেয়াদি প্লাবনের ফলে মূলগুলি পচে যায়।

আমার খামারে যা সেচ দেওয়া হয় তা আধুনিক কোনো খামারে দেওয়া সেচের এক ক্ষুদ্র ভগ্নাংশমাত্র। তাছাড়া বাগিচার ঘন গাছগাছালির নিচের ছিদ্রযুক্ত (porous) মাটি স্পঞ্জের মতো জল শোষণ করে, যা চুইয়ে ভিতরে প্রবেশ করে ভূগর্ভস্থ বারনাগুলি (aquifers) বা ভৌম-জলতল ভরিয়ে তোলে। প্রতি বর্ষায় এইভাবে বিপুল পরিমাণ বৃষ্টির জল ভূগর্ভে সঞ্চিত হয়। সেই জলের পরিমাণ শুধা মরসুমে সেচের জন্য কুয়ো থেকে উত্তোলিত

মোট জলের থেকে অনেক বেশি।

তাই আমার খামার অঞ্চলের বাস্তুতন্ত্র থেকে যতটা জল গ্রহণ করে তার থেকে জোগান দেয় অনেক বেশি। এটা পরিস্কার যে প্রকৃতির নিয়মানুসারে জৈব পদ্ধতিতে স্থানিক পরিবেশ পরিস্থিতিতে খাপ খাওয়ানোয় সক্ষম বিভিন্ন প্রজাতির ফসল, উদ্ভিদ ও গাছ-পালার মিশ্রচাষের মাধ্যমে জাতির জল সুরক্ষা ও খাদ্য সুরক্ষার নিশ্চয়তা প্রদান করা যায়।

৩০% বৃক্ষ আচ্ছাদনের প্রয়োজনীয়তা

আমাদের উচিত আগামী এক/দুই দশকের মধ্যে দেশের সমগ্র ভূমির ৩০% অঞ্চলে পুনরায় মিশ্র ও দেশজ গাছ-গাছালির জঙ্গল ফিরিয়ে আনা। এটিই হল বাস্তুতান্ত্রিক জলচাষের মূল কাজ যা হল ভৌমজলের (groundwater) প্রাকৃতিক প্রাচুর্য পুনরুদ্ধারের চাবিকাঠি। এইভাবে আমরা তুলনামূলকভাবে সামান্য খরচে মাত্র এক দশকের মধ্যেই বিপুলভাবে উপকৃত হতে পারি। দুঃখজনকভাবে আমরা এটি উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হই যে এদেশে মাটিতে প্রাকৃতিক জল ধারণ করার ক্ষমতা — ভারতে সম্পন্ন হওয়া, অসম্পূর্ণ এবং পরিকল্পনার স্তরে রয়ে যাওয়া সমস্ত বড়ো ও মাঝারি সেচ প্রকল্পগুলির সম্মিলিত ক্ষমতার চেয়ে বহুগুণ বেশি। এইরকম বিকেন্দ্রীভূত ভূগর্ভস্থ জলাধারগুলি অনেক বেশি কার্যকর, কারণ এগুলি ভূতল জলাধারগুলি (surface water) থেকে যে বিপুল পরিমাণ জল বাষ্পীভূত হয় তার থেকে সম্পূর্ণ সুরক্ষিত।

এমনকী বক্ষ্যা ও পতিত জমি এক দশকের মধ্যে তার স্বাস্থ্য ফিরে পেতে পারে। স্বল্পমেয়াদি, মধ্যমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি ফসল ও বৃক্ষাদি রোপণ করে তাদের বৃদ্ধির মধ্য দিয়ে যতক্ষণ না দীর্ঘমেয়াদি ফলের গাছগুলো পরিণত হয়ে ফল দিতে শুরু করে — এই রূপান্তরকালীন (transitional) সময় জুড়ে কৃষক ধারাবাহিকভাবে ফসলের জোগান পেতে পারে। বেশি পরিমাণ জীব-ভর পাওয়ায় এবং মাটি সারা বছর ধরে আচ্ছাদিত থাকার ফলে ভূমিক্ষয় তো রোধ হয়ই, পাশাপাশি মাটির উর্বরাশক্তিও পুনরুজ্জীবিত হয়।

উৎপাদন, দারিদ্র এবং জনসংখ্যা

বৃটিশরা এদেশ ছেড়ে চলে যাবার পর ভারতীয় কৃষির পুনরুদ্ধার হচ্ছিল দৃঢ়ভাবে। গ্রামাঞ্চলে যেখানে দেশের ৭৫% মানুষের বাস সেখানে পুষ্টির বৈচিত্র্যের কোনো অভাব ছিল না। ‘সবুজ বিপ্লব’কে ঠেলার (push) প্রকৃত

কারণ একটি সংকীর্ণ লক্ষ্য। সেটি হল তুলনামূলকভাবে বেশি দেরিতে নষ্ট হয় এমন খাদ্য-ফসলের উদ্ভূত অংশ যাতে আরও বেশি করে বাজার জাত করা যায় সেই লক্ষ্য পূরণ করা। এর পিছনে কাজ করছিল সরকারি নীতি — নগরায়ণ ও শিল্পবনের প্রসার।

আপনি যে নতুন পরজীবীসুলভ কৃষিকাজে ভীষণ প্রভাব খাটিয়েছিলেন তার দ্বারা উপকৃত হয়েছে শুধুমাত্র শিল্পপতি, ব্যবসায়ী আর ক্ষমতার লোকজন। চাষির খরচের বৃদ্ধি ঘটেছিল ভীষণভাবে এবং লাভের অংশও কমেছিল। বিশেষভাবে এর সাথে প্রাকৃতিক উর্বরতার ক্ষয়কে ধরলে তাদের লাভের কড়ি জুটেছিল সামান্যই, বরং বাড়ছিল তাদের ঋণের মাত্রা ও মাটির ধ্বংস, বহু চাষিই চাষ ছেড়ে দিল। আরও বেশি সংখ্যক চাষি চাষের খরচের ভয়ংকর বৃদ্ধির নিষ্পেষণে চাষ ছেড়ে দিতে চায়। একে দুঃখজনক ছাড়া আর কী বলা যেতে পারে! কারণ জৈব-কৃষির জন্য যা আমাদের দরকার তা প্রকৃতি উদার হস্তেই দিয়েছে এবং যা বিষহীন স্বাস্থ্যে সমৃদ্ধ খাবার জোগান দেয়।

ভারতীয় কৃষির প্রাকৃতিক স্বাস্থ্যকে পুনরুদ্ধারের পথই দারিদ্র, বেকারি ও জনসংখ্যা বৃদ্ধির আস্ত-সম্পর্কিত সমস্যাবলী সমাধানের পথ। সর্বোচ্চ সংখ্যক মানুষ আত্মনির্ভরশীল হয়ে উঠতে পারে শুধুমাত্র যদি কৃষিকাজে প্রয়োজনীয় জোগান (input) হয় ন্যূনতম। তাই ন্যূনতম পুঁজি, ন্যূনতম ত্রয়যোগ্য জোগান, ন্যূনতম কৃষি-যন্ত্রপাতি (হাল ও অন্যান্য হাতিয়ার ইত্যাদি), ন্যূনতম শ্রম ও ন্যূনতম বহিরাগত প্রযুক্তি দিয়ে কৃষিকাজ করায় সক্ষম হওয়া দরকার। তাহলে কৃষিতে খরচ বৃদ্ধি ছাড়াই উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে। দারিদ্র কমবে এবং জনসংখ্যার বৃদ্ধিও স্বতঃস্ফূর্তভাবে রোধ হবে।

ন্যূনতম বা শূন্য বাইরের জোগান (input) দ্বারা আত্মনির্ভরশীল কৃষিই হল সেই পথ যে পথে আমরা অতীতে অত্যন্ত সফলভাবে কৃষিকাজ করতাম। যুদ্ধ ও ভয়ংকর ঔপনিবেশিক শোষণের সময় ছাড়া আমাদের চাষিরা অন্য সময়ে বৃহৎ অংশে নিজেদের চাহিদা মেটাতে সক্ষম ছিল। এমনকী তারা বহুবিধ দ্রব্যের ক্ষেত্রে অল্প হলেও কিছুটা উদ্ভূত উৎপাদনও করত। এগুলি — বিশেষত যেগুলি দ্রুত নষ্ট হয়ে যায় (perishables) — সেগুলি শহরের বাজারে জোগান দেওয়া ছিল কঠিনতর। আর তাই জাতীয় চাষির পথ দেখানো হল কীভাবে রাসায়নিকের প্রয়োগে গম, চাল বা চিনি ইত্যাদি কয়েক রকমের (monoculture) অর্থকরী ফসল চাষ করা যায়। আর

তা করতে গিয়ে ঐতিহ্যগত বহুবিধ চাষের (polyculture) যেগুলিতে কিছু কিনে প্রয়োগ করতে হয় না, সেগুলির চাষকে অবজ্ঞা করা হল। (দেখুন পরিশিষ্ট ৫ — একটি প্রাচীন ৬ ধরনের ফসলের সুসংহত চাষ-ব্যবস্থা — যেখানে থাকে তুলো, দু-ধরনের দেশজ জোয়ার, তিন ধরনের গুঁটি জাতীয় খাদ্য-ফসল, যেগুলি কম বৃষ্টিপাতের অঞ্চলগুলিতে জলসেচ বা বাইরে থেকে জোগান (input) সরবরাহ ছাড়াই চাষিদের সারা বছর ধরে ফসলের বৈচিত্র্য নিয়ে নিরবচ্ছিন্নভাবে উৎপাদনের ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে সাহায্য করত।

উপসংহারে

আমি আশা করি আপনার এমন সংহতি আছে যার দ্বারা আপনি মিশ্র জৈবচাষ, বৃক্ষ রোপণ, বনের পুনঃসৃজনে (স্থানিক সম্পদ ও অধিকারগুলি সহ) ব্যাপক পরিবর্তনের সহায়ক হবেন — যা ভারতে অত্যন্ত প্রয়োজন। আমার কাছে যদি কোনো প্রশ্ন বা সংশয় উত্থাপন করা হয় — বিশেষত লিখিতভাবে — সেটি/সেগুলি আমি আনন্দের সাথে উত্তর দেব। এছাড়া আমি আপনাকে আমার খামার পরিদর্শনে স্বাগত জানাই। সেক্ষেত্রে আসার আগে যদি জানিয়ে আসেন তাহলে ভালো হয়। বহু বছর ধরেই আমি প্রাকৃতিক/জৈবচাষে উৎসাহী যে কোনো মানুষকে প্রতি শনিবার বেলা ২টো থেকে ৪টে পর্যন্ত কল্পবৃক্ষ দর্শনে খোলা আমন্ত্রণ জানিয়ে এসেছি। সেটি আজও অব্যাহত রয়েছে।

সবশেষে আমি জানাচ্ছি যে এই চিঠিটি আমার সাথে গুজরাতি ভাষায় আলোচনার ভিত্তিতে ইংরেজিতে অনুবাদ করেছেন ভারত মনসাতা। (এই চিঠির সাথে সংযোজিত পরিশিষ্টগুলি তাঁর লিখিত ও আর্থকেয়ার বুকস দ্বারা প্রকাশিত প্রাকৃতিক চাষের দর্শন 'The Vision of Natural farming' বই থেকে উদ্ধৃত।

আপনি আমার মতের সহমত পোষণ করেন বা না করেন, আমি আপনার উত্তরের অপেক্ষায় রইলাম।

আপনার বিশ্বস্ত

ভাস্কর এইচ সাভে

চিঠির নমুনা পাঠানো হয়েছে — ১। ভারতের প্রধানমন্ত্রীকে

২। কেন্দ্রীয় সরকারের কৃষিমন্ত্রীকে

৩। ন্যাশনাল অ্যাডভাইজারি কাউন্সিলের চেয়ারপার্সনকে

৪। গণমাধ্যমগুলিকে

সই
(এম এস স্বামীনাথন)
সংযোজন : এ/এ

অধ্যাপক এম এস স্বামীনাথন

চেয়ারম্যান

জাতীয় কৃষি কমিশন
ভারত সরকার
কৃষি মন্ত্রক
(কৃষি ও সহযোগী দপ্তর)
এম.এস.এস./ডিবি
৩১ জুলাই ২০০৬
শ্রী ভাস্কর সাভে
কল্লবৃক্ষ খামার
গ্রাম দেহরি, ভায়া উমের গ্রাম
জেলা ভালসাদ
গুজরাত ৩৯৬১৭০

আমার প্রিয় শ্রীসাভে,
আপনার সহৃদয় চিঠির জন্য আপনাকে আমি ধন্যবাদ জানাই। আমি
দীর্ঘদিন ধরে আপনার কাজকে সম্মান জানিয়ে এসেছি। আপনি যে বিস্তারিত
পরামর্শ দিয়েছেন তার জন্য আমি আপনার কাছে কৃতজ্ঞ। আমরা আমাদের
চূড়ান্ত রিপোর্টে সেগুলি বিবেচনা করব। বাস্তবত্বের ক্ষতি না করে কীভাবে
ধারাবাহিকভাবে উৎপাদন বৃদ্ধি করা যায় সে বিষয়ে তথ্য জানানোর জন্য
আমি এখানে একটি পত্র (paper) সংযোজিত করলাম।

অন্তরের উষ্ণ শ্রদ্ধা সহ
আপনার একান্ত

খোলা চিঠি ২

প্রেরক : ভাস্কর সাভে, ‘কল্পবৃক্ষ খামার’
গ্রাম : দেহরি, ভায়া উমেরগ্রাম
জেলা : ভালসাদ, গুজরাত ৩৯৬১৭০
ফোন : ০২৬০-২৫৬৩৮৬৬ ও ২৫৬২১২৬

শ্রী এম এস স্বামীনাথন সমীপেষু
চেয়ারপার্সন, জাতীয় কৃষি কমিশন
কেন্দ্রীয় কৃষি মন্ত্রক, ভারত সরকার
নতুন দিল্লি

১৬ অগাস্ট ২০০৬

বিষয় : ক্রমবর্ধমান আত্মহত্যা ও কৃষকদের জন্য জাতীয় নীতি
□ প্রাকৃতিক/জৈবকৃষির মাধ্যমে ভারতীয় কৃষির পুনঃসঞ্জীবিতকরণ
নির্দেশ : ২৯.০৪.০৬-এ আপনাকে লেখা আমার খোলা চিঠির উত্তরে
৩১.০৭.০৬-এ লেখা আপনার চিঠি

প্রিয় শ্রী স্বামীনাথন,

১। ৩১ জুলাইয়ে লেখা আপনার চিঠিটি পোস্ট মারফত পেয়েছি প্রায় ছয়দিন আগে। আপনার দ্রুত ও সংক্ষিপ্ত উত্তরের জন্য আপনাকে ধন্যবাদ জানাই। আপনি লিখেছেন :

“আমি দীর্ঘদিন ধরে আপনার কাজকে সম্মান জানিয়েছি এবং আমাকে আপনি বিস্তারিতভাবে যেসব প্রস্তাব ও পরামর্শ দিয়েছেন তার জন্য আমি আপনার প্রতি কৃতজ্ঞ। আপনি মূল্যবান সব মন্তব্য ও সুপারিশ করেছেন আমাদের চূড়ান্ত রিপোর্টে সেগুলি রাখবার জন্য বিবেচনা করব।”

২। আপনার উত্তর থেকে জানতে পারলাম যে আপনি আমার চিঠির সাথে মোটামুটিভাবে একমত (in broad agreement)। সেক্ষেত্রে আমি কৃতজ্ঞ থাকব যদি আমাকে আপনি নির্দিষ্টভাবে জানান আমার কোন প্রস্তাব বা পরামর্শগুলির সাথে আপনি একমত এবং কোনগুলি আপনার চূড়ান্ত রিপোর্টে সুপারিশ করতে চান। আমার ২৯.৭.০৬ তারিখের এবং ১৬.০৮.০৬ তারিখের এই চিঠির প্রেক্ষিতে আমাকে দয়া করে মন্তব্য ও পরামর্শ দিয়ে জানান, আমার চিঠির কী কী ব্যাপারে আপনার মনে চাপা প্রশ্ন (reservation)

বা ভিন্নমত রয়েছে। আপনার প্রশ্নগুলির উত্তর দিয়ে সংশয় নিরসন করতে পারলে আমি খুশি হব।

৩। আপনার চিঠির সাথে আপনি আপনার ও শ্রী পি সি কেশবন লিখিত সবুজ বিপ্লব থেকে চিরসবুজ বিপ্লব : পথসমূহ ও শব্দাবলী (From Green Revolution to Evergreen Revolution : Pathways and Terminologies) শীর্ষক একটি (গবেষণা)পত্র সংযোজিত করেছেন। আমি আমার কিছু শুভাকাঙ্ক্ষীদের অনুরোধ করেছি যাতে তারা লেখাটি গুজরাতি বা মারাঠি ভাষায় অনুবাদ করে দেন যাতে করে, আশা করি এক বা দুই সপ্তাহের মধ্যে আপনাকে আমার প্রতিক্রিয়া জানাতে পারি।

৪। ভারতীয় চাষিদের ৫%-এর কম মানুষ ইংরাজি বোঝেন — একথা ধরে নিয়ে আমি কৃষকদের জন্য জাতীয় কমিশনকে আবেদন করছি যাতে আগামী দিনে যদি কৃষকদের মতামত চেয়ে কোনো গুরুত্বপূর্ণ বার্তা, সংবাদ বা অন্তর্বর্তী প্রতিবেদন পাঠানো হয়, তা যেন (ইংরাজির পাশাপাশি) তাদের মাতৃভাষায় অনুবাদ করে পাঠানো হয়। এরকম একটি পদক্ষেপ কৃষকদের সাথে আপনার আলোচনাকে তাৎপর্যপূর্ণভাবে সাহায্য করতে পারে যাতে কৃষকদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে তা সত্যিকারের ফলপ্রসূ হয়ে উঠতে পারে।

৫। যেসকল বরিষ্ঠ/প্রাচীন ঐতিহ্যশালী/পুরুষ ও নারী জৈবচাষিরা তাদের গুরুত্বপূর্ণ জ্ঞান, অন্তর্দৃষ্টি ও প্রাজ্ঞতা পরবর্তী প্রজন্মদের দেবার জন্য আর বেশিদিন থাকবে না, জরুরি ভিত্তিতে তাদের খুঁজে বের করা দরকার। বিভিন্ন অঞ্চলে সুস্থায়ী জৈব-চাষের ব্যবহারিক জ্ঞানের এমন সব জীবন্ত ভাণ্ডারগুলির সাথে আলোচনা-আদানপ্রদানের সমস্ত নথিপত্র (ও অনুবাদ) বিজুতভাবে ছড়িয়ে দেওয়া দরকার। সেরকমই বিকেন্দ্রীকৃত ও প্রাকৃতিক পরিবেশের ফসল ও অকৃষিজাত (uncultivated) গাছ-গাছালির বিচিত্র প্রজাতির সমৃদ্ধ সম্ভারকে জরুরি ভিত্তিতে সংরক্ষণ করা প্রয়োজন। আমাদের এরকম হাজার হাজার প্রজাতি রয়েছে যেগুলি এখন আরও বেশি অবহেলিত ও অবলুপ্তির পথে চলেছে।

৬। আমি উৎসাহিত বোধ করছি এইজন্য যে ২৯.৭.০৬ তারিখে আমার লেখা খোলা চিঠিটি বেশ আগ্রহের সঞ্চার করেছে। বেশিরভাগ লোকজন আমার বক্তব্যকে সমর্থন ও প্রশংসা করেছেন। কিছু মানুষ এই চিঠিতে সাড়া দিতে গিয়ে নির্দিষ্ট কিছু সমালোচনা এবং/অথবা প্রশ্ন করেছেন। নিচে আমি এরকম কিছু সমালোচনা ও প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছি।

(১) সৎ বিজ্ঞান ও অনাবরোধমূলক প্রযুক্তি (Honest science

and non-invasive technology)

কয়েকজন লিখেছেন যে সমস্তরকম বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানীদের দূর্নাম করা আমার উচিত নয় — বিশেষত বিখ্যাত ব্যক্তিত্ব — যাঁরা জাতির জন্য কাজ করেছেন। আমি পরিষ্কার করে জানাতে চাই যে বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানীরা কম মূল্যবান বলে আমি মনে করি না। কিন্তু সাথে সাথে বৈজ্ঞানিক কর্তৃপক্ষরা বিশেষত ব্যবসায়িক বা পেটেন্ট করা প্রযুক্তি ও জোগান (input) সংক্রান্ত ক্ষেত্রে বৃহত্তর সুরক্ষাকে নিশ্চিত করার দায়িত্ব যাদের ওপর — তাদের সমালোচনার উর্ধ্বে বলে মনে করাকে আমি অবৈজ্ঞানিক ও ক্ষতিকারক বলে বিশ্বাস করি।

আমাদের এমন ধরনের প্রযুক্তি দরকার যার সাথে অবশ্যই করুণা, দূরদৃষ্টি ও প্রাজ্ঞতার মিলন ঘটবে। প্রথমত এবং সবার আগে এই প্রযুক্তি কোনোরকম ক্ষতি করবে না। সাথে সাথে এই প্রযুক্তি হবে এমন যাতে করে দূরবর্তী ও বাহ্যিক উৎপাদক শক্তিসমূহের প্রতি নির্ভরশীলতা (ও আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা) বৃদ্ধির পরিবর্তে তা জনসাধারণকে বুনীয়াদি চাহিদাগুলি পূরণে আত্মনির্ভরশীল হিসাবে গড়ে তুলতে শক্তি জোগাবে। তাই স্থানিক চাহিদা ও অধিকার এবং স্থানিক ও বিকেন্দ্রীকৃত সম্পদ ও কৃৎকৌশলের ওপর সর্বোচ্চ জোর দেওয়া দরকার। বিশেষত বিশুদ্ধ জল, স্বাস্থ্যকর খাবারের মতো সবচেয়ে বুনীয়াদি চাহিদার জন্য বাইরে থেকে দ্রব্য করা প্রযুক্তি জোগানের (inputs) ওপর নির্ভরশীলতা ভীষণ বিপদজনক। আমার বিশ্বাস এটি প্রকটভাবে স্বতঃসিদ্ধ।

(২) ‘সবুজ বিপ্লব’ কি আমাদের দুর্ভিক্ষের হাত থেকে বাঁচায়নি?

বরং এটা বললে আরও সত্য বলা হয় যে সবুজ বিপ্লব আমাদের মাটিকে ধ্বংস করেছে, ভূজলকে নিঃশেষ করে ধারাবাহিকভাবে ভবিষ্যতের ব্যাপক দুর্ভিক্ষের পরিবেশ-পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে। বিপুল পরিমাণ দানাশস্য গুদামে থাকা, পচে যাওয়া এবং ইদুরের খাদ্য হওয়া সত্ত্বেও (অথবা এই কারণেই) অসম বন্টন, ক্ষুধা ও অপুষ্টি ইতিমধ্যেই আমাদের সাথি। কিন্তু অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ খাবারের (শাকসবজি, ফল, ডাল, বাজরা ইত্যাদি) জোগান অনেক কম। গম ও চালকে প্রাধান্য দেওয়া সবুজ বিপ্লবকে ধন্যবাদ যে তার লাগাম আর তার প্রবক্তাদের হাতে নেই।

আমাদের দেশে বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন অঞ্চলে বাংলার দুর্ভিক্ষ সহ যেসমস্ত দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছিল সেগুলি (যদি সম্পূর্ণভাবে নাও হয়) বহুলাংশে ছিল মানুষের তৈরি। স্বাধীনতার আগে, বিশেষত যুদ্ধের সময়ে, এর প্রধান

কারণ ছিল তীব্র ঔপনিবেশিক শোষণ। প্রায়শই রপ্তানির জন্য বলপূর্বক বাণিজ্যিক চাষ (cash crop), বিপুল পরিমাণে কর ও লেভি আদায়ের ফলশ্রুতিতে সেচের জন্য জলাধার ইত্যাদি সাধারণের সম্পদের (common resources) অবহেলা ইত্যাদি প্রধান কারণগুলির জন্য গ্রামবাসীগণ অনাহারের শিকার হয়েছিল। আজকের দিনে যেমন খাদ্যশস্য উৎপাদনের সামগ্রিক অভাব নয় বরং বৈষম্যই সমস্যাটির জন্য মূলত দায়ী, তখনও ছিল তাই। আমাদের প্রাকৃতিক সম্পদের ও চিরাচরিত কৃষিবিজ্ঞানের ঐতিহ্য নিঃসন্দেহে ছিল পৃথিবীতে সর্বাপেক্ষা সমৃদ্ধ। ফসল ফলাতে পাশ্চাত্যের ল্যাবরেটরি-জাত কৃষিবিজ্ঞানীদের তথাকথিত চোখ ধাঁধানো প্রযুক্তির কোনো দরকার আমাদের ছিল না।

এছাড়া আমাদের এটাও দেখানো হয়েছিল যে সবুজ বিপ্লব চালু হওয়ার আগের দশকগুলিতে সামগ্রিকভাবে ভারতে সমস্ত রকম ফসলের ক্ষেত্রে বার্ষিক চক্রবৃদ্ধি হারে মোট উৎপাদন (total production) ও উৎপাদনশীলতা (Productivity) বৃদ্ধি অর্থাৎ প্রতি একক ক্ষেত্র জমিতে কতটা উৎপাদন বৃদ্ধি — এদুটিই ছিল সবুজ বিপ্লবের পরে যা হয়েছিল তার থেকে বেশি।

প্রথম যোজনাকালে (১৯৫১-১৯৫৬) খামারের বার্ষিক চক্রবৃদ্ধিহারে উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছিল ৪.১% এবং বার্ষিক চক্রবৃদ্ধিহারে উৎপাদনশীলতা বেড়েছিল ১.৪%। দ্বিতীয় যোজনাকালে (১৯৫৬-৬১) বার্ষিক চক্রবৃদ্ধিহারে ওই দুটির বৃদ্ধির হার ছিল যথাক্রমে ৩.১% ও ১.৮%। তৃতীয় ও চতুর্থ যোজনাকালে সম্মিলিতভাবে (১৯৬১-১৯৭১) তুলনামূলক উৎপাদন বৃদ্ধি ছিল বার্ষিক ২% ও উৎপাদনশীলতার বৃদ্ধি ছিল বার্ষিক ১.৩%। উৎস : হ্যান্ডবুক ও এগ্রিকালচার, ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ এগ্রিকালচারাল রিসার্চ (আইসিএআর) ১৯৮৭, পৃষ্ঠা ১০৬।

(৩) আধুনিক জৈব প্রযুক্তি বিপদজনক

দু-একটি সংবেদে (response) জানানো হয়েছিল যে কৃষি-রাসায়নিকগুলি, যেভাবেই হোক না কেন কর্মপোযোগী নয়। সেগুলি মোটেই টেকসই (sustainable) নয় এবং তারা ধ্বংসাত্মক। আজকে আবার আধুনিকতর জৈব-প্রযুক্তিকে কৃষকদের নতুন রক্ষক হিসাবে তুলে ধরা হচ্ছে — যা নাকি দ্বিতীয় সবুজ বিপ্লবের সম্ভাবনা অথবা আশঙ্কাকে তুলে ধরেছে। নতুন জৈব-প্রযুক্তির দাওয়াইগুলি আরও বেশি ব্যয়বহুল এবং আরও বেশি বাহ্যিক জোগানের (input) ওপর নির্ভরশীল। এই দাওয়াইগুলির মধ্যে আমাদের

কৃৎকৌশল ব্যবহার করার পুরোনো মানসিকতা বিশেষভাবে বর্তমান। এর ফলে বিভিন্ন দিক দিয়ে আমরা নানাবিধ সমস্যার মুখোমুখি হতে পারি যা ক্ষীণদৃষ্টিজাত জৈব-প্রযুক্তির ধ্যানধারণার বাইরে।

জৈবকারিগরির কর্মকাণ্ড তার নিজস্ব নিয়মেই বিশেষত জিন বদলের কেরামতির (manipulation) প্রক্ষেপে সেই প্রয়াসই চালায় যাতে নির্ধারিত কিছু অত্যাৱশ্যক সীমাবদ্ধ বৈশিষ্ট্যগুলির কার্যকারিতা (performance) সর্বোচ্চ সীমায় নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়। অবশ্য তা করতে গিয়ে বিস্তৃততর কী ফলাফল হতে পারে, সে সম্পর্কে অনেক কিছুই অজানা থেকে যায়। কিন্তু প্রকৃতি কাজ করে দূর্বোধ্য, বিশাল, ও অসংখ্য সব উপাদানগুলির আস্ত-সম্পর্ক বা দেওয়া-নেওয়ার মধ্য দিয়ে যা জিন প্রযুক্তিবিদদের পেশাগত ক্ষেত্র বা বোধের অতীত। জৈব প্রযুক্তিবিদদের মনে নির্দিষ্ট কিছু অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক স্বার্থ থাকতে পারে। কিন্তু বিচিত্রতর উপাদান ও শক্তিসমূহের অন্তর্নিহিত রহস্যময় সাযুজ্য — যার দ্বারা সার্বিকভাবে সাম্যের সৃষ্টি হয় এবং যা স্বাস্থ্যকে লালন করে — তা অনুধাবন করার জন্য যে কল্পনাশক্তির প্রয়োজন তার ছিঁটে-ফোঁটাও তাদের নেই।

আমাদের বোধকে বিপর্যস্ত করে দেওয়ার মতো জিন ও কারিগরিবিদ্যার কিছু বিপদ এখন পরিষ্কার ভাবে বোঝা গেছে। আরও বিপদগুলি দিনে দিনে উন্মোচিত হচ্ছে। আমাদের প্রাকৃতিক জৈব-বৈচিত্র্যের (কৃষিজ ফসলের ও অকৃষিজ প্রজাতি উভয়েরই) ওপর জিন দূষণের (genetic pollution) আগ্রাসনের বিপদ আজ আর শুধুমাত্র কল্পবিজ্ঞান জগতের বিষয় নয়। আমরা যদি শুধু এটা দেখতে পাই যে প্রকৃতির দানে যুগ যুগ ধরে পরীক্ষিত শত সহস্র প্রজাতির জিন কোডে কোনো কিছুই অভাব নেই, তাহলে আমরা উপলব্ধি করব যে জীবনের ডিএনএ ফিতেকে (DNA ribbon of life) বদলানোর কোনো প্রয়োজন নেই। আর মানুষের মঙ্গলের জন্য তার থেকে অনেক স্বাস্থ্যকর ও সুখকর পথ রয়েছে।

(৪) রাসায়নিকের ব্যবহার ধীরে ধীরে কমিয়ে ফেলা ভাল কৃৎকৌশল (Strategy) নয়

কেউ কেউ জিজ্ঞাসা করেন যে হঠাৎ করে রাসায়নিক ব্যবহার বন্ধ না করে তাদের ব্যবহার কি ধীরে ধীরে কমানো উচিত নয়? কিন্তু কম মাত্রায় রাসায়নিকের ব্যবহার করলে মাটির ক্ষতির মাত্রা কিছুটা কমতে পারে বটে, তবুও তারা ক্ষতিকারক। তাদের কম ব্যবহারে ক্ষতি কমলেও, তা চলতেই থাকে।

যখন মাটির ক্ষতি বন্ধ হয়ে যায় এবং মাটির স্বাস্থ্যের পুনরুদ্ধার শুরু হয় — এইরকম ঘুরে দাঁড়ানোর বিন্দুতে (turning point) পৌঁছানো তখনই সম্ভব হয় যখন জমির জৈব-জীবন যা বিধিয়ে তোলে, তার ব্যবহার সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করা যায়। তখন মাটির অণুজীব ও কেঁচো ইত্যাদি ধীরে ধীরে পুনরুজ্জীবিত হতে থাকে। ফলে মাটিতে হিউমাস বা উদ্ভিজ্জ সারও (পাতা পচার সার) তৈরি হতে থাকে। এটাই হল মাটির স্বাস্থ্যের মূল ভিত্তি যা ছাড়া স্বাস্থ্যকর উদ্ভিদ ও স্বাস্থ্যকর খাবার তৈরি করা যায় না।

রাসায়নিক ব্যবহারকারী যেসব চাষিদের সাথে আমি সাক্ষাৎ করেছি তাদের বেশিরভাগই পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে যে তারা দ্রুতগত এক ঢালে গড়িয়ে পড়েছে। কিন্তু তাদের চাষের প্রণালী বদল করার আত্মবিশ্বাসের অভাব আছে বলে মনে হয়। তাদের প্রতি আমার পরামর্শ হল যে তারা অন্তত তাদের সমগ্র জমির একটা টুকরো অংশে রাসায়নিক ব্যবহার সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করে হাতের কাছে জৈব যা কিছু পায় তা ব্যবহার করে রাসায়নিক মুক্ত জৈবচাষ শুরু করুক।

এতে প্রথম বছরে যদি ফলন অর্ধেকও হয়ে যায়, তাহলেও এই চাষে কেনা জোগান (purchased input) শূন্য বা খুব কম হওয়ার ফলে যে আর্থিক সাশ্রয় হয় তাতে ফলন কম হওয়া সত্ত্বেও খুব একটা আর্থিক ক্ষতি হবে না। এরপর থেকে ফলন বাড়তে থাকে, খরচ আরও কমে থাকে। দ্বিতীয় বা তৃতীয় বছরের শেষে অবস্থার (মাটির স্বাস্থ্যের) উন্নতি পরিষ্কারভাবে বোঝা যায়। আর যদি এই জৈব-খাদ্য চাষির নিজের পরিবার গ্রহণ করে, তাহলে তাদের স্বাস্থ্যের প্রভূত উন্নতি হবে। এইভাবে যতই চাষির অভিজ্ঞতা ও আত্মবিশ্বাস বাড়বে ততই চাষি আরও বেশি জমিতে জৈব পদ্ধতিতে চাষ করতে পারবে। প্রাপ্ত জৈব জোগানের (organic input) আরও ঘনীভূত মাত্রায় ব্যবহার মাটির পুনরুজ্জীবন ও উৎপাদনশীলতা বাড়িয়ে দেবে। তাই শুরুর ফলাফলে চাষি নিরুৎসাহ হয় না।

(৫) প্রাকৃতিক/জৈবচাষ কি বৃদ্ধি পাচ্ছে?

হ্যাঁ। কিন্তু এর প্রসার আরও দ্রুত, আরও বিস্তৃত হওয়া দরকার। আমার চারপাশের খামারগুলি কি আমার চাষ-পদ্ধতি গ্রহণে অনুপ্রাণিত হয়েছে? হ্যাঁ, কিন্তু এক্ষেত্রেও তা যথেষ্ট নয়। দেহরি-উমেরগ্রাম অঞ্চলে আমার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে যে খামারগুলি সম্পূর্ণভাবে প্রাকৃতিক/জৈব চাষ করছে তারা হল সোনালী খামার, সাংভি খামার, ইরানী খামার, আকাশ খামার ও দেব-খামার। আমার দুই ছেলে নরেশ ও সুরেশ প্রাকৃতিক/জৈব পথ অনুসরণ

করে আর অন্যান্যদের পথ দেখাতে সাহায্য করে।

অন্য আরও যেসব প্রশ্ন বা সংশয় থেকে যাচ্ছে — যেগুলির উত্তর এখানে দেওয়া হয়নি, সেগুলির সম্বন্ধে বলতে পারলে আমি খুশি হব। ওপরে উল্লেখিত ২০নং অনুচ্ছেদে আমার অনুরোধের উত্তরের অপেক্ষায় রইলাম যাতে করে এই আলোচনার আদানপ্রদান অব্যাহত থাকে এবং আমাদের দেশের স্বাস্থ্য — খাদ্য, জল, মাটি ও প্রাকৃতিক (জিন-প্রযুক্তি দ্বারা বদল করা হয়নি এমন) জৈব বৈচিত্র্য ইত্যাদি সংক্রান্ত আলোচনাগুলি সংশ্লিষ্ট সকলের কাছে আরও বেশি করে পৌঁছাতে পারে।

আপনার একান্ত

ভাস্কর সাভে

প্রতিলিপি পাঠানো হচ্ছে

১। ভারতের প্রধানমন্ত্রীকে

২। কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রীকে

৩। জাতীয় পরামর্শদাতা পর্ষদকে (National Advisory Council)

৪। গণমাধ্যমগুলিকে।

খোলা চিঠি ৩

প্রেরক : ভাস্কর সাভে, ‘কল্পবৃক্ষ খামার’

গ্রাম : দেহরি, ভায়া উমেরগ্রাম

জিলা : ভালসাদ, গুজরাত ৩৯৬১৭০

ফোন : ০২৬০-২৫৬৩৮৬৬ ও ২৫৬২১২৬

প্রতি : শ্রী এম এস স্বামীনাথন

চেয়ারপার্সন, জাতীয় কৃষি কমিশন

কেন্দ্রীয় কৃষি মন্ত্রক,

অক্টোবর ৯, ২০০৬

প্রিয় শ্রী স্বামীনাথন,

আপনি যেমন বলেছেন, “ভারতে ১০০০০ বছরের কৃষির ইতিহাসে এই প্রথম “কৃষকদের জন্য জাতীয় নীতির’ খসড়া প্রস্তুত করা হচ্ছে। আমি নিশ্চিত যে আপনি কাজটির গুরুত্ব ও এদেশের কোটি কোটি যন্ত্রণাক্লিষ্ট রাসায়নিক চাষিদের জীবনের ওপর তার সুদূরপ্রসারী প্রভাব সম্পর্কে বিশেষভাবে সচেতন।

২৯ জুলাই ২০০৬ তারিখে আপনাকে লেখা আমার খোলা চিঠির সংক্ষিপ্ত উত্তর পেয়ে আমি উৎসাহিত বোধ করছি। আমার লেখা ১৬ আগস্ট ২০০৫-এর খোলা চিঠিতে আমি আপনাকে অনুরোধ করেছিলাম যে আমার কোন সুপারিশগুলির সাথে আপনি একমত তা আমাকে জানান। আমি এটাও জানিয়েছিলাম যে আমার বাকি পরামর্শগুলি সম্বন্ধে যদি কোনো প্রশ্ন, সংশয় বা অসম্মতি থাকে সেগুলির উত্তর দিতে আমি রাজি। আপনার কাছ থেকে কোনো উত্তর না পেয়ে আমি নিরাশ হয়েছি। তা সত্ত্বেও আমি আপনাকে আবার লিখছি। যেহেতু আমরা দুজনেই আশির উর্ধ্বে এবং আমরা জীবনের গোথুলি লগ্নে প্রবেশ করেছি। অব্যাহত যোগাযোগের মাধ্যমে আমরা অন্তত অন্যদের জন্য আশা জাগিয়ে রাখার প্রচেষ্টাকে চালিয়ে যেতে পারি।

৩১ জুলাই ২০০৬ তারিখে আপনার লেখা চিঠির সাথে সাথে সংযোজিত লেখাটিতে (article) রাসায়নিকের ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত ‘সবুজ বিপ্লবের’ খামতিগুলির কথা আপনি স্বীকার করেছেন এবং ‘চির সবুজ বিপ্লবের’ প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেছেন। আমি আশা করি এটির মাধ্যমে আপনি বোঝাতে চেয়েছেন এমন এক চাষ-পদ্ধতি ও ভূমি ব্যবহারের নৈতিকতা যা কোনো ক্ষতি করে না এবং যা এমন এক প্রতিশ্রুতি দেয় যাতে

সুস্থায়ীভাবে স্বাস্থ্যকর খাদ্যের ফলন অব্যাহত রাখা যায় এবং যা শুধুমাত্র পেট ভরায় না বরং শরীর, মন ও সত্তাকে (spirit) গুরুত্বপূর্ণ পুষ্টি প্রদান করে।

আপনি একমত হবেন যে আমাদের ১০০০০ বছরের কৃষির ইতিহাসে ৯৯৫০ বছর ধরে ভারত বাস্তবিকই এরকম এক সাংস্কৃতিক নৈতিকতা এবং চাষ-ব্যবস্থা অনুসরণ করে এসেছে। সমগ্র কৃষির ইতিহাসে আপনি আর কোথায়, বিশেষভাবে স্বতন্ত্র কোনো চাষ-ব্যবস্থা পাবেন যা চিরসবুজ (চাষ-ব্যবস্থা) হিসাবে এর থেকে বেশি জোরদার দাবি করতে পারে?

অবশ্য আমরা অত্যন্ত ভাগ্যবান (ছিলাম এবং আছি) যে আমরা সারা বছর প্রচুর সূর্যালোক পাই, আমাদের রয়েছে বিপুল জৈব-বৈচিত্র্যের ভাণ্ডার, আর পাই পর্যাপ্ত পরিমাণের থেকেও বেশি বৃষ্টিপাত। কোনো রকম লালন ছাড়াই আমাদের প্রাকৃতিক অরণ্যগুলি যোভাবে সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে তা থেকে বাজায় হয়ে উঠে যদি অসংখ্য কৃত্রিম হস্তক্ষেপ বন্ধ করা যেত তাহলে কী না সৃষ্টি করা যেত!

ওপরে উল্লিখিত লেখাটিতে আপনি আধ ডজন পথের কথা ছুঁয়ে গেছেন যেগুলি আপনার মতে ‘চির সবুজ বিপ্লবের’ জন্য অনুসরণ করা যেতে পারে। প্রথম পথ যেটিকে আপনি উল্লেখ করেছেন সেটি হল ১০০% জৈব পথ যেখানে মোটেই রাসায়নিক ব্যবহার করা হয় না, কিন্তু সে পথ বিশুদ্ধ ‘কিছু না-করা’ প্রাকৃতিক কৃষির (do-nothing natural farming) থেকে সুস্পষ্টভাবে আলাদা। কারণ এতে কিছু মরসুমি কর্ষণ (seasonal tillage), হতে দিয়ে আগাছা নিয়ন্ত্রণ এবং হয়তো বা অ-রাসায়নিক ‘মারীপোকা নিয়ন্ত্রণ’-এর প্রয়োজন থাকবে। আপনার লেখায় যে শেষ পথটির আপনি উল্লেখ করেছেন সেটি হল কর্ষণহীন প্রাকৃতিক চাষের পথ। ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে মরসুমি মাঠ-ফসলের ক্ষেত্রে কর্ষণহীন চাষের কিছু সমস্যা আছে, কিন্তু গাছ-ফসল চাষের ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক চাষ নিশ্চিতভাবেই সম্ভব।

গাছের বীজ বা চারাগুলি রোপণ করার পর যখন মাটি সবুজে ঢেকে যায়, প্রকৃতি মানুষের হস্তক্ষেপ ছাড়াই, কর্ষণের কাজটির সম্পূর্ণ দেখভাল করে। অন্য কাজগুলি যেমন মাটির ওপর আচ্ছাদন সৃষ্টি করা (mulching), প্রাকৃতিক সার দেওয়া (manuring) ইত্যাদিগুলির প্রথম কয়েক বছর করা প্রয়োজন হতে পারে — যার অর্থ হল এই পর্যায়টি রূপান্তরকালীন জৈব পর্যায় (transitional organic phase)। কিন্তু যখন থেকে রোপিত চারাগুলি বড়ো হয়ে ফল দিতে শুরু করে, তখন থেকে কিছু গাছ ফসল যেমন

— নারকেল, সবেদা, কলা ইত্যাদিদের ক্ষেত্রে কিছু মাত্রায় সংরক্ষণশীল সেচ ছাড়া আর কিছুই প্রয়োজন হয় না। অনেক খাদ্য গাছের প্রজাতি যেমন আম, জাম, বের, কাজু, সজনে, আয়ানা, আতা, মথুয়া ইত্যাদির ক্ষেত্রে এটির কোনোই প্রয়োজন পড়ে না, বিশেষত প্রথম বছরের পরে। তারা আমাদের প্রাচীন অরণ্যের মতোই প্রাকৃতিক।

তাই যেটা করা প্রয়োজন সেটা হল ১০০% জৈব চাষ দিয়েই শুরু করা — যে পদ্ধতি মাঠ-ফসলের ক্ষেত্রে চলতেই থাকবে এবং যা বেশিরভাগ গাছ-ফসলের ক্ষেত্রে দিনে দিনে বিশুদ্ধতর প্রাকৃতিক কৃষিতে বিবর্তিত বা রূপান্তরিত হবে। চির সবুজ বিপ্লবকে পুনরায় ফিরিয়ে আনার জন্য আমাদের এই পথগুলিকে মেলাতে হবে। আপনি যে অন্য পথগুলির কথা উল্লেখ করেছেন, সেগুলিতে রাসায়নিক ও জৈব জোগান (inputs) এবং প্রাকৃতিক ও অপ্রাকৃতিকের মিশ্রণ ঘটানো হয়। আমার আশঙ্কা সেগুলি অন্ধগলি, ভবিষ্যতের সত্যিকারের চির সবুজের পথ নয়।

বহু দশক ধরে ঘনিষ্ঠভাবে জানা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে আমি যা শিখেছি তা থেকে আমি প্রত্যয়ের সাথে নিম্নলিখিত পরামর্শ ও সুপারিশগুলির সারসংক্ষেপ পেশ করছি।

পরামর্শ / সুপারিশ

১। আমাদের জাতীয় নীতিতে দেশের জল সুরক্ষা ও খাদ্য সুরক্ষার ওপর প্রধান গুরুত্ব আরোপ করা উচিত এবং তা করতে হবে স্থানীয় অঞ্চলের উপযোগী শস্য উদ্ভিদ ও বিশেষত বৃক্ষাদির জৈব ও মিশ্রচাষের মাধ্যমে।

২। যেসকল চাষি বর্তমানে রাসায়নিক ব্যবহার করছে, সরকারের উচিত তাদের সর্বতোভাবে উৎসাহিত ও সাহায্য করা যাতে তারা প্রতি বছর তাদের ২০%-২৫% জমিতে একেবারেই রাসায়নিক ব্যবহার না করে ১০০% জৈব-পদ্ধতিতে চাষ করে। এইভাবে করলে ভারতের পক্ষে ৪-৫ বছরের মধ্যে সম্পূর্ণভাবে (এবং সুখের সাথে) বিষাক্ত কৃষি-রাসায়নিকের হাত থেকে মুক্ত হওয়া সম্ভব।

৩। আমাদের উচিত দেশের ৩০% ভূমিতে স্থানীয় অঞ্চলের সাথে খাপ খায় এমন মিশ্র, দেশজ বৃক্ষাদি ও গাছপালা রোপণ করে বনভূমি (জৈবভাবে) পুনরুদ্ধার করা। তা করতে হবে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে এবং আগামী এক দশকের মধ্যে, বিশেষত জমির সেই সব ঢালু অঞ্চলে যেখানে ভূমিক্ষয়ের প্রবণতা বেশি। এটি হল বাস্তুতান্ত্রিক জলচাষের মূল কাজ — ভূজলের প্রাকৃতিক প্রাচুর্যের চাবিকাঠি। এর ফলে সবচেয়ে কম খরচে এবং

সবচেয়ে কম সময়ে আমরা বিশেষভাবে উপকৃত হব। এইরকম বিকেন্দ্রীভূত, ভূগর্ভস্থ জলাধার অধিকতর কার্যকর, কারণ এটি ভূতল জলাধারের বিপুল বাষ্পীভবন থেকে সুরক্ষিত। বৃক্ষরোপণের ফলে নানারকম ব্যবহারযোগ্য উৎপাদিত দ্রব্য পাওয়া যাবে যাতে এক বিশাল সংখ্যক মানুষ উপকৃত হবেন। সুপারিকল্লিতভাবে অঞ্চলের উপযোগী স্বল্পমেয়াদি, মধ্যমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি গাছপালা পুঁতলে কৃষক ধারাবাহিকভাবে ফলন পাবে এবং যতক্ষণ না দীর্ঘমেয়াদী গাছ/বৃক্ষগুলি পরিণত হয়ে ফল দিতে শুরু করে, এই রূপান্তরকালীন পর্যায়ে (transitional phase) সে টিকে থাকতে পারবে। মাটি বেশি বেশি জৈব-ভর (bio-mass) পেলে এবং মাটি যদি সারা বছর ঢেকে রাখা যায় তাহলে মাটির উর্বরশক্তি বৃদ্ধি ও ত্বরান্বিত হয়।

৪। সংরক্ষণশীল সেচের নীতিকে কঠোরভাবে পালন করতে হবে। এটি করতে হবে পুষ্টিকর খাদ্য-ফসলগুলিকে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে, বস্তুত বেশিরভাগ শস্যই সেচের ফলন দেয় যখন মাটি থাকে স্যাঁতসেঁতে (যেখানে ভাসানো সেচ দেওয়া হয় না) যাতে মাটিতে বায়ু চলাচলের পথ প্রশস্ত হয়। বেশি জল খায় এমন মাঠ-ফসল যেমন, ধান, নিচু জমিতে এই শস্যের চাষ করা হয়, অন্য ঋতুতে বা শুষ্ক মরসুমে সেচ দিয়ে ধানের চাষ বন্ধ করা উচিত অথবা অন্তত আগামী পাঁচ বছরে ধীরে ধীরে পর্যায়ক্রমে গুটিয়ে ফেলা দরকার। জলের অভাব আছে এমন অঞ্চলে এবং জল নিকাশ ভাল হয় না এমন জমিতে এবং যেখানে গরম আবহাওয়ায় খুব বেশি বাষ্পীভবন হয় — এইসব অঞ্চলে আর্দ্র চাষ আবশ্যিকভাবে নিষিদ্ধ করা উচিত। এই নীতির ফলে অন্তত ৬০% সেচের জল বাঁচানো যাবে। এর ফলনে উর্বর কৃষিভূমি যে জলমগ্নতার কারণে লবণাক্ত হয়ে পড়ে — আর তা উদ্ধার করা সম্ভব হয় না — সেই সমস্যা থেকেও মুক্তি পাওয়া যাবে।

৫। আমাদের জৈব বৈচিত্র্যের (ফসল ও অকৃষিজ প্রজাতি উভয়েরই) যে বিপুল সম্পদ, বিশেষ অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে তাদের বিকেন্দ্রীভূত প্রাকৃতিক বাস্তুতন্ত্রে সংরক্ষিত করা দরকার এবং এই সংরক্ষণের নিয়ন্ত্রণ থাকতে হবে স্থানীয় চাষিদের হাতে।

৬। তেমনি জরুরি ভিত্তিতে প্রতিটি জীব-অঞ্চলে (bio-region) এবং আবহাওয়া অনুযায়ী কৃষি অঞ্চলের (agro-climate) গভীর ঐতিহাসালী কৃষিজ্ঞান অভিজ্ঞ জৈবচাষিদের কাছ থেকে নথিভুক্ত করতে হবে।

৭। কোনো রকম অপ্রাকৃতিক জৈব প্রযুক্তির হস্তক্ষেপের প্রয়োজন নেই। জিন প্রযুক্তির কেরামতিতে বদল করা প্রজাতিগুলি আমাদের খাদ্য

সার্বভৌমত্বের ওপর রাসায়নিকগুলির চেয়েও আরও মারাত্মক প্রভাব ফেলতে পারে।

৮। যুদ্ধকালীন তৎপরতায় ভূমিক্ষয় আটকাতে হবে। সরকারি নথি জানাচ্ছে যে বর্তমানে ৩৫০ মিলিয়ন একর জমি বৃষ্টি ও বাতাসের দ্বারা ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, এই ধরনের ভূমিক্ষয় নিবারণের সর্বাপেক্ষা কার্যকর ও উৎপাদনশীল কৌশল হল মাটিকে গাছ-পালা বিশেষত বহুবর্ষজীবী বৃক্ষ দিয়ে ঢেকে রাখা।

৯। জমির উর্বরতা পুনরুদ্ধারের জন্য সমস্ত শস্য-অবশেষ ও জৈব বর্জ্য (bio-mass) জমিতে ফিরিয়ে দিতে হবে, মাটি থেকে জৈব-দ্রব্যের নিকেশ (drainage) বন্ধ করতেই হবে।

১০। কৃষকদের ভালো হস্তচালিত যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম দেওয়ার জন্য প্রযুক্তিকে কাজে লাগাতে হবে, যাতে কৃষকের কর্মক্ষমতা বাড়ে ও পরিশ্রমের ভার লাঘব হয়। এ প্রক্ষেপে চাষিদের কীসে সুবিধা বা কীসে অসুবিধা এগুলি ক্রমাগত তাদের কাছ থেকেই জানতে হবে।

১১। স্থানীয়ভাবে যাতে চাষিরা তাদের অভিজ্ঞতা, দক্ষতা ও বীজ নিজেদের মধ্যে দেওয়া-নেওয়া করতে পারে, এ ব্যাপারে সরকারের উচিত তাদের উৎসাহিত ও সাহায্য করা। আবার যদি দরকার থাকে তাহলে কী সাহায্য তাদের দরকার, একথা বোঝার শ্রেষ্ঠ বিচারক হল চাষিরা নিজেই।

১২। শহরবাসীদের তাদের রান্নাঘরের বর্জ্য থেকে কেঁচো-সার (vermi-compost) তৈরি করে তাদের বাড়ির লাগোয়া ফাঁকা জমিতে অথবা বাড়ির ছাদে জৈব উপায়ে সবজি-বাগান করতে উৎসাহিত করতে হবে। এছাড়া শহরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির প্রাকৃতিক সম্পদের পুনর্সৃষ্টি সম্বন্ধে ফলিত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা প্রসারে কাজ করা উচিত। এই উদ্দেশ্যে (শিক্ষক সহ ছাত্র-ছাত্রীরা) গ্রামাঞ্চলে গিয়ে অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের জন্য শহরের স্কুলগুলিতে বছরে ১৫ দিনের ছুটি মঞ্জুর করা যেতে পারে। গ্রামাঞ্চলের স্কুলগুলিতে বৃষ্টি শুরুর এক সপ্তাহ আগে থেকে ৪৫ দিন ব্যাপী ছুটি দেওয়া উচিত যাতে গ্রামীণ জনসাধারণ কৃষি ও রোপণের কাজে বিশেষ ধ্যান দিতে পারে — যে কাজগুলি অন্য সময়ে করা যায় না।

সম্ভবত আপনি খুব ভালো ভাবেই জানেন যে কিউবা জৈব-কৃষিতে কীভাবে বড়ো বড়ো পা ফেলে এগিয়ে গিয়েছে — সেটা তারা করতে বাধ্য হয়েছিল সোভিয়েতের পতন ও আমেরিকার আর্থিক অবরোধের (embargo) ফলে। সম্ভবত আপনি এ ব্যাপারেও সচেতন যে জীবাশ্ম-জ্বালানী-নিবিড় (fossil-fuel-intensive) রাসায়নিক কৃষির পথ আমরা হঠাৎ করে

ছেড়ে দিতে বাধ্য হতে পারি, যদি আমাদের জ্বালানির জোগান (যা বহুলাংশে আমদানি নির্ভর) অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে অথবা যদি তাদের দাম তীব্রভাবে বেড়ে যায়। এমনকী যদি আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে এই সংকট নাও আসে, আমাদের প্রাকৃতিক পুঁজি — আমাদের মাটির অবনমন (degradation) ইতিমধ্যেই হয়ে উঠেছে মারাত্মক। আমাদের ভূ-জলের অবস্থাও তথৈবচ। যত শীঘ্রই আমরা জৈব পথ গ্রহণ করি আমাদের ততই ভালো এবং বাস্তবিকই তা সারা পৃথিবীর পক্ষেই ভালো।

তাড়াছড়ো করে ঐচ্ছিকভাবে (voluntarily) সবটা বদলে যাবে এই আশা করা হয়তো অবাস্তব। কিন্তু যদি আমরা ওপরে লিপিবদ্ধ কাজগুলির ৫০% সম্পন্ন করতে পারি, তাহলে আমাদের চাষিরা একটা লড়াই করবার সুযোগ পাবে। তার চেয়ে কমে সম্ভব হওয়া হবে দেশ ও তার জনগণের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা এবং আমাদের মাটির ও সত্তার/আত্মার প্রতি এক গভীর হিংসাত্মক আক্রমণ।

ভাস্কর সাভে

প্রধানমন্ত্রীকে খোলা চিঠি

প্রেরক : ভাস্কর সাভে, ‘কল্পবৃক্ষ খামার’

গ্রাম : দেহরি, ভায়া উমেরগ্রাম

জিলা : ভালসাদ, গুজরাত ৩৯৬১৭০

ফোন : ০২৬০-২৫৬৩৮৬৬ ও ২৫৬২১২৬

প্রতি : শ্রী মনমোহন সিং

ভারতের প্রধানমন্ত্রী

নতুন দিল্লি

নভেম্বর ১, ২০০৬

বিষয় : ক্রমবর্ধমান কৃষক আত্মহত্যা ও জাতীয় কৃষি নীতি

প্রিয় প্রধানমন্ত্রী,

দেশের মুখ্য জীবনরক্ষাকারী ব্যবস্থাগুলি যদি আমরা ধ্বংস হয়ে যেতে দিই, তাহলে বাকি সব কিছু অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ে। বাস্তবতন্ত্রে ক্যানসার সৃষ্টিকারী ‘উন্নয়ন’ জমে থাকা মোটা অর্থ — কয়েকশো কোটি ডলার — এক নিষ্ঠুর পরিহাস।

আমি আশা করি উত্তরোত্তর বেশি সংখ্যক ভারতীয় চাষিরা যে আত্মহত্যা করছে তাদের ভয়ংকর ক্রেশ আপনি উপলব্ধি করছেন, এর মূলে রয়েছে আমাদের মাটি, ভূজল, অরণ্য ও জীব-বৈচিত্র্যের মতো প্রাকৃতিক সম্পদের ক্রমাগত ক্ষয় ও ধ্বংস এবং আমাদের কাণ্ডজ্ঞান ও দেশজ জ্ঞান ও সংস্কৃতির সমস্ত ব্যবস্থাটির অবমূল্যায়ণ।

আমি ৮৪ বছরের এক প্রাকৃতিক/জৈব চাষি। ছয় দশকের ওপর সময় জুড়ে বিরাট বৈচিত্র্যপূর্ণ খাদ্য-ফসল ফলাবার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা রয়েছে আমার। এই এতগুলো বছর ধরে আমি রাসায়নিক পদ্ধতি সহ বিবিধ চাষ পদ্ধতির অনুশীলন করেছি।

আমি ২৯.০৭.০৬ তারিখে কৃষকদের আত্মহত্যা, তার পিছনের কারণগুলি এবং ভারতীয় কৃষির পুনরুজ্জীবনের পথ ইত্যাদি বিষয়ে জাতীয় কৃষি কমিশনের শ্রী এম এস স্বামীনাথনকে একটি চিঠি লিখি। আপনার দৃষ্টিপাতের জন্য খোলা চিঠিটি ও তার সাথে সংযোজিত ছয়টি পরিশিষ্টের জেরক্স কপি এখানে সংযোজিত করা হল।

শ্রী স্বামীনাথন ৩১.০৭.০৬ তারিখে আমার চিঠির উত্তরে লিখেছেন,

“আমি দীর্ঘদিন ধরে আপনার কাজকে সম্মান জানিয়ে এসেছি এবং আমাকে বিস্তারিতভাবে পরামর্শ দেওয়ার জন্য আপনার কাছে কৃতজ্ঞ। আপনি মূল্যবান সব সুপারিশ করেছেন, আমাদের চূড়ান্ত রিপোর্ট তৈরি করার সময় আমরা এইসব সুপারিশগুলি বিবেচনা করব।” এই চিঠিটি এবং শ্রী স্বামীনাথন দ্বারা প্রেরিত একটি সংক্ষিপ্ত সম্পাদকীয়/পত্রের (paper) নমুনা এখানে সংযোজিত হল।

শ্রী স্বামীনাথন স্বীকার করেছেন (concedes) যে সবুজ বিপ্লবের প্রযুক্তি “মাটি ও জলের গুণমানের ক্ষতি করেছে”, ফসলে মারীপোকার বৃদ্ধি ঘটিয়েছে, বিষাক্ত কীটনাশকের ব্যবহার বাড়িয়েছে এবং “আমাদের বাস্তুতান্ত্রিক ভিত্তির ক্ষতি করেছে।” এটা যে সারা পৃথিবী জুড়ে ঘটেছে এবং ক্রান্তীয় পরিবেশে তা বিশেষ ভাবে ক্ষতিকর প্রভাব ফেলেছে — তা যথেষ্টভাবে নথিভুক্ত (documented) হয়েছে।

১৬.০৮.০৬ তারিখে আমি শ্রী স্বামীনাথনকে চিঠি ২-এর মাধ্যমে লিখে পাঠাই এবং অনুরোধ করি যাতে আমার কোন কোন পরামর্শগুলিতে তিনি একমত হয়েছে তা যেন জানান। আজ পর্যন্ত কোনো প্রশ্ন বা অসম্মতির কথা আমাকে জানানো হয়নি। শ্রী স্বামীনাথন ও তাঁর কমিশন এই আলোচনায় বিশেষত খোলা আলোচনায় খুব একটা আগ্রহী বলে আমার মনে হয়নি।

আমার ১৬-০৮-০৬ তারিখের চিঠির কোন উত্তর না পেয়ে আমি জাতীয় কৃষি কমিশনকে ০৯-১০-০৬ তারিখে আর একটি খোলা চিঠি লিখি। পূর্ববর্তী চিঠির সাথে শ্রী স্বামীনাথন একটি পত্র (paper) পাঠিয়েছিলেন যাতে তিনি ‘চির সবুজ বিপ্লবের পথসমূহ’ বিষয়টি নিয়ে কিছুটা আলোচনা করেছিলেন। আমার এই তৃতীয় খোলা চিঠিতে আমি গুঁর লেখাটির ওপর কিছু মন্তব্য করেছিলাম। ওই চিঠিটিতে (চিঠিটি এখানে সংযোজিত হল) আমি জাতীয় কৃষি নীতির খসড়াতে — যা জাতীয় কৃষি কমিশন দ্বারা “ভারতের ১০০০০ বছরের কৃষির ইতিহাসে প্রথমবার লিখিত হচ্ছে” — অন্তর্ভুক্ত করার ক্ষেত্রে বিবেচনা করার জন্য ১২টি সুপারিশ করি। এদেশের ১০০০০ বছরের জৈব-কৃষির ইতিহাসে গত ৫০ বছর বাদ দিলে বাকি দীর্ঘসময় জুড়ে আমরা কখনও কৃষির স্থায়িত্ব নিয়ে সমস্যার মুখোমুখি হইনি। এদেশে বিবর্তিত হয়ে গড়ে ওঠা মহান প্রাচীন সংস্কৃতি সারা পৃথিবী জুড়ে অসংখ্য মানুষকে অনুপ্রাণিত করেছে। আমাদের বর্তমান সময় (যখন বিভিন্ন সংকট বিশ্বায়িত হয়েছে) ভারতের দিকে চেয়ে আত্মনাদ করছে যাতে সে আবার দৃষ্টান্ত সহযোগে আশার আলোকস্তম্ভে পরিণত হতে পারে। এদেশের

করণার সংস্কৃতি ও নৈতিক সহ-বিবর্তন (ethical co-evolution) এই পৃথিবীর কাছে আমাদের কেরামতিযুক্ত (manipulative) আধুনিক প্রযুক্তির চাতুর্যের চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। অথবা আমাদের ডলার রাশিকৃত করার ক্ষমতা যা আমাদের উদর স্ফীত করে এবং আমাদের চারপাশে জীবনের বোধহীন (dead), নিরর্থক দ্রব্যাদি স্তুপীকৃত করে, কিন্তু যা স্বাস্থ্য, জ্ঞান অথবা সুখ কিনতে পারে না, এসবের থেকে আমাদের করণার সংস্কৃতি অনেক গুরুত্বপূর্ণ।

আমি প্রত্যয়ের সাথে বলছি যে শুধুমাত্র প্রাকৃতিক সাযুজ্য ভরা জৈব-চাষের মাধ্যমে ভারত তার সমস্ত জনসাধারণকে পর্যাপ্ত স্বাস্থ্যকর খাদ্যের যোগান দিতে পারে এবং সকলের সুস্থাস্থ্য, মর্যাদা ও শান্তির সাথে বসবাস করার জন্য প্রতিটি বুনিয়াদি চাহিদা মেটাতে পারে।

এই বিশাল দেশে কোনো কৃষি দপ্তর বা বিশ্ববিদ্যালয় বা জৈব-প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠানে কোনো অর্থনৈতিকভাবে ফলপ্রসূ (viable) খামার আছে কি, যেখানে আধুনিক পদ্ধতিতে চাষ করা হয় এবং খামারটি স্থানীয় বাস্তুতন্ত্রের মোদা ভোজ্য বা গ্রাহক হবার বদলে মোদাজোগানদার? কিন্তু যেখানে প্রকৃতিতে দেওয়া-নেওয়ার স্রোত অবাধ ও অব্যাহত (synergy in nature), সেখানে এটাই বাস্তব। বাস্তুতান্ত্রিক হিসাব রক্ষার (ecological audit) যে কোনো মাপকাঠিই গ্রহণ করা হোক না কেন, দেখা যাবে পারিপার্শ্বিক পরিবেশের স্বাস্থ্যের ওপর আমার খামার কল্লবৃক্ষের এক ইতিবাচক প্রভাব রয়েছে। দেখার চোখ আছে এমন যে কোনো ভ্রমণার্থীর চোখেই এটা ধরা পড়বে। অর্থনৈতিকভাবেও আমার খামারে আমি যে কোনো আধুনিক চাষির খামারের চেয়ে বহু গুণ বেশি লাভ পাই।

এটা পরিষ্কারভাবে বোঝা যায় যে এদেশে খাদ্য সুরক্ষাকে নিশ্চিত করতে যেটা দরকার, সেটা হল, প্রকৃতির নিয়মানুসারে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের উপযোগী শস্য, উদ্ভিদ ও বিশেষত বৃক্ষাদির জৈব উপায়ে মিশ্র চাষ। অন্য যে কোনো পথের চেয়ে এ পথেই বৃহত্তর সংখ্যক মানুষ ও ভবিষ্যত প্রজন্মগুলির জন্য ন্যূনতম খরচ ও সময়ে আরও অনেক বেশি অর্থনৈতিক ও বাস্তুতান্ত্রিকভাবে লাভবান হওয়া সম্ভব।

আমি জানি আপনি ভীষণ ব্যস্ত এবং বিভিন্ন কাজের চাপে ভারাক্রান্ত। কিন্তু যেহেতু এই বিষয়টি বিশেষ অগ্রাধিকারের যোগ্য, আমার বিশ্বাস যে আপনি এটির প্রতি ব্যক্তিগত আগ্রহ দেখাবেন এবং কোনো নিষ্ঠাবান যোগ্য ব্যক্তি বা গোষ্ঠীকে দায়িত্ব দেবেন যাতে তিনি বা তাঁরা অন্যান্য জৈব/প্রাকৃতিক চাষিদের সাথে যোগাযোগ/বিতর্ক/আলোচনা অব্যাহত রেখে

বিষয়টিকে ফলপ্রসূ করে তোলেন।

শ্রদ্ধার সাথে,

ভাস্কর সাভে

সংযোজন

১। ২৯.৭.০৬ তারিখে শ্রী এম এস স্বামীনাথন, চেয়ারপার্সন, জাতীয় কৃষি

কমিশনকে লেখা খোলা চিঠি ১

২। পরিশিষ্ট ১ থেকে ৬ (৬টি নথি)

৩। ৩১.৭.০৬ তারিখে কৃষি কমিশনের শ্রী স্বামীনাথনের লেখা উত্তর

৪। উপরোক্ত উত্তরপত্রটির সাথে সংযুক্ত (তাং ৩১.০৭.০৬) অতিথি সম্পাদকীয়/পত্র (paper)

৫। জাতীয় কৃষি কমিশনের শ্রী স্বামীনাথনকে ১৬.০৮.০৬ তারিখে লেখা

খোলা চিঠি ২

৬। জাতীয় কৃষি কমিশনের শ্রী স্বামীনাথনকে ৯.১০.০৬ তারিখে লেখা খোলা

চিঠি ৩

প্রতিলিপি :

১। শ্রী শারদ পাওয়ার, কৃষিমন্ত্রী, কেন্দ্রীয় সরকার

২। জাতীয় পরামর্শদাতা কাউন্সিল

৩। গণমাধ্যমগুলি

কম বৃষ্টিপাতের অঞ্চলগুলির শুখা জমিতে নানাবিধ ফসলের মিশ্রচাষ ও তাদের নিরবিচ্ছিন্ন ফলন

ভাস্কর সাভে বলছিলেন, “গুজরাতের সুরেন্দ্রনগর, সবরকছা এবং বনসকছা ইত্যাদি জেলা — যেগুলি সবচেয়ে শুকনো এবং যে সব জেলায় সারা বছরে মাত্র ১০ থেকে ২০ ইঞ্চি বৃষ্টিপাত হয়, সেখানে চাষিরা ঐতিহ্যগতভাবে মিশ্রচাষের মাধ্যমে সারা বছর ধরে অব্যাহতভাবে ফসল তোলে এবং চাহিদা মেটাতে সক্ষম হয়। এটা তারা করতে সক্ষম হয়, কোনো রূপ ফলনের হ্রাস ছাড়াই, বছরের পর বছর ও প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে এবং এটি তারা করে বাইরে থেকে জোগান (input) ও কোনো রূপ সেচ ছাড়াই। এটা করতে গিয়ে তারা শুধু ব্যবহার করে তাদের আগের বছরের ফলন থেকে রেখে দেওয়া বীজ।

আমার মনে আছে পাঁচ দশকের আগে, ১৯৫২ সালে গুজরাতের সুরেন্দ্রনগর জেলায় এরকম এক চাষির খামারে আমি গিয়েছিলাম। তাঁর মাঠ দেখে আমি মুগ্ধ হয়েছিলাম। তাঁর মাঠে ছয় ধরনের শস্য একসাথে বপন করা হয়েছিল : ১। তুলো, ৩৩০–৩৫০ দিনের ফলন দেওয়া প্রজাতি, ২। তুভার (পিজন পি বলে এক ধরনের মটরগুঁটি) যা ৩২০–৩৩০ দিনে ফলন দেওয়া প্রজাতি, ৩। জোয়ার (সরগম), একটি ১৫০–১৬০ দিনে ফলন দেওয়া প্রজাতি, ৫। বাজরার (পার্ল মিলেট) ১২০–১২৫ দিনে ফলন দেওয়া প্রজাতি এবং ৬। মুগ (মুগ কলাই), একটি ৬৫–৭০ দিনের প্রজাতি।

এই মিশ্রচাষে প্রতি প্রথম ও তৃতীয় সারিতে (অর্থাৎ মাঝের একটি সারি বাদ দিয়ে) ছিল কোনো একটি গুঁটি-জাতীয় (legume) শস্য। গুঁটি জাতীয় শস্যরা মাটিতে নাইট্রোজেন জোগান দেয়। এর ফলে সংলগ্ন দুটি দিকেই অন্য শস্যের বৃদ্ধিতে সাহায্য করে। এখানে কয়েক সপ্তাহ বৃষ্টির পরেই মাটি গাছ-পাতায় ঢেকে যায়। মাটি এভাবেই সারাবছর ছায়ায় ঢাকা থাকে, যতক্ষণ না পরের বর্ষার মরসুমে চাষি নতুন করে চারা রোপণ করে।

ফলিত পদক্ষেপগুলি (practical steps)

বেশ কয়েকটি জমির খণ্ডাংশ (plots) তৈরি করুন, যা সাকুল্যে ১ অথবা ১.২৫ একরের বেশি হবে না। বৃষ্টির শুরুতে গোটা জমিটা লাঙল দিয়ে চষে ফেলুন। প্রতিটা জমির পরিসীমা বা কিনারায় ৩–৪ ফুট চওড়া জমি ফেলে রাখুন, যাতে সেখানে বীজ পড়ে প্রাকৃতিকভাবেই অ-কৃষিজ গাছ-গাছালির বৃদ্ধি ঘটে। এই উদ্ভিদগুলিকে (স্থানীয় আগাছা) না উপড়ে বাড়তে দিন। এগুলি ফসলের ক্ষতিকারক পোকামাকড়দের খাদক-প্রজাতিদের বাসস্থান

হিসাবে কাজ করে। এছাড়া তারা জমিতে অতিরিক্ত তাপ, ঠান্ডা ও জোরালো বাতাস নিয়ন্ত্রণ করে শস্য-গাছদের পক্ষে এক সুবিধাজনক ক্ষুদ্র-জলবায়ু (micro-climate) তৈরিতে সাহায্য করে।

“ভিতরে কেন্দ্রীয় কর্ষিত এলাকায় একটি অন্তর একটি সারিতে বপন করুন তুলো ও তুভার। দুটি সারির মাঝে দূরত্ব থাকবে ৬ ফুট। এভাবে সমগ্র জমিতে বীজ বপন করুন। তুলো ও তুভারের মধ্যবর্তী ৬ ফুট ফাঁকগুলিতে বীজ বুনতে হবে নিম্নলিখিত উপায়ে।

১। তুলো ও তুভারের সারিগুলির দুই দিকেই ৯ ইঞ্চি দূরত্বে বুনুন মুগ কলাই (ফলে তুলো ও তুভারের প্রতিটি সারির দুই দিকেই এক সারি করে মুগ কলাই থাকবে)।

২। মুগের প্রতিটি সারি থেকে ৯ ইঞ্চি দূরত্বে বুনুন এক সারি করে বাজরা।

৩। বাজরার প্রতিটি সারি থেকে ৯ ইঞ্চি দূরত্বে বুনুন এক সারি করে গুভার (গুচ্ছ বীন)।

৪। গুভার-এর প্রতিটি সারির ৯ ইঞ্চি দূরত্বে বুনুন এক সারি করে জোয়ার। (ছবিতে দেখুন পৃষ্ঠা ২৭২)

“এই চাষে ওপরে উল্লিখিত ফসলগুলির বীজ ছাড়া এবং অবশ্যই কর্ষণ, বপন, ফসল তোলায় ও আচ্ছাদন তৈরিতে চাষির শ্রম ছাড়া অন্য কোনো কিছুই প্রয়োজন হয় না। না জল, না সার, না আগাছা পরিষ্কার — কোনোটারই প্রয়োজন নেই।”

“ওপরে উল্লিখিত তুলো ও তুভারের মধ্যে ৬ ফুট ফাঁকটি (মাঝারি মানের মাটির ক্ষেত্রে সুপারিশ করা হয়) বেশ উর্বর মাটির ক্ষেত্রে ৭ ফুট করা যেতে পারে। কিন্তু মাটি যদি অধঃপতিত হয় (degraded) হয়, তাহলে দূরত্বটি কমিয়ে ৫ ফুট করা যেতে পারে। অর্থাৎ উর্বর জমিতে কম সংখ্যক ও অধঃপতিত জমিতে বেশি সংখ্যক বীজ বুনতে হবে। এর ভিতরের নীতিটি বেশ সরল : সমগ্র জমিটি যত তাড়াতাড়ি পারেন উদ্ভিদে/গাছ-পাতায় ঢেকে ফেলুন। এতে মাটির জৈব স্বাস্থ্য পুনরুৎপাদিত হবে এবং আচ্ছাদনের জন্য অনেকটা মাত্রায় স্ব-উৎপাদিত জীব-ভর (biomass) পাওয়া যাবে, যা জমির উর্বরতা বৃদ্ধি করবে এবং সাথে সাথে খুব কম জল পেলেও নিম্নমানের মাটি থেকেও চাষি কিছুটা ফলন পেতে পারে।”

“বৃষ্টির শুরুতে বীজ বোনা সম্পন্ন হওয়ার ১৮ থেকে ২২ দিনের মধ্যে সমগ্র জমিটি গাছ-পাতার বৃদ্ধিতে ছায়ায় ঢেকে যাবে, একটি ফসলের গাছ অন্য ফসলের গাছকে ছুঁয়ে ফেলবে। একবার এটা ঘটলে মাটিতে আর সূর্যের

আলো পড়ে না, ফলে মাটি থেকে বাষ্পীভবন ঘটে অনেক কম এবং ১০-১৫ ইঞ্চি বৃষ্টিপাতেই মাটি বেশ স্যাঁতসেঁতে (damp) থাকে এবং বেশ ভালো ফসল হয়। সারা জমিটি ছায়ায় ঢেকে থাকার জন্য আগাছার বৃদ্ধি কার্যত বন্ধ হয়ে যায়। যদি কিছু আগাছা প্রথম দুই সপ্তাহে গজিয়ে ওঠে, তাহলে সেগুলি যেখানে বেড়ে উঠেছে সেখানে কেটে তা দিয়ে মাটিকে ঢেকে রাখতে হবে। এরকম পরিস্থিতিতে হিউমাস বা পাতাপচা সারের সৃষ্টিতে মাটি বাতাসের আর্দ্রতাকে (humidity) সরাসরি অথবা শিশির ফেঁটার মধ্য দিয়ে শুষে নিতে পারে। কিন্তু রাসায়নিক ব্যবহার করলে পাতা-পচা সার শুকিয়ে যায় এবং এর ফলে মাটির পক্ষে বাতাস থেকে জলীয় বাষ্প গ্রহণ করার ক্ষমতা বিশেষ ভাবে কমে যায়।”

“৬৫-৭০ দিনের মধ্যে মুগের শৃঁটিগুলি ফসল তোলবার মতো পুষ্ট হয়ে যায়। শৃঁটিগুলি সংগ্রহ করার পর গাছের বাকি সব অংশ তারা যেখানে জন্মেছিল সেখানেই মাটিতে পিষে ফেলে তা দিয়ে মাটি আচ্ছাদিত করে রাখতে হবে। ইতিমধ্যে এই দুই মাসে সংলগ্ন শস্যগুলি অর্থাৎ তুলো, তুভার ও বাজরার সারিগুলি বৃদ্ধি পেয়ে মাটির ওপর ছায়ায় ছাতা মেলে ধরে, যে মাটি ইতিপূর্বে মুগ গাছের ছায়ায় ঢাকা থাকত। শৃঁটি জাতীয় মুগ গাছের শিকড়ের গোঠগুলিতে (nodules) বাস করা নাইট্রোজেন সংগ্রহকারী (nitrozen fixing) ব্যাক্টেরিয়া ইতিমধ্যে মাটিতে প্রচুর পরিমাণে নাইট্রোজেন (বাতাস থেকে) সরবরাহ করেছে।”

“এরপর বপনের ১২০-১২৫ দিনের মধ্যে ফসল তোলার জন্য বাজরাও তৈরি হয়ে যায়, ফসল তোলার পর ওই ফসলেরও গাছ-পাতা মাটিতে পিষে মাটির আচ্ছাদন রূপে ব্যবহার করা হয়। ইতিমধ্যে তুলো ও তুভার গাছগুলি তাদের ছায়ার ছাতা বিস্তৃত করে ইতিপূর্বের বাজরা দ্বারা অধিকৃত অঞ্চলটিকে ঢেকে দেয়।

“১৩০-১৪০ দিনের মধ্যে শৃঁটিজাতীয় (legume) ফসল গুভারও ফসল তোলার যোগ্য হয়ে ওঠে। (ইতিমধ্যেই যে ফসল বাতাস থেকে নাইট্রোজেন সংগ্রহ করে নিজের কাজ মিটিয়ে অতিরিক্ত নাইট্রোজেন মাটিতে সরবরাহ করেছে)। এর পর ১৫-১৬০ দিনের ফসল জোয়ারও সংগ্রহ করা যেতে পারে। (নভেম্বরের শুরুতে) যাতে তুলো ও তুভারের সারিগুলি বৃদ্ধির জন্য আরও বেশি স্থান পাবে, যতক্ষণ না তারা ফসল তোলার মতো পুষ্ট হয়।”

“নভেম্বরের শেষে অথবা ডিসেম্বরের শুরুতে আপনি তুভারের শৃঁটিগুলি তোলা শুরু করতে পারেন। এই ফসল আপনি এপ্রিল-মে পর্যন্ত তুলতে পারেন। এইভাবে চাষি সারা বছর ধরে অব্যাহতভাবে ফসল তুলতে পারে

এবং এতে নিরাপত্তার বিষয়টি সুরক্ষিত থাকে, ৬টি শস্যের এক আধটা যদি ফসল নাও দেয় — যেহেতু এইরকম চাষে বাইরে থেকে জোগানের (input) প্রয়োজন পড়ে না — চাষির ক্ষতি হবার কোনো সম্ভাবনা থাকে না।

“এসব কিছু কোনো নতুন অপরিষ্কৃত ধারণা নয়, বরং এগুলির ঐতিহ্যগতভাবে প্রজন্মের পর প্রজন্ম অনুশীলন হয়ে এসেছে। কিন্তু বেদনার কথা হল এটাই যে আমাদের জনসাধারণ দ্বারা অনুসৃত এইরকম প্রাচীন ব্যপ্ত পরিকল্পিত ব্যবস্থাবলী ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে আমাদেরই বিজ্ঞানীদের দ্বারা। আধুনিক চাষ-পদ্ধতির প্রসারের ফলে এখন চাষ হল (দু-)এক ধরনের (monoculture), রাসায়নিক নিবিড় (chemical intensive), যার ফলে চাষের খরচ দ্রুতগত বেড়েই চলে, বাড়ে রোগ-পোকাদের আক্রমণ এবং চাষির উদ্বেগ। আসলে আমরা নিজেরাই নিজেদের কবর খুঁড়ছি এবং এ ব্যাপারে নিশ্চিতভাবেই চাষিদের কিছুটা দায় রয়েছে।

(বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ) ভাস্কর সাভে আরও জানান যে ওপরে উল্লিখিত ফসলের মিশ্রণ শুকনো, কম বৃষ্টিপাতের এলাকাগুলিতে প্রযোজ্য — কৃষকের মতো এবং অন্যান্য আর্দ্র ও বেশি বৃষ্টিপাতের অঞ্চলের জন্য নয়। এইরকম ভিজে অঞ্চল তুলো চাষের জন্য উপযুক্ত নয়। ভিজে অঞ্চলের জন্য ৩৩০-৩৫০ দিনের দীর্ঘমেয়াদি ফসল হিসাবে তুলো ছাড়া অন্য কোনো ফসল নির্বাচন করতে হবে।



অর্কিড বন

কল্পবৃক্ষে ভ্রমণার্থীদের লিপিবদ্ধ মতামত

“আমি সারা পৃথিবীতে অনেক খামার দেখেছি। এটাই শ্রেষ্ঠ”। — মাসানুবু ফুকুওকা, সুপরিচিত জাপানি প্রাকৃতিক চাষি, ও ঋক এক তৃণখণ্ডে বিপ্লব’ (One Straw Revolution), ঋকপ্রকৃতিতে প্রত্যাবর্তনের পথ’ (The road Back to Nature) ও কৃষির প্রাকৃতিক উপায়’ (The Natural Way of Farming) ইত্যাদি বইগুলির লেখক। — ফুকুওকা কল্পবৃক্ষ পরিদর্শনের সময় লিপিবদ্ধ ও টেপে অনুলিখিত।

এই খামারে যে মাত্রায় প্রাকৃতিক প্রাজ্ঞতা ও পাকা অভিজ্ঞতাসমূহ এখনও পর্যন্ত অন্যান্য চাষীদের দ্বারা বিস্তারিতভাবে ব্যবহৃত না হওয়া এক বিরাট ভুল ... আধুনিক চাষে আমরা যে সকল সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছি সেগুলি অতিক্রম করার সঠিক চাষ-পদ্ধতি হল এটি।

*— কোয়েন রেইনটেন (সহ সম্পাদক, ভবিষ্যতের জন্য চাষ’ (Farming for the Future) এবং আইআইআইআইএ (IIEIA) বুলেটিন, নেদারল্যান্ডের International Centre for Low-External Input Agriculture দ্বারা প্রকাশিত।

“ভাস্কর সাভের খামার পরিদর্শন করা এবং তাঁর সাথে আলোচনা করা ছিল এক বিরাট আনন্দের ব্যাপার ... কামনা করি তাঁর প্রাকৃতিক চাষের বাণী দ্রুত সারা দেশের কোণে কোণে ছড়িয়ে পড়ুক।” — ডঃ এস.বি. কাদরেকর, উপাচার্য, কঙ্কন কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়), দাপোলি, রত্নাগিরি।

মাটি ও উদ্ভিদের সুস্থায়ী নির্বাহে (sustainable management) ভাস্কর সাভের নতুন রীতি দ্বারা আমি খুবই প্রভাবিত হয়েছি ... ফুল, ফল, শাকসবজি উৎপাদনের উন্নতিতে আমাদের — বিজ্ঞানীদের বিশেষভাবে উচিত পারস্পরিক আদান-প্রদান করা এবং তার অভিজ্ঞতা থেকে শেখা — ডঃ এইচ.পি.সি. প্রজেক্ট কো-অর্ডিনেটর, ট্রপিকাল ফ্রন্টস্ ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ ট্রপিকাল রিসার্চ।

*ভারতের জন্য আপনার পদ্ধতি বৈপ্লবিকভাবে সম্ভাবনাময়। এখন সরকারের উপলব্ধি করার সময় হয়েছে যে কত কম খরচে পতিত জমির উন্নয়ন করে গ্রামীণ রোজগার বৃদ্ধি করা সম্ভব। — এলিস্টেয়ার, সম্পাদক ঋকফুড ম্যাটার্স ওয়ার্ল্ড ওয়াইড’, কৃষি ম্যাগাজিন, ইংল্যান্ড
কল্পবৃক্ষ পরিদর্শন করে আমি সত্যিই খুব খুশি হয়েছি। আমার মনে হচ্ছিল আমি যেন আমাদের দেশে প্রাকৃতিক পরিবেশে বিচরণ করছিলাম — যার সাথে আমি গত ৫০ বছর ধরে যুক্ত আছি ... ঈশ্বর শ্রী সাভে ও তাঁর পরিবারের মঙ্গল করুন।” — অধ্যাপক ডঃ এস শেখাগিরি রাও, ভূতপূর্ব ডিরেক্টর, বোটানিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া।

জৈব চাষে আপনার চমৎকার, বিস্ময়কর উদাহরণের জন্য আপনাকে অভিনন্দন। — পিয়ের লেমাঁ, প্রেসিডেন্ট, নেচার অ্যান্ড প্রোগ্রেস।

“এই খামারটি নিপুণ ও এটি মর্মকে স্পর্শ করে। এখানে শেখার জিনিসগুলি শুধুমাত্র ভারতে স্থানিক ও জাতীয় স্তরেই প্রাসঙ্গিক নয়, সেগুলি বিশ্ব জুড়েও প্রাসঙ্গিক। ভারতে গ্রামীণ দারিদ্র মোকাবিলায় এই পদ্ধতির তাৎপর্য সুদূরপ্রসারী।” — জিল উইন্ডেল, ডিপার্টমেন্ট অব এগ্রিকালচার, ইউনিয়ন অফ কুইনস্ল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া।

“আমি জাপানে মাসানুবু ফুকুওকার সাথে প্রাকৃতিক কৃষি অধ্যয়ন ও উপভোগ করছি। আমি যখন শুধুমাত্র কল্পবৃক্ষের প্রবেশ তোরণের কাছে এসে দাঁড়ালাম, আমি এক অপূর্ব শক্তি অনুভব করলাম। ধান ও নারকেল পাশাপাশি কী সুন্দরভাবে ঝলমল করছে। এই খামারে রয়েছে প্রকৃতির ঐক্যতান। প্রত্যেকে, একে অপরের সাথে সহাবস্থান কী দারুণভাবে উপভোগ করছে! আমার মন কতবার বলে উঠল, ঋকপূর্ব’। আর কিছু না। এই খামার আমার ভালো লেগেছে। ধন্যবাদ! আমি খুবই সুখী হয়েছি।” — নাগোমা চিবা, জাপান

“আমি তো বলব ভাস্কর সাভে হলেন ভারতের ফুকুওকা ... সরকারের এটা দেখা উচিত আর প্রাকৃতিক কৃষির প্রসারে কাজ করা উচিত। — ডঃ টি সম্পত কুমার, এএফপিআরও, নতুন দিল্লি।

আমরা বিপুলভাবে প্রভাবিত হয়েছিলাম, আমরা পৃথিবীর অন্যান্য অঞ্চলে খামার দেখেছি। কিন্তু এটাই ছিল সবচেয়ে আকর্ষণীয়। — ডেভিড রবেন, কৃষি পরামর্শদাতা, ইজরায়েল।

* এই খামারে আমি যা দেখেছি তাতে আমি একবারে অভিভূত হয়ে পড়েছি। এখানে মানুষ ও প্রকৃতির মধ্যে যে অপূর্ব ভারসাম্য গড়ে উঠেছে

তা আমরা যারা সবুজ বিপ্লবের বিস্ময় নিয়ে ক্রমাগত প্রলাপ বকে খাই তাদের চোখ খুলে দেবে। ভাস্কর সাভের ভালোবাসায় বেড়ে উঠে এই খামারে সত্যিকারের সবুজ বিপ্লব ঘটে চলেছে, তার মতো মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি পাক। — এম সাহনী, প্রধান সচিব, কেন্দ্রীয় শাসিত অঞ্চল দমন, দিউ, দাদরা ও নগর হাভেলি।

প্রকৃতি অথবা ঈশ্বর সবচেয়ে কম রসদকে সবচেয়ে ভালোভাবে ব্যবহার করে, আর আমি খুব কাছ থেকে লক্ষ্য করেছি শ্রদ্ধেয় শ্রী বি এইচ সাভে সেই ধাঁচেই কাজ করেন। — আনন্দ প্রকাশ আর্য়, সচিব, লোকসভা। সাংসদদের জন্য উপদেষ্টামণ্ডলীর কমিটি সদস্য, নতুন দিল্লি।

আপনার খামার ... আমার মনে হয় ভারতে এটি এক অদ্বিতীয় খামার, এর থেকে আমি ব্যক্তিগত ভাবে খুবই উপকৃত হয়েছি এবং আমার কৃষিজ্ঞান সমৃদ্ধ হয়েছে। — মতিলাল কর, জয়েন্ট ডিরেক্টর, কৃষি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ।

“তাঁর প্রাকৃতিক চাষের নীতিসমূহ সত্যিই মনোমুগ্ধকর ... এবং এখানে আমার মন্তব্য হল কল্পবৃক্ষ হল এমন এক খামার যা এক স্মৃতিসৌধ ... এখানকার সাযুজ্য, শান্তি ও সৌন্দর্য কোনো ভ্রমণার্থীকে গাছ-পালার জগতে স্বর্গীয় সৃষ্টির দিকে নিষ্ক্ষেপ করে। আমার সুপারিশ হল সমস্ত ভারতীয় এই খামার পরিদর্শন করুন এবং উপকৃত হোন। — ডঃ গোপাল সচ্চিদানন্দ, লেকচারার, বিলিমোরা।

আমি শুধু ফুকুওকার বই পড়েছিলাম, সেটা ছিল এক ধারণা এবং সে সংক্রান্ত কর্মকাণ্ড ছিল দূরবর্তী জাপানে। এখন এখানে এসে এক বিরাট অভিজ্ঞতা উপভোগ করা গেল। এখানকার কর্মকাণ্ডও একই রকম ধারণার ওপর গড়ে উঠেছে, তবে তা রূপায়িত হয়েছে স্থানীয় জলবায়ু, সংস্কৃতি ও মাটি অনুযায়ী। শ্রী সাভে এক বিস্ময়কর মানুষ। অন্য অনেকে পারিবেশিক ভারসাম্যের কথা বলেন, ওঁর যাপনে সেই ভারসাম্য প্রকাশ পায়। আমি আবার এখানে ফিরে আসতে চাই আর শিখতে চাই”। — ডি এন কুলকানী, চিফ ইঞ্জিনিয়ার (সেচ) ও জয়েন্ট সেক্রেটারি, মন্ত্রণালয় (মহারাষ্ট্র সরকার), বোম্বে।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

এই বইটির অনুবাদ করার প্রেরণা ও প্রকাশের কাজে আমি আর্থকেয়ার বুকস-এর ভরত মনসাতা (ইনি বইটির লেখকও বটে), বিনীতাজী, মনফকিরা ও দিশার বন্ধুরা, জিতেন নন্দী, শ্রীমান চন্দ্রবর্তী, বহু সমাজকর্মী, বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক কর্মী বন্ধু ও প্রেসের কর্মীদের প্রতি কৃতজ্ঞ।